ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

প্রথম খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জৈন ত্রিরত্ন

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-এ

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, বৌদ্ধদিগের এই ত্রিরত্ন অনেকের নিকটই সুপরিচিত। তবে বৌদ্ধদের মত জৈনদিগেরও যে ত্রিরত্ন আছে, এ সংবাদ অনেকের নিকটই নূতন। কিন্তু নামের সাদৃশ্য থাকিলেও, বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্ন ও জৈনদিগের ত্রিরত্নের মধ্যে অপর কোনও রূপ ঐক্য বা সাদৃশ্য নাই। তাই, সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র, এই তিনটীই জৈনদিগের মতে ত্রিরত্ন। জৈনাচার্য্যগণ এই ত্রিরত্নের সম্যক্ অনুষ্ঠানকে মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) এই ত্রিরত্নই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষকে সংসারের দুঃখময় স্থান হইতে সুখময় মুক্তি স্থানে লইয়া গিয়া ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্ম বলা হয়। (২)

যে স্থানে সূর্য্য আছেন, সে স্থানে যেমন অন্ধকারের অবস্থান সম্ভবপর নহে, সেইরূপ, যে জীবের মধ্যে এই তিন সম্যক্‌রত্নের অধিষ্ঠান, তাহার মধ্যেও অজ্ঞতা থাকিতে পারে না। (৩) আবার অজ্ঞতা-ধ্বংস হইলেই মোক্ষলাভ লইয়া থাকে। সম্যক্‌ত্ব-রূপ রত্নত্রয়-মেঘ মানুষের পাপরাশি ক্ষালন করে; এবং কল্যাণ-রূপ সলিল বর্ষণ করে। পক্ষান্তরে, মিথ্যাত্ব রূপ মেঘ মানবের পুণ্যরাশি ক্ষালিত করিয়া দেয়, আর পাপরাশি-রূপ সলিল বর্ষণ করে। (৪)

জৈনগণ এইরূপে তাঁহাদের ত্রিরত্নের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন; এবং তাহাদের অনুষ্ঠান প্রত্যেক গৃহী ও সন্ন্যাসীর পক্ষেই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। জৈনদিগের সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানই গৌণতঃ কি মুখ্যতঃ এই

(১) সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ—তত্ত্বার্থাধিগম মোক্ষশাস্ত্র ১।১

(২) রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার—২য় শ্লোক।

(৩) অমিতগতিশ্রাবকাচার ২।৬৮

(৪) অমিতগতিশ্রাবকাচার ২।৭০

ত্রিরত্নের উন্নতি কল্পেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আচরণ না থাকিলে, যেমন বৌদ্ধ-সমাজে কেহ নিজেকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না, জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও সেইরূপ কেহ জৈন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং ইহাদের সম্যক্ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে, তিনি জৈন বলিয়া সমাজে গৃহীত হইতে পারেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে আজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী-দিগের সংখ্যা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হইলেও, জৈনদিগের এই ত্রিরত্ন সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। যাহা হউক, ইহাদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্যগ্‌দর্শন

প্রথমে সম্যগ্‌দর্শনের কথা বলিব। আপ্ত, আগম ও তপস্বীদিগের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহারই নাম সম্যগ্‌দর্শন। যিনি দোষরহিত, (বীতরাগী) (৫) সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের হিতোপদেশক তিনিই আপ্ত। জৈনদিগের মতে—ঋষভনাথ প্রভৃতি চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষই এবংবিধ আপ্ত-লক্ষণে লক্ষিত হইবার উপযুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের পূজা এই সম্যগ্‌দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত।

আপ্তমুখনিঃসৃত, (অতএব) প্রতিবাদীর দ্বারা অখণ্ডনীয়, প্রত্যক্ষানুমানাদির অবিরোধী, তত্ত্বোপদেশক এবং সর্ব্বজনহিতকর শাস্ত্রই 'আগম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই আগমের প্রতি শ্রদ্ধাও সম্যগ্‌দর্শনের অন্যতম অঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

যিনি যে ধর্ম্মকেই অবলম্বন করুন না কেন, সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। নহিলে, সেই ধর্ম্মের বিভিন্ন আচার প্রতিপালনে তাঁহার অনুরাগ বা প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। সেই জন্য, সকল ধর্ম্মেরই পূর্ব্বাচার্য্যগণ তত্তৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য নানারূপ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা কাহারও অবিদিত নাই। পুস্তককে দেবতা জ্ঞান করিয়া প্রতি বর্ষে সরস্বতী পূজার দিন মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা যথাশাস্ত্র পুস্তক ও দোয়াত কলমের পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রাচীন বা প্রাচীন মতাবলম্বী, তাঁহারা পুস্তকাদি পায়ে লাগিলে তখনই তাহাকে নমস্কার করেন, এবং অতিশয় যত্নের সহিত পুস্তকাদি পবিত্র ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। মুদ্রাযন্ত্রের সহযোগে শাস্ত্রগ্রন্থের পাবিত্র্য নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায়, অনেক প্রাচীন হিন্দু আজ পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ-মুদ্রণের ভীষণ বিরোধী। অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহে ধর্ম্মকর্ম্মে মুদ্রিত গ্রন্থ অপবিত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয় না; এবং তাহার স্থলে আজও হস্তলিখিত পুঁথিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিষয়ে জৈনগণ হিন্দুগণ অপেক্ষাও অধিকতর নিয়মপরায়ণ। বস্তুতঃ, পুস্তক রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের যত্ন ও শ্রদ্ধা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। এই জন্য জৈন ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত বহু পুস্তক অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। জৈন মুনিগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মত অনেক জৈনও শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণের একান্ত বিরোধী। জৈনদিগের মধ্যে প্রতি দিন পুস্তক-পূজার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন তাঁহারা মহাসমারোহের সহিত এই পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঐ দিন তাঁহাদের নিকট 'শ্রুতপঞ্চমী'পর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ।

যিনি বিষয়পরাঙ্মুখ, নিরারম্ভ (কর্ম্মত্যাগী), অপরিগ্রহ, জ্ঞানধ্যানতপোরত, তিনিই তপস্বী। এইরূপ তপস্বীর প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগের অনুকরণ করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদের উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, উন্নতি লাভের আশা করা যায় না।

এই সম্যগ্‌দর্শন সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ইহা মোক্ষমার্গের কর্ণধার স্বরূপ। বীজ উপ্ত না হইলে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই সম্যগ্‌দর্শন না থাকিলে সম্যগ্‌-জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্রের উৎপত্তি প্রভৃতির আশা থাকে

(৫) দোষ আঠারটী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, রোগ, ভয়, গর্ব্ব, রাগ, দ্বেষ, মোহ, চিন্তা, শোক, রতি, খেদ, স্বেদ, আশ্চর্য্য। এই আঠারটী দোষ যাঁহার নাই, তিনি দোষ রহিত বীত-রাগী আপ্ত। রত্ন—৬

না। যিনি সম্যগ্‌দর্শনে শুদ্ধ, তিনি অন্য কোনও ব্রত পালন করুন আর নাই করুন, তাঁহার কোনও রূপ অবনতির আশঙ্কা নাই। পরন্তু তিনি অশেষ যশঃ, তেজঃ, বিদ্যা, বিজয় প্রভৃতি সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া জরারহিত, নীরোগ বাধাহীন, শোকভয়শূন্য অবস্থায় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইয়া থাকেন। (৬)

সম্যগ্‌দর্শনের আর একটী লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এই—'তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনম্' (তত্ত্বার্থাধিগম মোক্ষশাস্ত্র ১।২)—অর্থাৎ সপ্ত তত্ত্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাই সম্যগ্‌দর্শন। জৈনমতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জরা ও মোক্ষ এই সাতটী তত্ত্ব আছে। এই সম্বন্ধে এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্ব লক্ষণের সহিত এ লক্ষণের কোনও বিরোধ নাই; কারণ জৈনশাস্ত্রে এই সপ্ততত্ত্বের বিশিষ্ট আলোচনা আছে; সুতরাং যাহার শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহার ত এ তত্ত্বের প্রতিও শ্রদ্ধা স্বতঃই জন্মিবে। আর তত্ত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান্, সেই তত্ত্ব যে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বা সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি উপদেশ দেন, তাঁহাদের প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা স্বতই উৎপন্ন হইবে।

সম্যগ্‌জ্ঞান

এইবার সম্যগ্‌জ্ঞানের কথা বলিব। সম্যগ্‌দর্শনে কেবল শ্রদ্ধার কথা বলা হইয়াছে। সম্যগ্‌জ্ঞানের বেলায় আর একটু উপরে উঠিতে হইবে। উহাতে কেবল শ্রদ্ধা থাকিলেই চলিবে না; উহাতে সম্যক্ নির্দ্দোষ পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। তাই রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার-প্রণেতা সম্যগ্‌-জ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছেন—

অন্যূনমনতিরিক্তং যাথাতথ্যং বিনা চ বিপরীতাৎ।
নিঃসন্দেহং বেদয় যদা হুস্তজ্‌ জ্ঞানমাগমিনঃ॥

রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার ৪২।

বস্তু সম্বন্ধে যে অন্যূন, অনতিরিক্ত, যথার্থ, অবিপরীত, নিঃসন্দেহ জ্ঞান তাহারই নাম সম্যগ্‌জ্ঞান। অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে সম্যগ্‌দর্শন না থাকিলে এই সম্যগ্‌জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

(৬) রত্নকরণ্ড ২৮ ইত্যাদি

সম্যক্ চারিত্র

হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, মৈথুন, পরিগ্রহ এই পাঁচটী পাপ হইতে বিরতির নাম সম্যক্ চারিত্র। (৭) এই সম্যক্‌চারিত্র দুইপ্রকার। একপ্রকার সাগার, সসঙ্গ গৃহীর জন্য, অপর প্রকার সর্ব্বসঙ্গবিরত, অনাগার (অর্থাৎ গৃহশূন্য) মুনিদিগের জন্য। মুনিগণ উল্লিখিত পাঁচটী পাপহেতুকে বর্জ্জন করেন—উহাদের অতীচার বা লেশমাত্রও তাঁহাদের কায়ে, মনে, বাক্যে বা কার্য্যে থাকে না। তাই তাঁহাদের সম্যক্‌চারিত্র পূর্ণ বা 'সকল'। উহার নামান্তর 'মহাব্রত'। আর গৃহিগণ বিষয়-জালে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন সাধারণতঃ ঐগুলিকে সূক্ষ্মভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন না—তাঁহারা মাত্র স্থূল ভাবে পাপগুলির একদেশ মাত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের সম্যক্‌চারিত্র অসম্পূর্ণ বা 'বিকল'। উহার নামান্তর 'অণুব্রত'। গৃহীর এই সম্যক্‌চারিত্র মুখ্যতঃ মোক্ষলাভের কারণ নহে—তবে ইহা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া পরম্পরাক্রমে বা গৌণতঃ মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। মুনিদিগের সম্যক্‌চারিত্র কিন্তু মুখ্যতই মোক্ষ লাভের কারণ।

গৃহী বা শ্রাবকের সম্যক্‌চারিত্র তিনভাগে বিভক্ত—অণুব্রত, গুণব্রত ও শিক্ষাব্রত। আবার এই অণুব্রত পাঁচপ্রকার; গুণব্রত তিনপ্রকার এবং শিক্ষাব্রত চারি-প্রকার। সর্ব্বশুদ্ধ এই সকল ব্রতের সংখ্যা বারো। হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, মৈথুন এবং পরিগ্রহ এই সকল পাপ হইতে স্থূল ভাবে বিরতির নাম অণুব্রত। সুতরাং পাঁচটী অণুব্রতের নাম—অহিংসাণুব্রত, সত্যাণুব্রত, অচৌর্য্যাণুব্রত, পরদার-নিবৃত্তি অণুব্রত, পরিগ্রহপরিমাণাণুব্রত।

সঙ্কল্প, প্রকৃত কার্য্য করা, কার্য্যের সমর্থন এবং কার্য্যে প্রযুক্ত করান প্রভৃতি উপায়ে ত্রস (৮) জীবের বধ হইতে বিরতির নামই অহিংসাণুব্রত। বধ বলিতে কেবল প্রাণ-নাশ মাত্রই বুঝায় না। ছেদন, বন্ধন, ক্লেশদান, অধিক-ভারারোপণ, আহারদানে ত্রুটী—এই পাঁচটীকেও এক্ষেত্রে

(৭) রত্ন—৪৯

(৮) দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের নাম 'ত্রস'। একেন্দ্রিয় জীবের নাম 'স্থবর' (যেমন পৃথিবী অপ্ অগ্নি, বায়ু ও ও বনস্পতি) রত্ন—৫৩ ইত্যাদি

বধ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ কেবল প্রাণীর বধ হইতে বিরত থাকিলেই অহিংসাণুব্রত পালন করা হইল না। ছেদনাদি হইতে বিরত থাকিলেই প্রকৃতপক্ষে উহা পালন করা হইবে। তাই, এই পাঁচটীকে বলা হইয়াছে অহিংসাণুব্রতের অতীচার।

নিজে মিথ্যা কথা না বলা এবং অপরের দ্বারা না বলান, যেরূপ সত্য কথার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয় এরূপ সত্য কথাও না বলা বা কাহারও দ্বারা না বলান, ইহারই নাম মোটামুটি স্থূল মৃষাবাদ হইতে বিরতি বা সত্যাণুব্রত। পরনিন্দা, কাহারও গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া, মিথ্যা দলিল-পত্র লেখা, গচ্ছিত ধনকে আত্মসাৎ করা ইত্যাদি হইল সত্যাণুব্রতের অতীচার ; অর্থাৎ এ পাঁচটী হইতেও সত্যাণুব্রতীকে বিরত থাকিতে হইবে।

পরের কোনও দ্রব্য তাঁহাকে না বলিয়া না লওয়ার নামই অচৌর্য্যাণুব্রত। চুরির উপায় বলিয়া দেওয়া, চোরাই মাল গ্রহণ করা, রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, অধিক মূল্যে অল্প মূল্যের জিনিষ দেওয়া এবং মাপ করিবার পরিমাণ (গজ, মণ, প্রভৃতিকে) ছোট বড় করা, এই কয়টী অচৌর্য্যাণুব্রতের অতীচার।

নিজে পরস্ত্রী গমন না করা বা অন্যের দ্বারা না করান ইহারই নাম পরদারনিবৃত্তিঅণুব্রত। অশ্লীল কথা বলা, ব্যভিচারিণীর সহিত সম্বন্ধ রাখা, অস্বাভাবিক উপায়ে কাম প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা, নিজ স্ত্রী ভোগেও অতিরিক্ত তৃষ্ণা করা এই কয়েকটী এই অণুব্রতের অতীচার।

প্রয়োজনীয় ধনাদি হইতে অতিরিক্ত ধনাদি বিষয়ে স্পৃহা না করার নাম পরিগ্রহপরিমাণাণুব্রত বা ইচ্ছা-পরিমাণাণুব্রত অর্থাৎ ইচ্ছাকে পরিমিত করা-রূপ অণুব্রত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অশ্ব-শকটাদি রক্ষা, প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য সংগ্রহ করা, পরের বিভব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া, অতিশয় লোভ করা ইত্যাদি এই অণুব্রতের অতীচার।

গুণব্রত তিনটী ; যথা—দিগ্‌ব্রত, অনর্থদণ্ডব্রত, ভোগোপভোগপরিমাণব্রত। দশদিকে যতটুকু স্থান (দেশ) কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিয়া 'ইহার বাহিরে আমি জীবনে কোনও দিন যাইব না' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তদনুসারে কার্য্য করার নাম দিগ্‌ব্রত। দিগ্‌ব্রত ধারণের প্রয়োজন এই যে, ইহাতে পাপ কার্য্য অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়। যদি কোনও পাপ কার্য্য সঙ্ঘটিত হয়, তবে এই ব্রতধারীর পক্ষে তাহা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই হইবে। জৈনাচার্য্যগণ বলেন—নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে শ্রাবক মহাব্রতধারীর তুল্য ;—কারণ সেখানে সে পাপ কার্য্য কিছুই করে নাই। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সময় অনেক সময় জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক পাপ ঘটিয়া থাকে। তাহা যাহাতে সর্ব্বত্র না ঘটিতে পারে সেই জন্যই এই ব্রতের বিধান। নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করা বা ভুলিয়া যাওয়া, ক্ষেত্রের পরিমাণ অন্যায্য ভাবে বাড়াইয়া লওয়া প্রভৃতি এই ব্রতের অতীচার।

যে সকল কারণে বিনা প্রয়োজনে অনর্থক হিংসাদি পাপ জন্মে, সেই সকল কারণ ত্যাগ করার নাম অনর্থদণ্ড-বিরতিগুণব্রত। এই অনর্থদণ্ড পাঁচ প্রকারে ঘটিতে পারে। তাই উহার ভেদ পাঁচটী—পাপোপদেশ, হিংসাদান, অপধ্যান, দুঃশ্রুতি ও প্রমাদচর্য্যা। এই পাঁচ প্রকারের অনর্থদণ্ড হইতেই ব্রতীকে বিরত থাকিতে হইবে।

যে ব্যাপারে পশু প্রভৃতির ক্লেশ হয়, কাহারও বঞ্চনা হয়, বা অহিংসাদি পাপ ঘটিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও এরূপ কোনও ব্যাপারের আলোচনা করার নাম পাপোপদেশ অনর্থদণ্ড। এইরূপ আলোচনার ফলে পাপ কার্য্য সাধিত হইলে আলোচকমাত্রেই সে পাপের জন্য দায়ী।

পরশু, কৃপাণ প্রভৃতি জীব বিনাশের হেতুভূত। ছুরি কাটারী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি কেহ চাহিলে, তাহাকে উহা দেওয়ার নাম হিংসাদান অনর্থদণ্ড। এইরূপ দেওয়া অস্ত্রের দ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে ঐ হিংসার জন্য দাতাকে কিয়ৎ-পরিমাণে অনর্থক দায়ী হইতে হয় বলিয়া, এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ।

দ্বেষ অথবা রাগ হেতু পরস্ত্রী প্রভৃতির বধ, বন্ধন ও ছেদনাদির চিন্তা করার নাম অপধ্যান অনর্থদণ্ড। এইরূপ চিন্তা পরিণামে কার্য্যপ্রসূ হইলে, উহা নিতান্ত গর্হিত হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া, চিন্তা হইতে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

যে সকল গ্রন্থ পাঠকের চিত্ত দ্বেষ-রাগাদির দ্বারা কলুষিত করে, সেই সকল গ্রন্থের পাঠ বা শ্রবণের নাম দুঃশ্রুতি অনর্থদণ্ড।

বিনা প্রয়োজনে মাটী খোঁড়া, জল ছিটান, গাছ ছেঁড়া, উদ্দেশ্য বিহীনভাবে পথ চলা প্রভৃতির নাম প্রমাদচর্য্যা অনর্থদণ্ড। ইহার দ্বারা অনর্থক প্রাণিহত্যা হইতে পারে বলিয়াই ইহা নিষিদ্ধ।

ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য (৯) উপভোগ্য বিষয়ের হ্রাস করা বা উহাদিগকে পরিমিত করার নাম ভোগোপভোগ পরিমাণাণুব্রত। এই ব্রতাচরণকারীকে মধু, মাংস, মদ্য, আদা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। কেন না, ইহাদের ভক্ষণের দ্বারা হিংসাদি সংসাধিত হইবার আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে ইহাদের পরিত্যাগের দ্বারা ভোগের বিষয় পরিমিত হয় এবং সংযম শিক্ষা হয়।

দেশাবকাশিক, সাময়িক, প্রোষধোপবাস ও বৈয়াবৃত্য এই চারিটী শিক্ষা ব্রত। এই ব্রতগুলি সংযম-শিক্ষা দ্বারা শ্রাবককে মুনিব্রত ধারণের উপযোগী করিয়া তুলে ; তাই ইহাদের নাম শিক্ষাব্রত।

দিগ্‌ব্রতানুসারে যে স্থান ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যেও স্থান বিশেষ ব্যতীত অপর স্থানে সপ্তাহ, পক্ষ, এক মাস, কি দুই মাস কি ততোধিক কালের জন্য নিয়মিত ভাবে না যাওয়ার নাম দেশাবকাশিক শিক্ষা-ব্রত।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হিংসাদি পঞ্চ পাপকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করিয়া আত্মধ্যান করার নাম সাময়িক শিক্ষা-ব্রত। প্রতিদিনই কিছুক্ষণের জন্য (অন্ততঃ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে) এই ব্রতের অনুষ্ঠান স্বরূপ ধ্যানাদি করা উচিত। এই ব্রত অনুষ্ঠানের সময় শ্রাবকের আচার ব্যবহারও ঠিক মুনির মতই হইয়া থাকে—ব্রত কালে তিনি মুনিত্বই প্রাপ্ত হন। বিনা শিক্ষায় একেবারেই মুনিদীক্ষা গ্রহণ করা নানা কারণে সকলের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও মুনির আচরণই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাহাতে সেই লক্ষ্য কালে কার্য্যে পরিণত করা যায়, সেই জন্য প্রত্যেক শ্রাবককে কিছু কিছু যত্ন প্রতিদিনই করিতে হইবে। তাহা হইলেই এক সময়ে মুনিত্বলাভ করিবার সামর্থ্য তাহার জন্মিবে। এই উদ্দেশ্যেই এই ব্রতের বিধান।

পর্ব্বদিনে (অর্থাৎ অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে) চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকারের আহার্য্য বস্তু ত্যাগ করিবার নাম প্রোষধোপবাস শিক্ষা-ব্রত। এই উপবাসের দিনে পঞ্চ পাপ পরিহার, অলঙ্কারাদি বর্জ্জন ও স্নানাঞ্জনাদি ত্যাগ বিধেয়। এই সকল দিনে হিন্দুদিগের পক্ষেও স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ নিষিদ্ধ।

গৃহহীন তপস্বীকে শ্রদ্ধার সহিত আহার্য্য ও ঔষধাদি দান করার নাম বৈয়াবৃত্য শিক্ষা-ব্রত। যে তপস্বী জীবনের আদর্শ, তাঁহাকে পূজা ভক্তি করা নিতান্তই উচিত। তাই এই ব্রতের বিধান।

গুণ-ব্রত ও শিক্ষা-ব্রতগুলির বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অণুব্রতগুলির সম্যক্ অনুষ্ঠানের সৌকর্য্য বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপে শ্রাবকের মনোবৃত্তিকে দিন দিন সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই এইগুলির বিধান করা হইয়াছে।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ একেবারেই সকলকে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন—ভিক্ষুর কঠোর ব্রত ধারণ করিবার পূর্ব্বে সেই কঠোর ব্রত ধারণের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। তাহার ফলে কালক্রমে (এমন কি বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায়ই) ভিক্ষু সঙ্ঘে নানাবিধ অসদাচার প্রবেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

উপযোগিতা অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিলে যে এইরূপ বিপদ হইবে, তাহা বুঝিয়াই হিন্দু ও জৈনগণ যে গৃহস্থ ও শ্রাবকগণকে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথের উপযোগী করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন—হিন্দুর গার্হস্থ্যাশ্রম ও জৈন শ্রাবকের সম্যক্ চারিত্র তাহার নিদর্শন।

এইবার মুনিদিগের সম্যক্‌চারিত্রের কথা বলিব। অবশ্য জৈনদিগের মধ্যে নানা প্রকারের মুনি বা সাধু আছেন। এস্থানে কেবল সাধারণ ভাবে বলা হইতেছে। মুনিদিগের অনুষ্ঠেয় মহাব্রত পাঁচটি—ও সেই মহাব্রতের

(৯) যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা একইবার গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য বিষয় ; এবং স্ত্রী-বসন-আসনাদি যাহা বারংবার কার্য্যে লওয়া যায়, তাহাদের নাম উপভোগ্য বিষয়।

অনুষ্ঠান সৌকর্য্যের অথবা রক্ষার জন্য সমিতি পাঁচটী এবং এবং গুপ্তি তিনটী। তাঁহাদের গুণব্রত ও শিক্ষা-ব্রতের আবশ্যকতা নাই। অণুব্রতও হয় যে যে বিষয় লইয়া, মহাব্রতও হয় ঠিক সেই সেই বিষয় লইয়া। তবে অণুব্রতের (অল্প ব্রতের) অনুষ্ঠান তত কঠিন নয়—মহাব্রতের অনুষ্ঠান অতীব কঠিন—এই মাত্র ভেদ। অণুব্রতে হিংসাদি পাপ হইতে স্থূলতঃ যথাশক্তি বিরত হইলেই চলিতে পারে; কিন্তু মহাব্রতে ঐ সকল পাপ হইতে কেবল স্থূলতঃ বিরত হইলে চলিবে না—যাহাতে কোনও উপায়ে অতি অল্প পরিমাণেও ঐ সকল পাপ সঙ্ঘটিত হইতে না পারে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। । রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার প্রণেতা তাই মহাব্রতের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—মনঃ, বাক্য ও কায়ের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য করা, করান বা কার্য্যের অনুমোদন করা—এই সকল উপায়ে হিংসাদি পাপ কার্য্য সম্পাদন না করিয়া উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হওয়ার নাম মহাব্রত।

এইবার মহাব্রতের কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের যাঁহারা মুনি, তাঁহারা অপরিগ্রহ, অর্থাৎ তাঁহারা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন—তাঁহাদের নিকট থাকে মাত্র তিনটী জিনিষ—শৌচাদির জন্য কমণ্ডলু, গ্রন্থ এবং জীব রক্ষার জন্য ময়ুর পিচ্ছিকা (১০) সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের কেবল পরদারে নিবৃত্ত হইলে চলিবে না—তাঁহাদিগকে ১৮০০০ হাজার দোষ রহিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে হইবে। তাই শ্রাবকদিগের পরদার-নিবৃত্তিরূপ অণুব্রতের ব্যবস্থা—আর তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতের ব্যবস্থা। আবার শ্রাবকদিগের পরিগ্রহ পরিমাণরূপ অণুব্রতের ব্যবস্থা—ইঁহাদের কিন্তু ক্ষেত্র, বাস্তু, ধন, ধান্য, দ্বিপদ চতুষ্পদ-যান, শয্যা, আসন, ভাণ্ড, বস্ত্রাদি এই দশ বাহ্য পরিগ্রহ, এবং মিথ্যাত্ব, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, হাস্য, রতি, আরতি, শোক, ভয়, জুগুপ্সা, বেদনা, রাগ দ্বেষ, এই চতুর্দ্দশ অভ্যন্তর পরিগ্রহ—এই উভয়বিধ পরিগ্রহকে সম্যক্‌রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহিংসাণুব্রতেও মুনিদিগের সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। পথে চলিবার সময় পায়ের তলায় পড়িয়া কোন জীব মরিল কি না অহিংসাণুব্রতী শ্রাবক সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারে না। মহাব্রত পালনের সময় মুনিকে কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে—নহিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে।

মুনিদিগের অনুষ্ঠেয় সমিতি পাঁচটী ও গুপ্তি তিনটী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জননী যেরূপ পুত্রের শরীর উৎপাদন, পালন এবং শোধন করেন, এই গুপ্তি ও সমিতিও সেইরূপ সম্যক্‌চারিত্ররূপ মুনির গাত্রকে উৎপাদন করে, পালন করে ও শোধন করে। (১১)

তিন প্রকার গুপ্তির নাম—মনোগুপ্তি, বাগ্‌গুপ্তি এবং কায়গুপ্তি। রাজা যেমন রাজধানীকে প্রাকার ও পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত করেন, যতিও সেইরূপ রত্নত্রয়-ভ্রংশরূপ বিপৎ হইতে গুপ্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করেন। (১২) রাগাদি ত্যাগের দ্বারা চিত্তের স্থির অবস্থানকে মনোগুপ্তি বলে। দুরুক্তি পরিত্যাগ (১৩) অথবা মৌনাবলম্বনকে বাগ্‌গুপ্তি বলে। দেহের প্রতি মমত্বত্যাগ অথবা সর্ব্বকায় ক্রিয়া পরিত্যাগের নাম কায়গুপ্তি। (১৪)

পাঁচ প্রকার সমিতির নাম যথা—ঈর্য্যাসমিতি, ভাষা-সমিতি, এষণাসমিতি, আদাননিক্ষেপণসমিতি ও উৎসর্গ-সমিতি। (১৫) দিবাভাগে সঙ্কুচিতাবয়বে, ধীরপাদক্ষেপে, অনন্যমনে, পার্শ্বে না চাহিয়া এবং সম্মুখের তিন হাত পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে প্রাণিহিংসা না হয় এরূপভাবে যে গমন তাহার নাম ঈর্য্যাসমিতি। হিত, পরিমিত ও স্পষ্টার্থ সংযত বাক্য কথনের নাম ভাষাসমিতি। শরীর রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বথা বিশুদ্ধ, দীনভাবে অযাচিত, সৎকুলাদি হইতে গৃহীত, পরিমিত অন্ন যথা সময়ে দোষরহিত ভোজনের নাম এষণা-সমিতি। পুস্তক কমণ্ডলু প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করিবার সময় উহা ভালরূপে দেখিয়া ও পিচ্ছিকার দ্বারা পরিষ্কার

(১০) পথে যাইবার সময় পিচ্ছিকার দ্বারা তাঁহারা প্রথমে পথ পরিষ্কার করিয়া লন; না হইলে গমনকালে পায়ের চাপে কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট হইতে পারে।

(১১) অনাগার ধর্ম্মামৃত ১৪।১৫।৩ (১২) ঐ ৪।১৫৫। (১৩) ধর্ম্ম-বিষয়ক কথা ব্যতীত অন্য সকল কথাই দুরুক্তি শব্দের বাচ্য। (১৪) ঐ ৪।১৫৬ ও উহার কুমুদচন্দ্র কৃত টীকা।

(১৫) প্রাণিহিংসা পরিহারার্থং সম্যগয়নং সমিতিঃ। (সর্ব্বার্থ সিদ্ধিটীকা)

করিয়া গ্রহণ এবং উহা রাখিবার সময় যে স্থানে রাখা হয় সেই স্থানকে ভালরূপে দেখিয়া ও ঝাড়িয়া রাখার নাম আদাননিক্ষেপণসমিতি। জন্তুশূন্য ও সুদৃষ্টস্থানে প্রাণিনাশ না হয় এরূপভাবে মলমূত্রাদিত্যাগ ও শয়নের নাম উৎসর্গসমিতি। (১৬) পদ্মফুলের উপর জল যেমন দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ সমিতি শুদ্ধ সাধুকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। (১৭)

সমিতি ও গুপ্তির এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এইগুলি মহাব্রতের সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্যই অভিপ্রেত। ইহাদের সহিত যোগ হইলেই মহাব্রত উৎকর্ষলাভ করিতে পারে; নহিলে নয়। সমিতিগুলি অহিংসা মহাব্রতের সম্যগনুষ্ঠানের জন্য কতদূর প্রয়োজনীয় ও উহা রক্ষে কতদূর অনুকূল, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মুনির এই অনুষ্ঠান-গুলি যিনি সম্যক্‌রূপ পরিপালন করিতে পারেন, তিনি সকল দেশের এবং সকল লোকের বরণীয় ও পূজ্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

এতক্ষণ যে সম্যক্ রত্নত্রয়ের কথা বলা হইল, উহা ব্যবহার-রত্নত্রয়—উহা মুক্তির পরম্পরা কারণ,—সাক্ষাৎ কারণ নহে। নিশ্চয় সম্যক্‌ত্ব ও জ্ঞান ও চারিত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই সাক্ষাৎ মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যবহার রত্নত্রয়ের যে উপযোগিতা বা প্রয়োজন নাই, তাহা বলা চলে না। ব্যবহার-রত্নত্রয় না জন্মিলে নিশ্চয় রত্নত্রয় জন্মিতে পারে না—ব্যবহার রত্নত্রয় নিশ্চয়-রত্নত্রয়ের কারণ।

এক্ষণে নিশ্চয় রত্নত্রয়ের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আত্মা আছে এইরূপ দৃঢ়প্রতীতিই নিশ্চয় সম্যগ্‌দর্শন। এইরূপ প্রতীতি জন্মিবার পর আত্মসম্বন্ধে যে জ্ঞান বা আত্মানুভূতি, তাহাই নিশ্চয় সম্যগ্‌জ্ঞান। আত্মজ্ঞানীর যে চারিত্র—আত্মজ্ঞান জন্য যে অমন্দনিন্দানুভব—আত্মপ্রত্যক্ষ জন্য যে আত্মাতিরিক্ত বিষয়ান্তরের সহিত অসংস্পর্শ, তাহাই নিশ্চয় সম্যক্‌চারিত্র। নামগত ভেদ থাকিলেও এস্থলে জৈন দর্শনের সহিত বৈদিক দর্শনের কতকটা সামঞ্জস্য আছে। আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞান হইতেই যে মুক্তিলাভ হয়, এ কথা বৈদিক দর্শনও মানিয়া থাকেন। (১৮)

(১৬) অনগারধর্ম্মামৃত ৪। ১৬৩—৬৯। (১৭) ঐ ৪।১৭১।

(১৮) 'জিনবাণী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাক্‌লীওয়াল রচিত হিন্দী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মন্দিরে—কি সিন্ধুনীরে ?

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ জগন্নাথ ?
পুণ্যধামে এসে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত ?
দেখলে ভেবে রয় না দ্বিধার ধুক্‌ধুকুনী বুকটিতে,
বক্ষ মাঝে তেম্‌নি আছ, যেমন আছ মুক্তিতে।
চেয়ে হেরি সকল ঠাঁয়ে কি তারকা, কি গ্রহে,
অনন্ত নীল মহিমাতে, দেবালয়ের বিগ্রহে।
অসীম হতে সসীম পথে নিত্য তোমার যাতায়াত,
সিন্ধুতীরে, শ্রীমন্দিরে, তোমায় নমি জগন্নাথ !
শিল্প শোভায় তেম্‌নি আছ, যেমন আছ নিসর্গে,
আছ তুমি সংসারেতেও, যেমন বিরাগ বিসর্গে।
সংগ্রামে শূর তেম্‌নি আছ যেমন শুভ শান্তিতে,
রুদ্রে আছ, শিবেও আছ, উত্তালতায়, ক্ষান্তিতে।
সৃষ্টি পালন লয়ের মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
চক্রগদায় ধ্বংস করো, শঙ্খ পদ্মে কর ত্রাণ,
অন্ন দিয়ে পালন কর, বন্যা দিয়ে সমুৎখাত,
স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি, তোমায় নমি জগন্নাথ !
শান্ত-সাকার, তুমিই আবার অপ্রশান্ত নিরাকার,
জ্ঞান ধ্যানের অতীত তবু ভক্তজনের বইছ ভার।
মহোৎসবের উপচারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেল্‌ছ পায়ে অর্ঘ্যচয়।
শ্রীমন্দিরে তোমার পাতা মধুপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্দণ্ড লীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন।
মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব ঢুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
দারুব্রহ্ম,—বারিব্রহ্ম, তোমায় নমি জগন্নাথ !

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৩)

দুই বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ঘুরিয়া উমা পিতা ও ঠাকুর মায়ের সহিত আবার প্রসাদপুরে ফিরিল।

তখন পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, ছেলেদের মধ্য হইতে পূজার গল্পও শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠে তখন ধান পাকিয়াছে, কৃষকেরা কাস্তে হাতে, কোমরে মলিন গামছা বাঁধিয়া ধান কাটিতে অগ্রসর হইয়াছে; তাহাদের মুখ আনন্দে দীপ্ত, চক্ষু উজ্জ্বল।

শরতের আকাশ শুভ্র নির্ম্মল। তাহার তল দিয়া দলে দলে পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যায়। উমা মুক্ত ছাদে আসিয়া এই দৃশ্যটী প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়খানাও শান্ত হইয়া গেল। সে হৃদয়ের প্রচুর খাদ্যলাভ করিল। যদিও পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি উমার মনে হইল, পূজা এখনও শেষ হয় নাই; জগজ্জননীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান; প্রকৃতি এখনও এক সুরে গান গাহিয়া তাঁহার বন্দনা করিতেছে।

পার্শ্বেই ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে। তাহার তরঙ্গবেগ মন্দ হইয়া আসিয়াছে, জলের মলিনত্ব কমিয়াছে।

উমা পিতার পানে ফিরিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি এত জায়গায় গিয়েছ, এত দেখেছ, কিন্তু বোধ হয় আমার মতই কোনও জায়গাকে পছন্দ করতে পার নি। এখানে বিশ্বের সৌন্দর্য্য সব যেন জেগে আছে, এখানেই বিশ্বের দেবতা রয়েছেন। বাবা, এখান হতে প্রণাম করলেই তো তাঁর পায়ে গিয়ে পৌঁছায়,—তবে তীর্থ যাওয়া কেন?"

অমরনাথ বলিলেন, "সে কথা ঠিকই মা। মনকে যেখানে নির্দ্দিষ্ট করে দেখিয়ে দেবে, সে সেখানেই দেখবে। যথার্থ জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা মনের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পান। কোনও ভিন্ন জায়গা আছে—যেখানে ভগবান নির্দ্দিষ্ট হয়ে বাস করছেন—তা তাঁরা বলেন না। একটা কথাই তো আছে মা—মন মে চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা। অবশ্য মুচি তার চামড়ার আধারের মধ্যে গঙ্গা পেয়েছিল —এ হচ্ছে কেবল বিশ্বাস আর ভক্তি মা; আর কিছু নয়। আমরা যে অত বিশ্বাসী হতে পারিনে উমা! বিশ্বাস করতে যাই; তার মধ্যে থেকে একটা কূট প্রশ্ন আসে—কেন! এই কেনটাই সব মাটি করে দেয়, আমাদের বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে। ভক্তি-বিশ্বাসের উপরেই ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের তা নেই যে মা, তাই আমরা জোর করে সেই ভক্তি-বিশ্বাস আনবার জন্যেই পূজা, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করি।"

উমা বলিল, "বাস্তবিক বাবা—তীর্থে গিয়ে আমি তো

শান্তি পাইনি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি কি যেন হারিয়ে ফেলেছি, কি যেন পেছনে ফেলে এসেছি। এই গ্রামের বুকে দাঁড়িয়েই আমার মনে হল, সব ফিরে পেলুম, আমার কিছু অভাব আর নেই।"

উমা আসিয়াছে, এ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। উমাকে ভক্তি না করিত, ভাল না বাসিত, এমন লোক কেহই ছিল না। প্রাণপণে উমা জগতের মঙ্গল সাধনই করিয়া যাইতেছিল, নিজের পানে চাহিতে সে একেবারেই ভুলিয়াছিল। গ্রামের সকলেই আসিয়া উমার সহিত দেখা করিল, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, কেহ আশীর্ব্বাদ লইয়া গেল।

বহু দিন পরে বিন্দু নিজের ছেলেটীকে কোলে লইয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

অনেক কাল তাহাকে উমা দেখিতে পায় নাই। আজ প্রায় তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে—বিন্দু এক দিন মাতাল স্বামীর হাতে প্রপীড়িতা হইয়া, তাহার নিকট হইতে শেষ দান লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে আর আসে নাই। উমা খোঁজ লইয়া জানিয়াছিল, তাহার স্বামী তাহাকে ও তাহার পুত্রটীকে লইয়া কলিকাতায় কার্য্য করিতে গিয়াছে। এই দুঃখিনী রমণীর কথা ভাবিয়া উমা শান্তি পাইত না। আহা, কত না জানি সে নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে! হয় তো না খাইতে পাইয়া পথে দাঁড়াইয়া ভিক্ষাও তাহাকে করিতে হইতেছে! উমা দু তিনবার তাহার খোঁজ করিয়াছিল, কিন্তু কোন সন্ধানই পায় নাই।

আজ বিন্দুকে দেখিয়া উমা বাস্তবিকই আনন্দিতা হইল, তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা ছিলে এত দিন?"

বিন্দু যাহা বলিল তাহা এই—তাহার স্বামী তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল। উমার উপদেশে বিন্দু চলিয়াছিল; তাই সে হারা স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে। তাহার স্বামী বাস্তবিকই এখন সৎ হইয়াছে। সে নেশা করা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সৎপথে থাকিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছে। আজ তিন দিন হইল সে এখানে আসিয়াছে। আজ দিদিমণির কাছে আসিয়া একবার তাহার পায়ের ধূলা মাথায় না দিয়া, কাল প্রাতে কিছুতেই সে কলিকাতায় যাইতে পারিবে না।

বিন্দু ছেলেটীর মাথায় উমার পায়ের ধূলা দিল, নিজের মাথায় দিয়া চোখের জল ফেলিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদিমণি, যেন স্বামি-পুত্র রেখে মরতে পারি। যেন ওদের এমন সৎ দেখেই মরে যাই। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার কাছে দেবতার কথা। তুমি বল দিদিমণি, তোমার কথাই সত্যি হবে।"

এই নির্ম্মল ভক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই উমার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তাহার চোখেও জল আসিয়া পড়িল, সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি যে বল বিন্দু, তার কিছু ঠিক নেই। আমায় ভগবান বলে দিলেন, তাই আমি তোমায় বলেছিলুম। আমার আশীর্ব্বাদে কি হবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই সফল হবে।"

বিন্দু ছাড়িল না—"ভগবানকে আগেও তো বলেছি দিদিমণি, তিনি তো আমায় একটা কথাও বলেন নি। তুমি যা বললে, তাই তো সত্যি হল। তুমিই আমার ভগবান দিদিমণি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদেই ফল হবে, আর কিছুতেই নয়।"

আশীর্ব্বাদ লইয়া সে পুত্র লইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল আনন্দে কয় দিনই উমার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই সময় উষার একখানা পত্র পাইয়া সে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

পিতার সেই উইলের কথা এত দিন উষা ও আর সকলের কাছেই গোপন ছিল। উমারও সে কথা মোটেই মনে ছিল না। আজ উষার পত্র পাইয়া তাহার মনে সে কথা পুনরায় জাগিয়া উঠিল।

তাহাদের দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যাপী ভ্রমণের কথা উষা লিখিয়াছে। ঠাকুর মায়ের যে সব তীর্থই করা হইল, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, সে কথাতেও সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। সব শেষে লিখিয়াছে—'দিদি, শুনিলাম বাবা একখানা উইল করিয়াছেন, এবং তাহাতে তোমাকেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মনে ভাবিয়ো না, আমি নিজে হইতে কোনও কথা বলিতেছি,—তোমার ভগিনীপতির কথাই লিখিতেছি। তিনি শুনিয়া অনেক কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, এ

উইলের কথা যেন মিথ্যাই হয়,—ইহার মূলে যেন সত্য না থাকে। যদি যথার্থই এ কথা সত্য হয়, তবে দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মুখ চাহিয়া বাবাকে নিবৃত্ত হইতে বলিবে। তোমাদের নামে যে কেহ কোনও কথা বলিবে, ইহা আমার অসহ্য। দিদি, তোমরা আমায় যাহাই বল না, সবই আমার সহ্য হয়; কিন্তু এখানকার কোনও কথা আমার সহ্য হয় না। শ্বশুর-বাড়ীর কেহ যদি বধূর বাপের বাড়ীর কাহারও নিন্দা করে, কোন বধূই তাহা সহ্য করিতে পারে না। যদিও আমি আজ বাড়ীর গৃহিণী—কারণ, তুমি হয় তো জান না—আমার শাশুড়ী আর এ জগতে নাই, কিছু দিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন—এবং সন্তানের মা,—তথাপি দিদি, আমার পিত্রালয়ের চেয়ে প্রিয় কেহই নহে। আগে তোমাদের পাইয়াছি। আমার সংসার তোমাদেরই কৃপায়। তাই দিদি, তোমাদের কেহ কোন কথা বলিলে আমার বুকে বাজে বজ্রাঘাতের মতই। আমি তোমাদের যাহা খুসি তাহাই বলিতে পারি—কিন্তু ইহারা কোনও কথা বলিবে কেন? দিদি, ইহাদের এই নিন্দা করিবার সুযোগটুকু দিয়ো না। তোমায় কেহ যেন স্বার্থান্ধ না বলিতে পারে—আমি সেইটুকু কেবল চাই। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় নিস্তার দাও, আমার গর্ব্ব করিবার মত মুখটা রাখিয়া দাও। বাবাকে বলিয়ো—উহা কেবল বিষবৃক্ষের বীজই রোপণ করিবে,—ইহাতে যে বিষফল ফলিবে, তাহা ভক্ষণে সকলেই মরিবে। যেমন করিয়া পারো বাবাকে নিরস্ত কর, তুমি তফাতে থাকো।'

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে উমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—তাহার কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানা পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছু ধারণাতেই আনিতে পারিল না—কিসে কি ঘটিয়া গেল, কেন এমন হইল।

নিজের বুদ্ধিতে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া—অমরনাথ যেখানে বাহিরের ঘরে বসিয়া জমিদারীর কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, সেখানে দাসীকে পাঠাইয়া দিল,—শীঘ্র যেন তিনি একবার আসেন।

দাসী যেরূপ ব্যস্ততার সঙ্গে গিয়া খবর দিল, তাহাতে অমরনাথ তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ফেলিয়া রাখিয়া উমার কাছে আসিলেন। উমা বারাণ্ডায় দেয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—সামনে উহার খোলা পত্রখানা পড়িয়া ছিল।

"কি মা, কি হয়েছে?"

ব্যগ্রতার সহিত অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন। উমা কথা না কহিয়া পত্রখানা তুলিয়া তাঁহার হাতে দিল।

অমরনাথ পত্রখানা পড়িলেন। চক্ষু দুইটী শূন্যে রাখিয়া তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উমা তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি এখন কি করব বাবা? আমায় তুমি একেবারেই সব হ'তে বঞ্চিতা করছ কেন? আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?"

অমরনাথ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'তে তোমায় বঞ্চিতা করেছি উমা? আমি যা করেছি, তা ভাল বলেই করেছি। এতে তোমার নিজেকে এতটা দুঃখী মনে করা উচিত নয়। বাপ মা যা করে, সে সন্তানের ভালর জন্যেই করে থাকে। সন্তানের মন্দ হোক, এ প্রার্থনা কেউ কি করে মা? তুমি যে আমার মেয়ে! আমি তোমায় যা দিয়ে যাচ্ছি, এ তোমাকেই সাজে, আর কাউকেই সাজে না।"

উমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন সাজবে না বাবা? সেও তো তোমার মেয়ে, সে তো জলে ভেসে আসেনি?"

পিতা কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "সে সব কথা তো তোমায় আগেই বলেছি মা। তুমি বিধবা, তোমার যে কিছুর উপরেই দাবী নেই। তোমায় চিরকালই লোকের কাছে হাত পেতে থাকতে হবে উমা,—লোকের অনেক কথাও তোমায় সহ্য করতে হবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তাই তোমার একটা উপায় করে দিয়ে গেলুম। তারা তোমায় স্বার্থান্ধা বলছে, বলুক মা, তুমি তাদের কথা শুনো না। তাদের সব আছে, তোমার কি আছে মা? যত দিন আমি আছি, তত দিন তুমি জানছ তোমার সব আছে। আমি চলে গেলেই যে তোমার সব দিক ভেঙ্গে পড়বে। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সব যাবে, তোমার গোবিন্দজী হতাদরে পথের পাশে লুটাবে। তোমায় তারা শুধু দৈহিক

খাটাবে না, তোমার মনখানাকেও অপবিত্রতায় ভরে দেবে। না মা, আমি অনেক ভেবেছি, আর আমায় ভাবিয়ো না। আমার ভাবনার ফল এই উইলখানা, আমি আর নূতন কিছু করব না, করতে পারব না।"

উমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

পিতা বলিলেন, "আবার কি মা?"

উমার কণ্ঠ একেবারেই জড়াইয়া আসিতেছিল,—অতি কষ্টে সে বলিল, "উষার সঙ্গে যে একেবারেই বিচ্ছেদ হয়ে গেল বাবা,—সে যে মনে মনে আমায় তার শত্রু বলে জেনে নেবে।"

গম্ভীর কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "লোক চেনা যাবে এইখানেই মা! ভাই বোন—কেউই যে আপনার নয়—এইখানেই দেখ তার দৃষ্টান্ত। অর্থ এমন জিনিস নয় উমা, এ নিমেষে মানুষকে পরিবর্ত্তিত করে দিতে পারে! ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, সবাই তাকায় অর্থের দিকে,—এইখান দিয়েই তাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দিয়ে যায় কেবল বাপ-মায়ে,—তারা কিছুই নিতে চায় না। অনেক সময় দেখতে পাবে, ছেলে মেয়ে বাপ মাকেও কাঁদাচ্ছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুনতে পাবে না—কোনও বাপ মায়ে সন্তানকে কাঁদাতে সমর্থ হয়েছে। তারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চিন্তা করে না, করতে পারে না। মা, ছি, চোখের জল ফেল না। অর্থ আমি তোমায় তো দিচ্ছিনে, তোমার হাতে দিয়ে জীবরূপে নারায়ণের সেবা করাব, তাই দিয়ে যাচ্ছি। তাদের দিলে তারা নিজেদের ব্যবহারে লাগাবে, ভগবান একটু পাবেন না, তাই তাদের দিলুম না, তুমি তাই ভাল না কেন মা? তুমি কে, আমিই বা কে? এই সম্পত্তিই বা কার? ভগবানের আদেশে আমরা এসেছি,—তাঁরই সম্পত্তি আমরা পেয়েছি তাঁরই কাজে লাগাবার জন্যে,—নিজের ভোগ সুখের জন্যে তো নয়। আমি পরের জন্যে আমার সবই উৎসর্গ করেছি, নিজেকেও করেছি,—তুমিও তাই করেছ মা,—তাই তোমার হাতে তার দিয়ে যাচ্ছি।"

উমা পিতার কথা বুঝিল; তাই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলিল, "অর্দ্ধেক উষাকে দাও না বাবা।"

অমরনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "এক পাইও দেব না উমা। তার নেই কি? সবই তো আছে। কোটী টাকা আছে তার ঘরে, কিন্তু ভিখারী তার দরজায় পায় গলাধাক্কা। সে টাকায় কি হচ্ছে সে খবর রাখো? ভোগই ভোগকে উপভোগ করে,—নিত্য নূতন ভোগের কামনা বুকের মধ্যে আরও জাগিয়ে তোলে। বাসনার নিবৃত্তি দূরে থাক, উত্তরোত্তর বাসনা আরও বেড়ে চলেছে। ঘরে যাও মা, পূজা কর গিয়ে,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর গিয়ে, যেন তাঁর কাজ তোমার দ্বারা শেষ হয়। নিজেকে উপযুক্ত করে তোল, অত কোমল হলে চলবে না।"

উমার মাথায় হাত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া তিনি আবার বাহিরে গেলেন।

(২৪)

পিতার মৃত্যুদিন যে এত শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিবে, তাহা উমা বুঝিতে পারে নাই। আজ সাত আট দিন হইল জ্বর হইয়াছে,—একাজ্বরী অবস্থায় তিনি বিছানায় পড়িয়া। গৃহ-চিকিৎসক শ্রীনাথবাবু দেখিতেছিলেন। আজ তিনি দেখিয়া মুখখানা বিকৃত করিলেন।

অমরনাথ মলিন হাসিয়া বলিলেন, "কি রকম দেখলেন শ্রীনাথ বাবু?"

সঙ্কুচিত ডাক্তার বলিলেন, "না, তেমন কিছু নয়।"

অমরনাথ বলিলেন, "অনর্থক মিথ্যে কথাগুলো বলে আর কি ফল হবে ডাক্তার? আমি নিজের শরীরের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। আমার হৃৎপিণ্ডের কাজ খুব ধীরে ধীরে চলছে,—যে কোনও মুহূর্ত্তে হঠাৎ তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আপনি ও তাই দেখলেন তো?"

সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল মুখখানার পানে চাহিয়া ডাক্তার মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন না, বলিলেন "সে কথা সত্য।"

অমরনাথ ক্লান্তিভরে চক্ষু দুইটী মুদিত করিয়া বলিলেন, "আঃ, বড় শান্তি। আজ আমায় যে কথা শুনাতে ভয় পাচ্ছিলেন শ্রীনাথবাবু, আপনি কি জানবেন—আমি কত কাল ধরে তার প্রতীক্ষা করচি! দিন যায়—রাত যায়, আমার মনের মধ্যে কে আর্ত্তনাদ করে কেঁদে

উঠে বলে—এখনও সময় হয় নি। আর কত কাল—ওগো, আর কতকাল এখানে পড়ে থাকব? আমার শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে আসছিল, আমার মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠছিল। আমার সংসারে থাকতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না শ্রীনাথ বাবু, এখনও ইচ্ছে নেই। আঃ, কি শান্তিদায়ক এই মৃত্যু, কি ঠাণ্ডা তার হাতখানা! যখন সে হাত আমার বুকে দেবে, দেখতে দেখতে আমার বুকের এই ক্ষীণ স্পন্দন টুকুও থেমে যাবে,—আমার জ্বালাময় তপ্ত দেহখানা মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে। কখন আসবে শ্রীনাথ বাবু, কখন সে বন্ধু আমার আসবে?"

নিঃশব্দে শ্রীনাথ বাবু বসিয়া রহিলেন।

উমা গৃহে আসিয়া গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া পিতার মুখে দিতে গেল—"বাবা, ওষুধ এনেছি।"

অমরনাথ চাহিলেন, হাসিমুখে বলিলেন, "আর কেন মা ওষুধ দেওয়া? এত দিন শুধু তোমার ব্যাকুলতাতেই ওষুধ খেয়েছি—মা, আর কেন এ সময়ে ওষুধ দিতে আসছ? ওষুধে কি মৃত্যু নিবারণ হয় মা,—ডাক্তার কি তার আসার পথে ব্যাঘাত দিতে পারে? মা আমার, আর ওষুধ নয়, এখন গঙ্গা জল দিয়ো, আর অন্য জল দিয়ো না। গীতাখানা পড় মা, সেই আমার প্রকৃত ওষুধের কাজ হবে। কল্যাণময়ী উমা আমার, তোমার বাবা বলা যে শেষ হয়ে এসেছে, এখন মেয়ের যোগ্য কাজ কর।"

"বাবা—"

উমা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল "না বাবা, ও কথা তুমি ব'ল না,—ওতে যে আমার বুকখানা ফেটে যায়,—আমি যে জগৎ আঁধার দেখি।"

অমরনাথ কন্যার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল অজ্ঞাতে গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তারের পানে চাহিয়া বিষণ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "দেখেছেন ডাক্তার বাবু, মায়াকে দমন করতে পারে, এমন লোক জগতে বড় কম। আমি সংসারের সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যাচ্ছি, তবু,—আমার উমার কথা ভেবে আমি চোখের জল রাখতে পারছিনে। উমা, মা আমার, ছি, কাঁদছ কেন মা? তুমি কেঁদে আমাকেও যে কাঁদাচ্ছ। আমার যাবার সময় হয়েছে, এ সময় তুমি যদি অমন করে কাঁদ মা, আমি শান্তি পাব না যে! জান তো মা, মায়াবন্ধের অধোগতির কথা,—আমায় আবার সংসারে ঘুরিয়ে আনবে—এই কি তোমার ইচ্ছা? তুমি যে কল্যাণী, জগতের কল্যাণ করবে—তোমার বাপের কল্যাণ করবে না?"

উমা চোখ মুছিয়া উঠিল, "করব বাবা। আগে তোমার কাজ, তার পরে জগতের কাজ। তুমি আমায় যে কাজ দিয়ে যাচ্ছ, আশীর্ব্বাদ করে নেয়ো—যেন তা শেষ করে যেতে পারি।"

তখনই সে দুইখানি টেলিগ্রাম করিবার জন্য শ্রীনাথ বাবুকে পাঠাইয়া দিল,—একখানি মনীশ ও একখানি মৃন্ময়কে করিয়া দিবার জন্য। এ সময় তাহাদের আসা নিতান্ত দরকার।

বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, আর্ত্ত স্বরটা বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, আত্মদমন করিয়া উমা গীতা লইয়া পিতার মাথার কাছে বসিল। তাহার বাহিরের জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—জাগিয়া রহিলেন সম্মুখে মৃত্যু-শয্যা-শায়িত পিতা, আর হাতে সেই গীতাখানি। তাহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। মনে জাগিতে লাগিল—পিতা চিরকালের জন্য বিদায় লইতেছেন,—তাঁহাকে এ সময়ে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু দেওয়া। ইহার পরে আর সে এমন সময় পাইবে না,—হাহাকার করিয়া মরিলেও না।

বগলা দেবী অতি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আজকাল তিনি বড় একটা হাঁটিতে চাহিতেন না। তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছাইল—অমরনাথ শেষ শয্যায় শায়িত। যে কোনও মুহূর্ত্তে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন।

বৃদ্ধা অতি কষ্টে কোন মতে অমরনাথের গৃহে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রন্দনে বিলাপে গৃহখানা মুখরিত হইয়া উঠিল। উমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই বৈকাল বেলা অমরনাথ প্রশান্ত মুখে ভগবানের নাম করিতে করিতে কন্যার কোলে মাথা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রস্তর-গঠিতা দেবী-

প্রতিমার ন্যায় পিতার মাথা কোলে লইয়া উমা তখনও বসিয়া রহিল।

মনীশ বা মৃন্ময় কেহই আসিয়া পৌঁছিল না। দেওয়ান চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া বলিলেন, "এখন কি হবে উমা?"

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "কিসের কি হবে কাকা?"

দেওয়ান তাহার শান্ত ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘ বয়সের মধ্যে দেখিতে পান নাই। উমার অশ্রুহীন চোখ তাঁহার চোখে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিল; কথা কহিতে গিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পিতার মাথা সযত্নে কোল হইতে নামাইয়া উপাধানে রাখিতে রাখিতে উমা বলিল, "কাঁদবেন না কাকা, এতে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। তিনি সকলকেই কাঁদতে নিষেধ করেছেন; বলেছেন, কাঁদলে তিনি যেতে পারবেন না। আপনি সৎকারের কথা বলছেন? বাইরে রাষ্ট্র করে দিন—বাবা আর নেই, সংসারের মায়া কাটিয়ে তিনি চলে গেছেন। এ কথা শুনবামাত্র এখনি হাজার হাজার লোকে এসে বাড়ী ছেয়ে ফেলবে,—সবাই তাঁকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবে। আমার বাবা তো তেমন লোক ছিলেন না কাকা, আমার বাবা যে দেবতা ছিলেন—।"

উমার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃতের শান্ত মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল।

দেওয়ান কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমি সে কথা বলছিনে মা। বাইরে হাজার হাজার লোক এসে হাহাকার করছে, বাড়ীর মধ্যে বলে কেউ আসতে পারছে না। তুমি এবার অন্য ঘরে যাও, তোমার ঠাকুর মাকে দেখ গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, কেউ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারে নি। তোমায় পেলে তিনি অনেকটা ঠাণ্ডা হবেন'খন। আমি সে সব কথা বলছি নে মা, আমি বলছি আর এক কথা।"

উমা নত মুখে কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "দাহ করার কথা কাকা?"

দেওয়ান বলিলেন, "হ্যাঁ মা।"

উমা বলিল, "মনীশ-দা, মৃন্ময়, কেউ আসে নি?"

দেওয়ান বলিলেন, "এখনই ষ্টেসন হতে লোক ফিরে এল, কেউ আসে নি। আজ রাত্রে তো আর ট্রেণ নেই কলকাতা হতে আসবার। ভোরের সময় একখানা ট্রেণ আসে, সেই ট্রেণখানায় সব আসতে পারে। কিন্তু—এমন দেবতুল্য লোকের দেহটা বাসি হয়ে যাবে যে মা। আমাদের যে সংস্কার আছে, বাসি মড়া হলে তার গতি হয় না। আমি তাই যে ভাবছি—ভেবেও তো কিছু ঠিক করতে পারছিনে।"

উমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একান্ত অসহায়ার ভাবে সে দেওয়ানের পানে তাকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই তো কাকা।"

দেওয়ান চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিবেন, তাহা তিনিও ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

উমা বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু—তা আমি করতে দেব না কাকা, আমার বাবার এ দেহ আমি বাসি হতে দেব না,—এর আজই সৎকার করা চাই। কাকা, আমি মুখ-অগ্নি করলে কি হবে না? বাবা যে আমায় বড় ভালবাসতেন কাকা, আমার আগুন দেওয়া কি শাস্ত্র-সম্মত হবে না?"

দেওয়ান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অগত্যা তাই করতে হবে মা, নইলে বাসি মড়া রাখতে হয়। কিন্তু পারবে মা? এ বড় শক্ত কাজ যে। জগতে যে তোমার বড় আপনার ছিল, সেই স্নেহময় বাপ্পা—তাঁর মুখে নিজের হাতে আগুন তুলে দিতে পারবে তুমি?"

উমা হাসিল। সে যে কি হাসি, তাহা দেওয়ান বুঝিলেন। উমা বলিল, "পারব কাকা, না পারলে চলবে না যে। আমার বাবাকে শেষ খেতে দিয়েছি আমি, শেষ ভগবানের নাম শুনিয়েছি আমি, এত করে এই কাজটা করতে পারব না? আমি এত দুর্ব্বল নই কাকা, আমি বেশ আগুন দিতে পারব। দেখবেন, আমি একটু ভেঙ্গে পড়ব না।"

বাস্তবিকই দেওয়ান তাহা দেখিলেন। শ্মশানে পিতাকে চিতায় শোয়াইয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া, অকম্পিত হস্তে সে পিতার মুখে আগুন দিল।

ধূ ধূ ধূ—

চিতা জ্বলিতে লাগিল, অগ্নি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে উমার

এ জগতের সর্ব্বস্ব স্নেহময় পিতার দেব-শরীরখানা বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে লাগিল। কাছেই একটা বকুল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া বসিয়া উমা চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বকুল ফুল ঝরিয়া তাহার মাথায় পড়িল, গাছের উপর শবভুক শকুনীদল ডানা ঝাড়িল, অদূর হইতে পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। খুব নিকটে একদল শৃগাল বিকট রবে চেঁচাইয়া উঠিল, শবদাহকারীরা—বল হরি—হরি বল—বলিয়া গগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

দেওয়ান উমাকে অনেক আগেই লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উমা কিছুতেই রাজি হয় নাই। ক্রন্দনরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়াছিল—"শুধু আজকের দিনটা কাকা—আজ আমায় ক্ষমা করুন—আপনার বাধ্য আমি কখনই হব না। আমি প্রথম হতে বাবার কাছে আছি, শেষ পর্য্যন্ত থাকব। নিজের হাতে খাইয়েছি যাঁকে, দেখব, তাঁর সেই শরীরটা কেমন করে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। আমি নিজের হাতে জল তুলে এই চিতা ধুইয়ে দিয়ে যাব কাকা, এ কাজ আমি কাউকে করতে দেব না।"

উমা দেখিতেছিল, কত অল্প সময়ে কত বৎসরের সযতনে রক্ষিত দেহখানা কেমন করিয়া ছাই হইয়া যায়। আঃ, এই দেহটাকেই না কত যত্ন করা—এ যে সবই বৃথা। কত জিনিস দিয়া এই দেহটাকেই না সাজানো হয়,—কত ভোগে এই দেহটাকেই না পুষ্ট করা হয়। সবই মিথ্যা যে! হায়, এর মধ্যে সত্য কি? সত্য জীবনের মাঝে কই? সত্য যে এই মরণের মাঝেই প্রতীয়মান হয়। ওগো সত্য,—হে চিরন্তন, হে অনন্ত, অসীম, আমার মাঝে কবে তুমি ফুটিয়া উঠিবে? আমার চারিদিককার মিথ্যার দেওয়ালগুলা খসিয়া খসিয়া পড়িবে—শেষে একেবারেই মিথ্যা হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে চিন্তা করিবার মত কিছুই পাওয়া যাইবে না। বন্ধু আমার, কবে আসিবে তুমি? আমার কলঙ্কময় চিত্ত পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তুলিতে, আমায় নিত্য জ্ঞানের সাগরে ভাসাইতে কবে আসিবে তুমি বন্ধু? জগৎ যে আমার চোখে ছায়াই হইয়া গিয়াছে, সে থাকিয়াও যে নাই! প্রবঞ্চনা আমায় জানাইয়াছে সব মিথ্যা,—এখানে সত্য শুধু তুমি, আর কিছু নাই। যত দিন বুঝি নাই, তত দিন এই মিথ্যাকেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। এ আমার চক্ষে মোহের অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল। আজ সেই মিথ্যাই অতর্কিত আঘাতে আমার চেতনা ফিরাইয়া দিয়াছে। মিথ্যাকে দিয়াই আমি মিথ্যাকে চিনিতে পারিয়াছি। এ জগৎ যে শুধু প্রবঞ্চনায় ভরা,—এ যে শুধু বুকই ভাঙ্গিয়া দেয়। জীবন কালের প্রথমেই যে আঘাত লাভ হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্য ফিরিয়াছে, সংসারের অসারতা তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ছায়া—মিথ্যা—এই যে জগতের উপাদান। বন্ধু আমার—ওগো সত্য, তুমি কবে আসিবে—কবে তোমায় তুমি আমার মাঝে প্রকাশ করিবে?

জ্বলিয়া জ্বলিয়া চিতা নিভিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উমা কলসী করিয়া জল আনিয়া চিতার উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল।

বোল হরি—হরি বোল—

শবদাহকারীরা যখন ফিরিল—তখন রাত তিনটা।

অন্ধকারে বাড়ীখান দৈত্যের মতন দাঁড়াইয়া। উমা সহজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না,—তাহার বুক হাত পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

দেওয়ান তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। এতক্ষণ সে যে উত্তেজনাবশে কাজ করিতেছিল, সে উত্তেজনা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে,—অবসাদ তাহাকে এখন বড় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

"চল মা, বাড়ীর মধ্যে চল।"

"আমি কি করে ভেতরে যাব কাকা, আমি যে বাবাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম—।" অস্ফুট স্বরে উমা কাঁদিয়া উঠিল।

দেওয়ান সস্নেহে তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার, তুমি কাঁদছ, এটা যে মোটেই মানায় না মা। তোমার বাবা স্বর্গে গ্যাছেন,—আবার তাঁর জন্যে তুমি কাঁদছ। চল মা, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

সে রাত্রি উমা মোটেই শুইতে পারিল না,—দেয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ান দ্বারের কাছে বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই নীরব শোকের প্রতিমূর্ত্তিকে তিনি যে কি সান্ত্বনা দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

ক্রমশঃ

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশ

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পিএচ্-ডি, পি-আর-এস, আই-ই-এস

কলেজের 'লং-ভেকেসান' হওয়াতে সপরিবারে মধুপুরে হাওয়া খাইতে আসিয়াছি। এখন ভাদ্র মাস। মধুপুরে এখনও হাওয়া খাইবার 'সিজন' (season) আসে নাই। অধিকাংশ বাঙ্‌লোই খালি। হাওয়া ভিন্ন সমস্ত জিনিসই দুর্ম্মূল্য। মাছ খাওয়া অভ্যাসটা ভুলিয়া যাইবার মত হইয়াছি। শুনিতেছি 'সিজন' আসিলে মাছটাছ পাওয়া যাইবে। সেই আশাতেই সিজনের অপেক্ষায় রহিলাম।

এখন গৌণচন্দ্রিকা ছাড়িয়া, যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাই বলি। মধুপুর, দেওঘর, বৈদ্যনাথ, গিরিডি, সিমুলতলা প্রভৃতি সাঁওতালপরগণার সহরগুলি দেখিলে, মনে স্বতঃই এই কথাই জাগে যে, বাঙ্গালীও সুন্দর উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে—বাঙ্গালীও 'সেট্‌লার' হইতে পারে। নিকটবর্ত্তী জামতাড়া, সিহিজাম ও কারমাটারে এখনও ছোট ছোট উপনিবেশ আছে; তাহাদের আয়তনের বৃদ্ধি অদূরে সাধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাঁওতালপরগণা এখন বাঙ্গালার বাহিরে; সুতরাং এই সকল সহর এখন বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশী উপনিবেশ হইতে চলিল। বাঙ্গালী স্বাস্থ্যকর স্থানের অন্বেষণ উপলক্ষে এই সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসিগণ বাঙ্গালীদিগকে ভয় ও সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকে। এখানকার যত বড় বড় বাড়ী ও বাঙলো সবই বাঙ্গালীদের। বাঙলোগুলি ভারি সুন্দর। প্রত্যেকটি ১।২।৩ বা ততোধিক বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত। বাটীর চারিধারেই বাগান। বাঙ্গালী যে এরূপ নয়নাভিরাম সহর নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা জঙ্গল ও ডোবা পরিপূর্ণ বাঙ্গালার পল্লী বা বায়ু-চলাচল-বিরহিত কলিকাতার উত্তরাংশ দেখিলে সহসা বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই এখন অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী তাই স্বাস্থ্যান্বেষণে বাঙ্গালার বাহিরে চারিদিকে আবাস-ভূমি খুঁজিয়া এই সকল সহর নির্ম্মাণ করিয়াছে।

শুধু সাঁওতালপরগণা নহে,—সিংভূম জেলায় ঘাটশিলা, গালুডি, গিড্‌নি প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্য-উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। ঘাটশিলা প্রায় মধুপুরের মত হইয়া উঠিতেছে। এখানে পাহাড় পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেওঘর, মধুপুর অঞ্চল হইতে আরও সুন্দর। সুবর্ণরেখা প্রভৃতি গিরিনদীর জল খুব স্বাস্থ্যকর। নিকটেই জামসেদপুর। সেখানকার প্রকাণ্ড লৌহের কারখানায় বিস্তর বাঙ্গালী কাজ করে। তবে জামসেদপুর ও টাটানগর বাঙ্গালীর কীর্ত্তি নহে—উহা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশও নহে। আরও দূরে পুরুলিয়া ও রাঁচীতে অনেক বাঙ্গালীর বসবাস আছে। সেখানেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্যান্বেষী। হাজারিবাগ আরও সুদূরে। বাঙ্গালী সেখানেও গিয়াছে, তবে সেখানে সংখ্যায় তাহারা কম।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বারাণসীর বাঙ্গালীটোলা বাঙ্গালী সহর। যেমন কলিকাতার বড়বাজার মাড়োয়ারী পল্লী, কাশীর বাঙ্গালীটোলা সেইরূপ বাঙ্গালী পল্লী। কাশী ক্যাণ্টনমেণ্ট বা শিকরোলেও অনেক বাঙ্গালী থাকেন। এখানে বাঙ্গালী যে শুধু স্বাস্থ্যান্বেষণে আসিয়া থাকে, তাহা নহে। কাশী হিন্দুর পরম তীর্থস্থান। সুদূর অদূর হইতে সকল হিন্দুই কাশীতীর্থ দেখিতে আসে। বাঙ্গালী স্বাস্থ্যের জন্য এবং ধর্ম্মোদ্দেশ্যে—এই দুই কারণে কাশীবাসী। সুদূর বৃন্দাবন বাঙ্গালীর সহরও বলা যায়, পশ্চিমের লোকের সহরও বলা যায়। এখানে বাঙ্গালী আসে স্বাস্থ্যের জন্য নহে—প্রধানতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে।

স্বাস্থ্যান্বেষণে বাঙ্গালী উড়িষ্যায় গিয়াছে। পুরী, ভুবনেশ্বর বাঙ্গালীর অন্যতম স্বাস্থ্য-নিবেশ। পুরীতে সমুদ্রের সুমহান দৃশ্য, জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু একত্র বিরাজমান। বাঙ্গালী সেইজন্য পুরীর

মহাভক্ত। ভুবনেশ্বরের জল খুব ভাল। ভুবনেশ্বর তীর্থস্থানও বটে। সেইজন্য ভুবনেশ্বর ক্রমশঃ বাঙ্গালীর একটি স্বাস্থ্য-উপনিবেশ হইয়া উঠিতেছে। স্বাস্থ্যের অন্বেষণে বাঙ্গালী সমুদ্র-উপকূলে সুদূর ওয়াল্‌টেয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সমুদ্র উপকূলের বায়ু যেমন সারা বৎসর 'নাতিশীতোষ্ণ' এবং সেই কারণে ব্যাধিবিশেষে উপকারী, সেইরূপ পর্ব্বতের শীতবায়ুও ব্যাধিবিশেষে মহোপকারী। সেইজন্য স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী হিমাচলেরও আশ্রয় চাহিয়াছে। তাই কারসিয়ং, দার্জ্জিলিং কতক পরিমাণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশ। কতক পরিমাণে বলার এই উদ্দেশ্য যে কারসিয়ং, দার্জ্জিলিং প্রধানতঃ সাহেবী সহর। দার্জ্জিলিং বাঙ্গালা সরকারের গ্রীষ্মাবকাশ। কারসিয়ংও প্রধানতঃ সাহেবরাই স্থাপন করে। বাঙ্গালী 'দীন যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে যথা'—সাহেবদের সহিত স্বাস্থ্যান্বেষণে এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে। এখন এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক। গ্রীষ্মের ও পূজার সময় দার্জ্জিলিং-এ থাকিবার স্থান পাওয়া মুস্কিল হয়।

মোটামুটি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য উপনিবেশগুলির পরিচয় দিলাম। এখন উহাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত জাতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে—যথা মাড়োয়ারি, দিল্লীওয়ালা, পেশোয়ারী, শিখ, পাঠান প্রভৃতি—তাহারা অধিকাংশ আসিয়াছে ব্যবসা উপলক্ষে। লোটাকম্বল সম্বল লইয়া মাড়োয়ারি কলিকাতায় আসিয়া কাপড় প্রভৃতির ব্যবসায়ে লক্ষ ও ক্রোড়পতি হইয়াছে। দিল্লীওয়ালা, পেশোয়ারী পাঠান, কাবুলী প্রভৃতি জাতিরা কলিকাতায় মেওয়া, শাল, পাথরের জিনিস, কার্পেট প্রভৃতির ব্যবসা খুলিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালী সাধারণতঃ অব্যবসায়ী ও শ্রমবিমুখ। বাঙ্গালীর আছে মাথা ও কলমের জোর, আর আছে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্মসার জীর্ণ দেহ। সেইজন্য উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, বাঙ্গালী সেখানে গিয়াছে—প্রফেসার, উকীল, ডাক্তার, বা কেরাণী সাজিয়া, অথবা স্বাস্থ্যান্বেষণে। ভাগলপুর, পাটনা, বাঁকিপুর প্রভৃতি বেহারের বড় বড় সহরে, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যুক্তপ্রদেশের সমৃদ্ধিশালী সহরে বাঙ্গালীর ছোট বড় উপনিবেশ আছে। সে সকল স্থানে বাঙ্গালী প্রধানতঃ প্রফেসার, উকীল, ডাক্তার ও কেরাণী হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য গিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালী পশ্চিম-ভারতের একপ্রকার শিক্ষাগুরু ছিল। এমন কোনও কলেজ প্রায় ছিল না, যেখানে বাঙ্গালী প্রফেসার, এমন কি প্রিন্সিপ্যাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী না ছিল। সুদূর লাহোর, অমৃতসর, প্রভৃতি পঞ্চনদের বড় বড় সহরের অনেক কলেজে বাঙ্গালী এখনও প্রফেসারের কার্য্য করিতেছেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি আছেন এবং নিজ নিজ কার্য্যে কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। বিশেষ গৌরবের কথা—প্রায় একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের—কলিকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মহীশূর—ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন বাঙ্গালী। বিদ্যাবত্তার জোরে বাঙ্গালী সংসার সেন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এখনও এল্‌বিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী এবং মিষ্টার চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় মন্ত্রীরূপে সগৌরবে কার্য্য করিতেছেন। এই সব অঞ্চলে ব্যবসায়ী বাঙ্গালীও আছেন; কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশ ছোট বা মধ্যবিৎ দোকানদার। কলিকাতার মাড়োয়ারিদিগের মত ধনী মহাজন পশ্চিম-নিবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে একজনও নাই।

তাই বলিতেছিলাম, প্রধানতঃ দুইটি কারণে বাঙ্গালী পশ্চিম-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে—প্রথমতঃ তাহার প্রধান সম্বল মস্তিষ্কের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ—স্বাস্থ্যান্বেষণে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালী 'কুলী' নাম ধরিয়া কোথাও যায় নাই। আড়কাটীর কুহকে পড়িয়া আসামের চা-বাগানে বা অন্যত্র কোনও কোনও বাঙ্গালী কৃষক কুলী সাজিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সোণার বাঙ্গালা 'সুজলা সুফলা' বলিয়া বাঙ্গালার কৃষককুলকে বাঙ্গালার বাহিরে 'কুলী' হইয়া যাইতে হয় নাই। বাঙ্গালী উকিল ও এডভোকেট হইয়া সুদূর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, মউলমিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে গিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু মাদ্রাজীদের মত ব্রহ্ম বা মালয় উপদ্বীপে কুলী হইয়া যায় নাই। আজ ভারতের বাহিরে যাহারা প্রধানতঃ কুলী

হইয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ মাদ্রাজী, গুজরাটী, শিখ প্রভৃতি জাতি। বাঙ্গালী প্রধানতঃ কূপমণ্ডুক। তার উপর বাঙ্গালা সুফলা। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকেও বাঙ্গালার বাহিরে কায়িক পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রায়ই যাইতে হয় না। ইহাতে সব সময়ে যে সুফল লাভ হইয়াছে, তাহা নহে। বাঙ্গালীর কৃষককুল ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। তাই সাঁওতালপরগণা ও ছোটনাগপুরের বহু সাঁওতাল, কোল, ভীল পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বসবাস করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে। বাঙ্গালার তাবৎ কলে লক্ষ লক্ষ পশ্চিমনিবাসী বা উড়িয়া মজুর ও শ্রমিক কাজ করিয়া, দুর্ব্বল বাঙ্গালী শ্রমিককে ঐসকল স্থান হইতে তাড়াইতেছে।

এখন স্বাস্থ্যান্বেষণে বাঙ্গালী যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আগে 'বাঙ্গালার অকাল-মৃত্যু ও অকাল-বার্দ্ধক্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি—"শাস্ত্রে বলিয়াছে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ'। কলিকালে বিশুদ্ধ ঘৃত ত পাওয়া যায় না। এখন 'ঋণং কৃত্বা বায়ু পীবেৎ'।" এখানে সেই কথারই পুনরুক্তি করিতে চাহি। মস্তিষ্কই যখন বাঙ্গালীর প্রধান মূলধন, তখন মস্তিষ্কোপজীবী শিক্ষিত বাঙ্গালী পক্ষে মস্তিষ্ককে সতেজ ও সবল রাখিতে হইলে, ছুটিছাটা পাইলেই এই সকল স্বাস্থ্য-উপনিবেশে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। মনে রাখিবেন, আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন—বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন প্রভৃতি—তাঁহাদের অনেকেই পঞ্চাশের পূর্ব্বেই আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াছেন। তাহা ছাড়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই 'কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ', অকালবৃদ্ধ। অত্যধিক মস্তিষ্কের চর্চ্চাই উহার প্রধান কারণ। মাঝে মাঝে বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ এই সকল স্বাস্থ্য-নিবাসে ঘুরিয়া গেলে, চিরপরিচিত কালি-কলম-কাগজ-বহির সংস্পর্শ হইতে মস্তিষ্ক বিশ্রামলাভ করিতে পারিবে,—শিক্ষিত বাঙ্গালী অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। বিলাতের দৃষ্টান্ত একবার দেখুন না। যাই স্কুল, কলেজ বা পার্লামেণ্ট বন্ধ হইল—অমনি সকলেই লণ্ডন ছাড়িতে পারিলেই বাঁচে। কেহ গেল সমুদ্রোপকূলে, কেহ স্কটলণ্ডের হাইল্যাণ্ডে, কেহ সুইজার্লণ্ডে, কেহ বা আলপ্‌স্ পর্ব্বতারোহণে। কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্ক এইরূপে ছুটি পাইয়া পুনরায় সতেজ হইবার অবসর পাইল, এবং ফিরিয়া আসিয়া ইংরাজ কর্ম্মবীর আবার নবীন উদ্যমে কর্ম্মে লাগিয়া গেল। আমি নিজেদের ও জাতির মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ছুটিছাটা পাইলেই এই সকল স্বাস্থ্য-উপনিবেশে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

সেই সঙ্গে স্ত্রী কন্যাকেও আনিতে ভুলিবেন না। পল্লীগ্রামে মেয়েরা তবু কতকটা এবাড়ী সেবাড়ী করিয়া বেড়াইতে পায়; কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি সহরে তাহারা চিরদিন খাঁচায় পোরা থাকে। ইহাতে আমাদের কন্যা-জননীদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়—থাইসিস্, অকালবার্দ্ধক্য এখন তাঁহাদের নিত্য সহচর। তাঁহাদের সঙ্গে আনিলে তাঁহারা একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এই সকল স্থানে মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায় অবাধে বেড়াইয়া বেড়ান। মুক্ত বাতাসে স্বাস্থ্য তাঁহারা ফিরিয়া পান।

মুস্কিলের কথা এই যে, হঠাৎ দুই দশ দিনের জন্য এ সকল স্থানে আসিয়া থাকিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। অধিকাংশ স্থানেই কোনও হোটেল বা বোর্ডিং হাউস নাই। হোটেলে বাস করা এখনও আমাদের অভ্যস্ত হয় নাই। দার্জ্জিলিংএ গরমের বা পূজার সময় এত বাঙ্গালী যে স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য যায়, তাহার প্রধান কারণ, সেখানে যাইতে হইলে বাড়ী ভাড়া করিতে হয় না, চাকর বাকরের দরকার নাই, আহারের ভাবনা নাই। দার্জ্জিলিংএ স্যানিটেরিয়াম ও কয়েকটি বোর্ডিং হাউস থাকাতে, দশ বিশ দিনের জন্যও সেখানে যাইলে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। পুরীতেও দুই একটি বোর্ডিং হাউস আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্বাস্থ্য-উপনিবেশেই হোটেল, বোর্ডিং হাউস বা স্যানিটেরিয়াম নাই। সাহেবদের ব্যাপার ঠিক উল্টা। তাহারা যেখানেই যায়, সেইখানেই একাধিক বড় বড় হোটেল তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে। দার্জ্জিলিং, কারসিয়ং, মুসৌরি, ডেরাডুন, শিলং প্রভৃতি স্থানে বড় বড় যে সকল বাড়ী, তাহার অধিকাংশই সাহেবদের হোটেল। হোটেল তাহাদের ভাত-ঘর। শুনিয়াছি, আলপ্‌স্

পর্ব্বতারোহীর জন্য আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের সু-উচ্চ স্থানেও হোটেল আছে। দিন কতক পরে খুব সম্ভব মাউণ্ট এভারেষ্টের উপরও সাহেবী হোটেল বিরাজ করিবে। বাঙ্গালীর হোটেল কি বাঙ্গালীর এই সকল স্বাস্থ্য-উপনিবেশে চলে না? বার মাস না চলিলেও অধিকাংশ সময় কি চলে না? উৎসাহী যুবকবৃন্দকে আমি এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে আহ্বান করিতেছি। হোটেলাদি না থাকাতে, এই সকল স্বাস্থ্য-উপনিবেশ হইতে বাঙ্গালী পুরামাত্রায় উপকার লাভ করিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে আমি বহু বৎসরের প্রবাসের অভিজ্ঞতায় জানি যে, এখানে আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সকলেই স্বাস্থ্যান্বেষণে আসিতে ও থাকিতে পারেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে বড় গরম পড়ে, সেই জন্য এখানে থাকা মুস্কিল। কিন্তু সেই সময়ে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল। আমি ত শ্রাবণ মাসে এ বৎসর আসিয়াছি, কিন্তু বেশ আছি। দুই তিন মাস ছাড়া এখানে বার মাস বাঙ্গালীর হোটেল, বোর্ডিং হাউস, স্যানিটেরিয়াম প্রভৃতি চলে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই প্রবাদটা যে কত সত্য, তাহা মধুপুর প্রভৃতি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশগুলির একটি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতেছি। বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন গেল—প্রধানতঃ জঙ্গল ও ডোবার জন্য। বাসগৃহের পাশেই বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ, পুষ্করিণীর পাড়, বড় বড় গাছের বন। আর ডোবা, সে ত প্রায় প্রত্যেক বাটীর পিছনে, সাম্‌নে, ডাইনে, বাঁয়ে। পাড়ের গাছের পাতা পচিয়া ও মলমূত্রের সংমিশ্রণে পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীর জল অপেয়, অব্যবহার্য্য। ডোবাগুলি মশার সূতিকাগার। আর গাছপালা, বনজঙ্গল দিবাভাগে মশককুলের আরামের আবাস। সন্ধ্যাকালে ইহারা আপন আবাস হইতে বাহির হইয়া সদলে জীর্ণ বাঙ্গালীর দেহকে আক্রমণ করে ও ম্যালেরিয়ার বিষ দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। গাছপালা দিয়া জঙ্গল বানাইবার এই অভ্যাস এই সকল সুন্দর স্বাস্থ্য-উপনিবেশেও বাঙ্গালী পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এখানকার এমন ছবির মত বাগানবাটীগুলি, সমে গাছ-পালার জঙ্গল হইয়া উঠিতেছে, এক একটা বাটীর প্রাঙ্গণ ও বাগান এত বড় বড় গাছপালায় পরিপূর্ণ যে, বাহির হইতে দিবাভাগেই তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ বাটীগুলি যদি স্বাস্থ্য-নিবাস হয়, তাহা হইলে সুন্দর-বনও বিনা পয়সা খরচে স্বাস্থ্য-উপনিবেশ হইত। বাগানত বন নহে। আমার যদি সরকার বাহাদুর দিনকতক এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেন, তাহা হইলে এক দিনেই বাঙ্গালীর এই বাগানের নামে বন তৈয়ারি করা কতুয়নের শাস্তি করি। এবং যিনিই বাটীতে আম, কাঁঠাল, শিশু, মহুয়া প্রভৃতি গাছ পুঁতিবেন, তাঁহারই জেলের ব্যবস্থা করি। তাহা না হইলে দিনকতক পরে বাঙ্গালীর এই কীর্ত্তি সকল, বাঙ্গালীর এই স্বাস্থ্য-উপনিবেশগুলি, ক্রমেই ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পরিণত হইবে।

রাজগী!

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১১)

আমি যখন নিজেকে এমনি সকলের পরিত্যক্ত ও নিরাশ্রয় বলিয়া মনে করিলাম, যখন সমস্ত জগৎ আমার কাছে বিষের মত মনে হইল, তখন আমি আমার সকল বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া একা কলিকাতার পথে পথে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতাম—পাগলের মত এই মহানগরীর কর্ম্ম-কোলাহলের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতাম। আমার মাষ্টার মহাশয় বলিতেন, "তুমি কেন হেঁটে বেড়াবে? একখানা মোটর কেনো, না হয় কুকের বাড়ী থেকে নিদেন একটা জুড়ী ভাড়া করে' রেসের মাঠে হাওয়া খেয়ে এসো।" আমি বুঝিলাম আমার সঙ্গে জুটিয়া, মোটর বা জুড়ীতে কলিকাতায় বেড়াবার লোভ এঁর যথেষ্ট আছে। আমি এ কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিলাম। অগ্রাহ্য করিতে আমার কোনও ভয় ছিল না; কেন না, লোকটার এমন মজ্জা ছিল না, যাতে সে আমাকে জোর করিয়া কোনও কথা বলে। আমার সে নীরব ভাবে খোসামুদী করিত—ভৃত্যের মত আমার সেবা করিত। ঠিক নরেন বাবুর পর ইহাকে দেখিয়া আমার ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা আরও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

এক দিন ট্রামে চড়িয়া এস্‌প্লানেডে গেলাম। সেখান হইতে সোজা ময়দান দিয়া দক্ষিণে চলিলাম। তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িলাম কালীঘাটে। হঠাৎ একটা লোক আমার পায়ের উপর পড়িয়া প্রণাম করিল। তার একটু পরে একটী স্ত্রীলোক ঘোমটা টানিয়া আসিয়া আমার পায়ে গড় হইয়া পড়িল। দেখিলাম, পুরুষটি বিপিন, ও তার সঙ্গিনীটি বিধু।

আমার মনটা তখন ভয়ানক খাঁ খাঁ করিতেছিল,—আপনাকে আমি পরিপূর্ণ রূপে নিঃসঙ্গ ভাবিয়া, একেবারে গভীরতম বিষাদের ভিতর ডুবিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে বিপিন ও বিধুকে দেখিয়া যেন আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম—এদের চেয়ে নিকট আত্মীয় যে আমার আর নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিপিন যে! কোথা থেকে এলি এখানে?"

সে বলিল, সে মালীহাটির জমীদার-বাড়ীতে পাইকের কাজ করে। বাবুরা এখানে আসিয়াছেন, সেও সঙ্গে আসিয়াছে। বিধু তীর্থ করিবার আশায় সঙ্গ লইয়াছে। তাদের বাসা শ্যামবাজারে,—বিধুকে লইয়া সে কালী-মন্দিরে আসিয়াছিল।

আমার মনটা আনন্দে এত অধীর হইয়াছিল যে, আমি আমার পদমর্য্যাদা সব ভুলিয়া গিয়া, বিপিনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাদের সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলাম।

বিধু এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া ঘোমটার ফাঁক দিয়া অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে কেবল আমাকে দেখিতেছিল। তার চোখের ভিতর দিয়া প্রীতি, লজ্জা, আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। একবার আমি তার দিকে চাহিতেই, সে লজ্জিত ভাবে হাসিয়া মাটির দিকে চাহিল। অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া সে নববোঢ়ার মত লজ্জায় অবনত হইয়া উঠিল। আমিও লজ্জায় তার দিকে সোজা চাহিতে পারিলাম না,—তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কি যেন কিসের একটা সঙ্কোচ আসিয়া আমার গলা ও হাত পা চাপিয়া ধরিল। আমি কেবল বিপিনের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কদাচিৎ এক আধটা দৃষ্টি তার দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

বিপিন খানিকক্ষণ বাদে বলিল, "মহারাজের বাসা কোন দিকে?"

আমি বলিলাম, "পটলডাঙ্গায়।"

"তবে চলুন না, আমরা মহারাজের সঙ্গেই খানিকদূর যাই।"

আমি সম্মত হইলাম। বিপিন একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল। আমি উঠিলাম। বিধু একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, আমি অনেক কষ্টে সঙ্কোচ জয় করিয়া বলিলাম, "আয় না বিধু, এই সামনে বোস।"

তখন বিপিন তাহাকে একরকম ঠেলিয়া আমার সামনের আসনে বসাইয়া দিল, এবং নিজে গিয়া কোচবাক্সে গাড়োয়ানের পাশে বসিল।

তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ বিধু ও আমি চুপ করিয়া পরস্পরের দিকে বিমুখ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি কথা তার সঙ্গে বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। গাড়ী যখন ময়দানের কাছে আসিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইডেন গার্ডেন দেখেছিস বিধু?"

সে ঘাড় নাড়িল,—না। "হাওড়া ব্রিজ?" তাও না। কিছুই সে দেখে নাই। আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম, ময়দানের ভিতর দিয়া ইডেন গার্ডেনে যাইতে। অনেক জায়গায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রায় রাত্রি দশটার সময় বিধুকে তার বাসায় নামাইয়া দিলাম। এতক্ষণ আমরা অনেক কথাই আলাপ করিলাম; আমার সব কথা তাকে বলিলাম; সে কাঁদিল। তার সব কথা সে বলিল। বেশী কিছুই না সে কথা। তার মা মারা গিয়াছে। সে তার দাদার কাছেই আছে। লোকে তার উপর বড় উৎপাত করে, রক্ষক কেউ নাই, ভক্ষক আছে।

আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, আমি আমার কোঁচা দিয়া বিধুর মুখ মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলাম। আর সে নামিবার একটু আগে, তাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া একটি চুম্বন দিলাম।

সে ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বলিল, "ছি, রাজাবাবু, তোমার কি এ ভাল দেখায়!"

সে নামিলে পর আমি বিপিনকে বলিলাম, "তোদের সঙ্গে আর কখন দেখা হ'বে, আর কোথায়ই বা দেখা হবে?"

বিপিন বলিল, "আজ্ঞে মহারাজ, যখন হুকুম ক'রবেন, তখনই দেখা হ'বে—যেখানে হুকুম ক'রবেন।"

"কত দিন তোরা আছিস এখানে।"

"আজ্ঞে, এখনও মাস তিন চার আছি,—বেশীও হ'তে পারে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কাল তুই একবার আমার বাড়ীতে আসিস।"

পরের দিন বিপিন আসিল। সে দিনও সারা সন্ধ্যা বেলা বিধুকে গাড়ীতে লইয়া নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

দিন সাতেকের মধ্যে বিধুর জন্য একখানা বাড়ী ভাড়া হইল। আমি রীতিমত সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম।

মনোহর সার গদীতে চিঠির উপর চিঠি যাইতে লাগিল।

আমি মনকে এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, নিরাশ্রয় বিধুকে একেবারে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া আমার অন্যায় হইবে। তাহাকে আশ্রয় দিতে আমি বাধ্য; কেন না, আমার জন্যই সে এমন নির্ম্মম ভাবে আশ্রয়হীনা হইয়াছে।

বিধু কিছুতেই রাজী হয় নাই। সে বার বার আমাকে পায়ে ধরিয়া বারণ করিয়াছে; কিন্তু আমার ইচ্ছা তার কাছে চিরদিনই জয়ী হইয়াছে। কাজেই বিধু কলিকাতায় বাসা করিয়া রহিয়া গেল।

(১২)

কিছু দিন বেশ আনন্দে কাটিল—একটা নেশার ভিতর দিয়া কাটিল। দারুণ নৈরাশ্যের ভিতর হইতে উঠিয়া এ এক আনন্দের নেশায় জ্ঞান হারাইলাম।

কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক থাকিতে পারিলাম না। গোড়া হইতেই আমার মনের ভিতর নরেন্দ্র বাবুর শিক্ষা চাড়া দিয়া উঠিত। আমি হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতাম; কিন্তু তাহাতে আমাকে এই পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আমার যেন মনে হইল যে, বিধুকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আমি কাঙ্গাল,—পরমুখাপেক্ষী। পরীর মত স্ত্রী থাকিতে আমি পত্নী-সুখে বঞ্চিত। পৃথিবীতে একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ও গুরু আমার আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—কোনও দিকে জীবনে আমার কোনও সুখের সম্ভাবনা নাই। এই মরুভূমির মধ্যে বিধুই আমার একমাত্র বারি-বিন্দু; তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল এবং বিধু ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, ততই আমার মনের আর এক দিক দিয়া

অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম যে, বিধু আর আমাকে আগের মত আনন্দ দেয় না। এই দুই বছরে আমার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। যে চিত্ত লইয়া আমি প্রথম বিধুকে সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, সে চিত্ত আমার অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্র বাবুর কাছে দুই বৎসরের শিক্ষা আমার নৈতিক চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় করিতে না পারিলেও, আমার আকাঙ্ক্ষার রূপ ও আমার ভাল লাগা মন্দ লাগার মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। বিধুর নেশার প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়া গেলে আমি দেখিলাম যে, বিধু আমাকে এমন কিছুই দিতে পারে না, যা আমার চিত্তকে সম্যক তৃপ্তি দান করিতে পারে।

বিধুকে সুন্দরী বলিয়া আগে মনে করিতাম,—তখন সুন্দর তেমন দেখি নাই। তার পর সাবিত্রীর ভরা যৌবনের রূপ দেখিয়াছি,—কলিকাতায় অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, ইংরেজ, ঈহুদী, আরমাণী ও পারসী সুন্দরী দেখিয়াছি। তাদের দেখিয়া চোখ খারাপ হইয়া গিয়াছে। এখন আর বিধুর রূপের ভিতর তেমন মন-মাতান কিছু আমি খুঁজিয়া পাই না।

তা ছাড়া, যা'ও রূপ বিধুর আছে, তাহা সে সাজাইতে জানে না। সে বরাবরই আমার জন্য সাধ্যমত বেশভূষা করে, কিন্তু সাজিতে সে জানে না। কলিকাতায় কত রূপসী, কত অরূপা পোষাকের বাহারে, চুলের বাহারে, চলনের বাহারে মন মাতাইয়া দেয়। তাহাদের দেখিয়া দেখিয়া এখন বিধুর প্রসাধন-চেষ্টায় আমার মনটা বিরক্ত হইয়া উঠে।

বিধুর অন্তরে কোনও দিনই বিশেষ কিছু ছিল না। বুদ্ধি-সুদ্ধি তার কোনও দিনই ছিল না। তবে আগে তার বোকার মত কথাবার্ত্তা আমার বেশ লাগিত, আর খুব বিশেষ বোকার মতও মনে হইত না। এখন তার কথা শুনিয়া মনটা ভারি বিরক্ত হইয়া উঠে। তার কথা নিতান্ত বোকার মত, আর তার মতি-গতি অত্যন্ত ছোটলোকের মত। এই দুই বৎসরে আমার চিত্তের যে সুকুমারতা জন্মিয়াছিল, তার ফলে আমি বিধুর উপর ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম।

একটা দিক বিধুর আমি আজকাল আর দেখিতেই পাইতাম না—সে তার ভালবাসা। সে আমাকে ঠিক আগের মতই সম্পূর্ণ রূপে সমস্ত চিত্ত দিয়া ভালবাসিত। ভালবাসিত বলিয়া, সে এক দিকে আমার তৃপ্তির জন্য নিজেকে আমার ইচ্ছামত সাজাইত,—আমার কথায় সে উঠিত বসিত,—আমি এক দিন যা ভাল বলিতাম, রোজ তাই করিত। আবার আর এক দিকে সে আমাকে দুই হাতে ঠেলিত,—বার বার আমাকে বলিত এসব আমার অত্যন্ত অন্যায়,—ইহাতে আমার অপযশ হইবে, কলঙ্ক হইবে,—আমার ভাল হওয়া উচিত; ইত্যাদি। ক্রমে তার ভালবাসার এই দুই দিকই আমাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল।

এক দিন আমি ঠিক করিলাম, বিধুকে লইয়া রাজগঞ্জের ষ্টীমারে বেড়াইতে যাইব। বিধু মহা উৎসাহিত হইয়া সজ্জিত হইল। সে এমন বেশ-ভূষাই করিল যে, তাহাকে লইয়া যাইতে আমার লজ্জা বোধ হইল। সে বাড়ীতে ফিরিওয়ালা ডাকিয়া ভয়ানক ভয়ানক রঙ ও নমুনার সব জামা ও শাড়ী পছন্দ করিয়া করিয়া কিনিয়াছিল। সেই সাড়ী জামা পরিয়া, খোঁপার উপর দিয়া উৎকট মোমের ফুলওয়ালা কাঁটা পরিয়া সে আসিয়া হাজির হইল।

আমি তাহাকে সাদা-সিধে করিয়া সাজাইয়া লইয়া গেলাম। মনে আশা করিয়াছিলাম যে, বড় আনন্দ পাইব; কিন্তু ভয়ানক বিরক্ত হইয়া গেলাম। বিধুর প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেক ব্যবহার, প্রত্যেক গতিবিধি এত অশিক্ষিত ও এত ইতর মনে হইল যে, মনটা নিজের উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। খুব বিশ্রী মেজাজে ফিরিয়া বিপিনকে অযথা খানিকটা বকাবকি করিলাম। তার পর আমার বাসায় ফিরিয়া গেলাম।

বাসায় বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মনে হইল যে, বিধুর মনে আমি মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি। পরের দিন বৈকালে আমি স্থির করিয়া গেলাম যে, তাহাকে শান্ত করিব। গিয়া দেখি, বিধু বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছে।

আমি সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বসাইলাম। সে আরও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তার কান্নার হেতু বুঝিতে পারিলাম। সে যে কেবলি আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছে, জানিয়া শুনিয়াও

যে সে নিজেকে বা আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, এই দুঃখে সে কাঁদিতেছে।

হঠাৎ আজ আমার এই কান্না দেখিয়া রাগ হইয়া গেল; মনে পড়িল সাবিত্রীর গুরুগিরীর কথা। রাগের মাথায় আবার কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, সেই ভয়ে আমি নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

এক বৎসর না যাইতেই আমি হাঁপাইয়া উঠিলাম। বিধুকে যেন আমার গলায় বাঁধা পাথরের মত মনে হইল। তার প্রতি আমার এক ফোঁটা ভালবাসা রহিল না। তবু তার সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে ছাড়াইতে পারিলাম না,—কতক অভ্যাসের ফলে, আর কতক কর্ত্তব্যের দায়ে।

কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা আমার একেবারে যায় নাই। বিধুকে আমি ছাড়িতে পারিতাম না বটে, কিন্তু এজন্য আমি নিজেকে তিরস্কার করিতে কখনও ত্রুটি করি নাই। এটা যে পাপ, অকর্ত্তব্য, আমার চরিত্রের অগৌরবকর, হীন একটা কাজ, সে অনুভূতি আমার বরাবরই ছিল। কিন্তু সে অনুভূতি আমাকে পীড়া দিলেও, আমার রক্তের গতি কমাইতে পারিত না। তা ছাড়া, আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে এ জ্ঞানটা হইয়াছিল যে, আমি বিধুকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে পারি না। তাহাকে বিদায় দিতে হইলে, তার এমন একটা ব্যবস্থা করা আমার উচিত, যাহাতে সে বিনা কষ্টে দিন কাটাইতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা করিবার শক্তি এখন আমার নাই। মনোহর সার গদীতে টান বড় বেশী পড়িয়াছে।

যাহা হউক, বিধুকে আমি দুই বৎসর বহিয়া বেড়াইলাম।

প্রথমে বিধু যে বাড়ীতে ছিল, সেটা ভদ্র-পল্লীতে। সেখানে তাহার প্রকৃত পরিচয় যখন লোকে পাইল, তখন বাড়ীওয়ালা তাহাকে উঠাইয়া দিল। তার পর আর দুই এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করিয়া তাড়িত হইয়া, শেষে বিপিন একটা ঘর লইল বেশ্যাপল্লীতে। এ অঞ্চলে বাড়ীর ভাড়া বড় বেশী, আর তাও অগ্রিম দিতে হয়, তাই স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া না করিয়া, দুইখানা ঘর লওয়াই স্থির হইল। একখানা ঘরে বিপিন থাকে; আর একখানায় থাকে বিধু।

এমনি করিয়া বিধুর সহিত সম্পর্কসূত্রে আমার বেশ্যা-বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় হইল। বাড়ীওয়ালী আমার সঙ্গে ভয়ানক আত্মীয়তা করিতে লাগিল। বিধুকেও সে যত্ন করিতে লাগিল। ক্রমে আমি বিধুকে লুকাইয়া এদিক সেদিক যাতায়াত করিতে লাগিলাম; এবং শেষে বিধুকে ছাড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলাম।

যখন বিধুকে আমি ছাড়িলাম, তখন তার কোলে একটি ছেলে। তখন ধর্ম্মবুদ্ধি আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি বিধুর সঙ্গে আমার অন্য একটি ইয়ারের আলাপ করাইয়া দিয়া, পলায়ন করিলাম।

আমার স্ত্রী লিখিল, "শুনিতে পাইলাম, তুমি পড়াশুনায় ভয়ানক শৈথিল্য করিতেছ, এবং এবার পরীক্ষা দিতে চাহিতেছ না। আশা করি, তুমি এ রকম করিবার চেষ্টা করিবে না। মনোযোগ করিয়া পড়াশুনা করিয়া পাশ করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া পড়াশুনা করিবে।"

চিঠিখানা অভ্যাস অনুসারে আগুনে না দিয়া আমি অন্যমনস্কভাবে খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই কয়টা কথা পড়িতেই মাথায় খুন চাপিয়া গেল। আমি তখনি ছুটিলাম কলেজে। সেই মাস পর্য্যন্ত বেতন দিয়া নাম কাটাইয়া দোকান হইতে এক বোতল মদ কিনিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মাষ্টারকে বলিলাম, "আমার পড়া শুনা হ'য়ে গেছে—এখন বিদায় হ'ন।"

মাষ্টারকে বিদায় দিয়া বাড়ীতে ইয়ার-বন্ধু ডাকিয়া ফুর্ত্তি করিতে লাগিলাম।

স্ত্রীকে লিখিলাম, "আর চিঠি লিখে হাত ব্যথা করো না। আমি পড়া-শুনা ছেড়েছি এবং নরকের পথে খুব বেগে যাত্রা ক'রেছি। তোমার কবল ছাড়াবার অন্য উপায় খুঁজে পেলাম না। তুমি অন্য শিষ্যের জোগাড় করো।" (ক্রমশঃ)

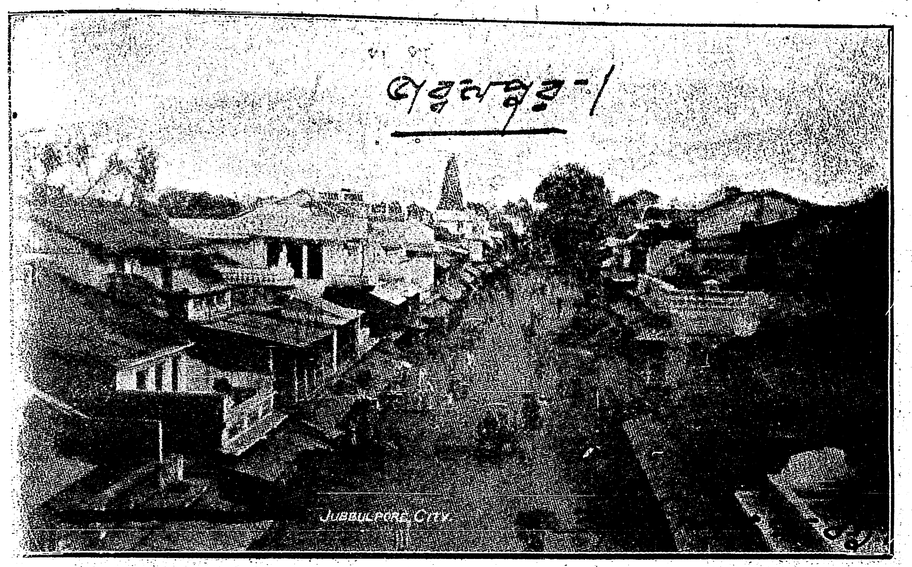

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ

বিগত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' 'নর্ম্মদার দেশে'র এক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এত দিন পরে তাহার আর এক অংশ 'জব্বলপুর' নাম দিয়া পাঠকপাঠিকাগণের হস্তে দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। এই অংশে আমি জব্বলপুরের মদনমহল হইতে আরম্ভ করিব।

মদনমহল ও তৎসন্নিহিত প্রান্তর জব্বলপুর সহরের অধিবাসীবৃন্দের Excursionএর এক সুন্দর স্থান। জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নির্ম্মল নিশীথে বা কপোত-কূজন-মুখর দ্বিপ্রহরে প্রীতিনিলয় সুহৃদবৃন্দের বা অভিন্নহৃদয়া জীবন-সঙ্গিনীর সাহচর্য্যে সময় অতিবাহনের এমন নির্জ্জন মনোরম স্থান জব্বলপুরে আর নাই। এইরূপ সুন্দর স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণের কল্পনা যাঁহার মনোমধ্যে প্রথম উদিত হইয়াছিল, তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার উদ্দেশে মনে মনে সহস্রবার সাধুবাদ দিলাম। সেই সুবিস্তীর্ণ সৌধ আজ মানব-পরিত্যক্ত—সারমেয়কুলের আবাসভূমি। এক দিন যে প্রান্তর অসংখ্য বীরের অসি-ঝন্‌ঝনায় অনুরণিত ছিল, এক দিন যে গৃহ অন্তঃপুরচারিণীগণের কলহাস্যে বিরাবিত ছিল, এক দিন যে অঙ্গন স্বাস্থ্য-সুন্দর শিশুর কলকূজনে মুখরিত ছিল, আজ সেখানে সারমেয়ের অস্ফুট চীৎকার, পেচকের বিকট ধ্বনি,—বন্য বিহঙ্গের কর্কশ আরাব। কালের করাল কবলে, মানবের নির্ম্মম অত্যাচারে, আজ সেই শ্রীসম্পন্ন রাজপ্রাসাদ বিজন কাননে পরিণত হইয়াছে।

এই দুর্গের ঐতিহাসিক সার্থকতা যাহাই থাকুক না কেন, কি জানি কেন, এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পুণ্যময়ী মহারাণী দুর্গাবতীর বীরত্বকাহিনী আমার কেবলই মনে আসিতেছিল। একবার ভক্তিভারাবনত অন্তঃকরণে সেই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিলাম। এই বিশাল অঙ্গনের প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্রতম মনে হইতে লাগিল। কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া মহীয়সী মহারাণী দুর্গাবতী—দৃপ্ত রণবেশ,—আলুলায়িত কেশ,—হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ,—নয়নে বরাভয়প্রদ দৃষ্টি,—অধরে স্নিগ্ধ-মধুর হাসি!

বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ আর্কের নামে ফরাসী-হৃদয় নাচিয়া উঠে, রাজ্ঞী ক্যাথারাইনের নামে সমগ্র রুসিয়া শ্রদ্ধায়, পুলকে অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু হায়, ভারতের এই বীররমণীর কীর্ত্তি-কাহিনী কেবলমাত্র দুই-একখানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ!

এইবার আমরা লাক্ষেমবাগে পৌঁছিলাম। শুনিলাম, এইখানে না কি লক্ষ আমগাছের বাগান আছে; তাই ইহার নাম লাক্ষেমবাগ। বাস্তবিকই, যে দিকে তাকাই—ঘনবিন্যস্ত আম্রবৃক্ষের শ্রেণী। "পল্লবঘন আম্রকাননে"র মধ্য দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, আমাদের অশ্ব

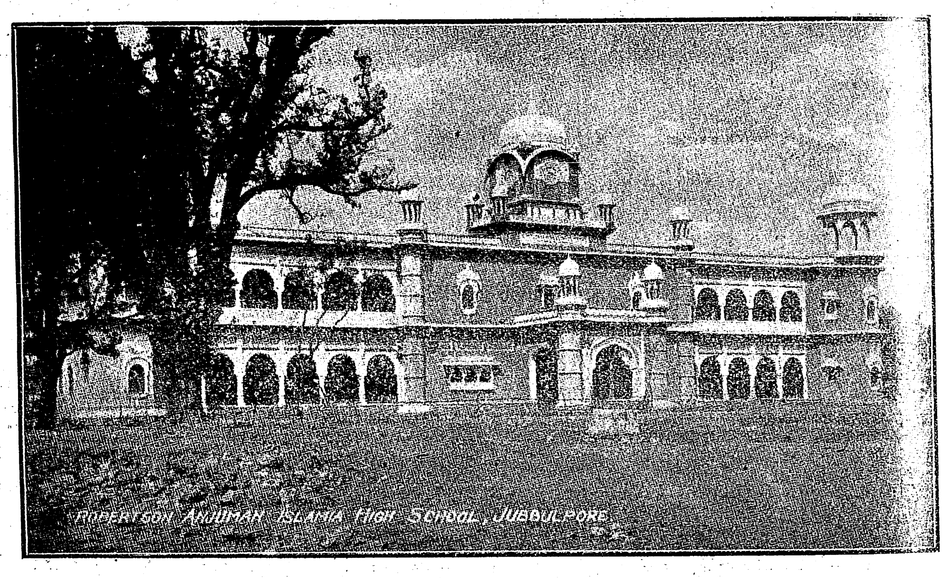

রবার্টসন আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া স্কুল—জব্বলপুর

দুইটি ছুটিয়া চলিল। বলিতে ভুলিয়াছি, আমাদের সহযাত্রী গোলায় রসুল সাহেব না কি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী। তিনি তাঁহার রাইফেলটি সঙ্গে লইতে ভুলেন নাই। লাক্ষেমবাগের মধ্য দিয়া গমন কালে তিনি অতি সতর্ক ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে চলিলেন,—উদ্দেশ্যটা বোধ হয় ঘুঘু শিকার। আমি হাসিয়া বলিলাম, "যাক, রাইফেল সাহায্যে দু'একটা চিড়িয়া শিকার করিতে পারিলে, রাইফেলটি বহিয়া আনা সার্থক হইবে, আর শিকারের ইতিহাসে রসুল সাহেবের নামও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।" রসুল সাহেব এই বিদ্রূপে বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ না হইয়া, আপন কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফের প্রান্তভাগে মোচড় দিতে দিতে গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন,—"বেশ ত, শের আনিয়া দিন,—মারিয়া দিতেছি।" শের আনিয়া দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত; কাজে-কাজেই নিরুত্তর হইয়া গেলাম। রসুল সাহেব কিন্তু কি মনে ভাবিলেন, জানি না; তবে ঘুঘুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে আর তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগী দেখিলাম না।

বেলা প্রায় ১টার সময় ভেড়াঘাটে পৌঁছিলাম। ভেড়াঘাট পুরাতত্ত্ববিদগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। রাণী অলহনা দেবীর শিলালিপি এইখানেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (Bheraghat stone inscription of Queen Alhana Devi—Chedi year 907)। পুরাতত্ত্বের কথা যাক্—ভেড়াঘাট হইতে সরকারী ডাকবাংলা প্রায় এক মাইল দূর। শুনিলাম, আগে ডাকবাংলা অবধি রাজপথ ছিল, গাড়ী তদবধি যাইতে পারিত; কিন্তু এই বৎসর নর্ম্মদায় ভীষণ বন্যা হওয়ায়, সেই রাস্তাটির চিহ্ন মাত্রও নাই। কাজে-কাজেই পদব্রজে চলিলাম। পথিমধ্যে এক ভগ্ন band গৃহ দর্শন করিলাম।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া কয়েক পেয়ালা চায়ের সদ্ব্যবহার করিয়া, নৌকা সংগ্রহে চলিলাম। স্থানীয় লোকেল বোর্ডের সুবন্দোবস্তে এখানে দুইখানি নৌকা রাখা হইয়াছে। তাহারই একখানি ভাড়া করিয়া আমরা নর্ম্মদায় পাড়ি দিলাম। নর্ম্মনটনা নর্ম্মদা অতল জলে আকুল কল্লোল তুলিয়া অধীর উল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই প্রবল প্রবাহ অতিক্রম করিয়া সাতটি দাঁড়ে বাহিত হইয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি মন্দ-মন্থর গমনে চলিল। নদীর উভয় পার্শ্বে মার্ব্বেল ও basalt প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রায় শত ফিট উচ্চ খাড়াই পাহাড়। সেই পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া

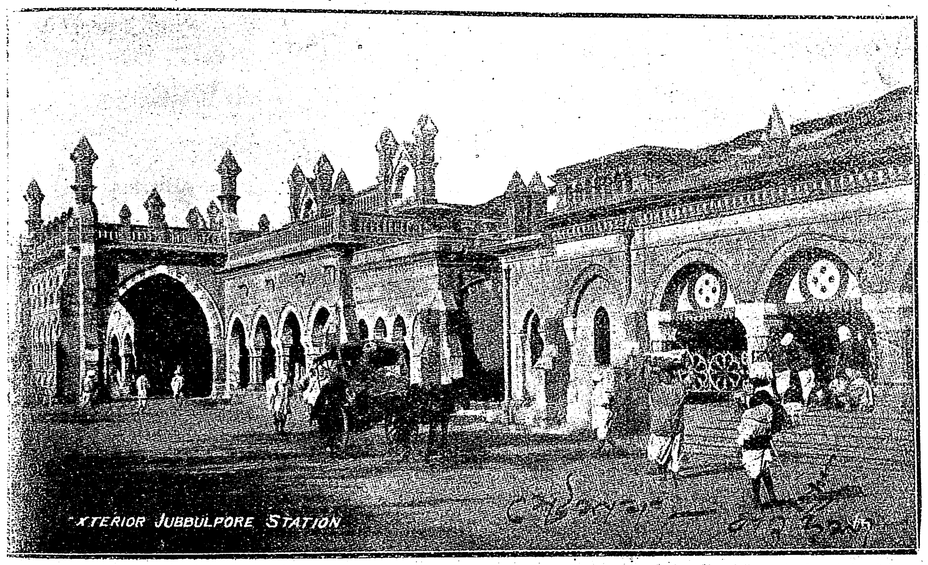

ষ্টেসন্ (বৃহদ্‌দৃশ্য)

প্রায় দুই মাইল পথ কাটিয়া বিসর্পগতিতে নর্ম্মদা বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই বুকের উপর দিয়া আমাদের তরণীখানি অস্ফুট কলরব করিতে করিতে চলিল। বন্ধুরা কেহ কেহ সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিতেছিলেন; মাল্লারা বারণ করিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, এই সব পাহাড়ে অসংখ্য মৌমাছি আছে। সিগারেটের ধূম্রবাসে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা ধূম্রপানকারীকে আক্রমণ করে। প্রায় ষাট বৎসর আগে দুইটি শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এখানে ধূম্রপান করিয়াছিলেন; তাহার ফলে মৌমাছি দংশনে তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটে। অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর আজও তাঁহাদের কবর দুইটি বিরাজমান থাকিয়া, সেই সুভীষণ মৌমাছি-দংশন কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জনৈক বন্ধু বলিলেন, "আমি জানি, গভর্ণমেণ্ট তদবধি মৌমাছি বধে মনঃসংযোগ করিয়াছেন; এবং মৌমাছি-বধ-পর্ব্ব অনেক দিন আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।" বন্ধুর কথাটির সত্যতাসত্যতা যাচাই করিবার সাহস কাহারও হইল না। আপন আপন সিগারেট নিঃশব্দে পকেটজাত করিয়া সকলেই ধূম্রপান-পিপাসা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমে যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। "মরি মরি কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!" "উত্তালতরঙ্গময়ী ফেনিল নর্ম্মদা" আকুল উচ্ছ্বাসে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রবহমানা। শুভ্র ফেন-হাস্য-মুখর তরঙ্গদল উভয় পার্শ্বের মর্ম্মর-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া শঙ্খ-গৌর পর্ব্বত-পদপ্রান্তে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সে পর্ব্বতের অধিকাংশই অমল-ধবল, দ্বিরদরদ-মনোহর;—আবার কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও পীত, কোথাও গৈরিক, কোথাও বা সবুজ বর্ণ-সমন্বিত! সে শোভা, সে সুষমা

দেখিলে হৃদয় পুলকে আকুল হইয়া উঠে, নয়ন নিষ্পলক হইয়া পড়ে। শুনিলাম, বাসন্তী জ্যোৎস্নায় না কি সেই মর্ম্মর-প্রস্তর-শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বসন্তকালে নদীর জল অনেক কমিয়া যাওয়ায়, মর্ম্মরের শ্বেতাভা অধিকতর বিশদ হয়; এবং জ্যোৎস্নার হীরক-দ্যুতি মর্ম্মর পাহাড়ের রূপের উপর বিচ্ছুরিত হইয়া দ্বিগুণতর শোভায় ঝলমল করিতে থাকে। আর সেই সুষমা দর্শনে অধীর হইয়া নর্ম্মনিপুণা নর্ম্মদা পর্ব্বত-পদ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়া সপ্তস্বরের লহরে লহরে তাহার বন্দনাগাথা দিগ্‌দিগন্তরে প্রচারিত করিতে থাকে।

সশব্দে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে। এবং এই সবেগ-পতন নিবন্ধন সলিল-শীকর-কণা-গুলি বাষ্পাকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে। তপন তখন গগন-প্রান্তে মরণ-মলিন। ঝলকে ঝলকে রঙ্গীন আলোকরশ্মি সেই সলিল-কণিকা-গুলি শোণিমা-রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। প্রাবৃটের স্বভাব-গৈরিক-বরণা নর্ম্মদা অস্তরবির রক্তকিরণে রঙ্গীনতর হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে প্রমত্ত সঙ্গীত তুলিয়া গৈরিক-বসনা উদাসিনী যোগিনী-পারা কোন অসীমের অভিমুখে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রপাতের অব্যবহিত পরেই নদীবক্ষে কিয়দংশ জুড়িয়া একটি

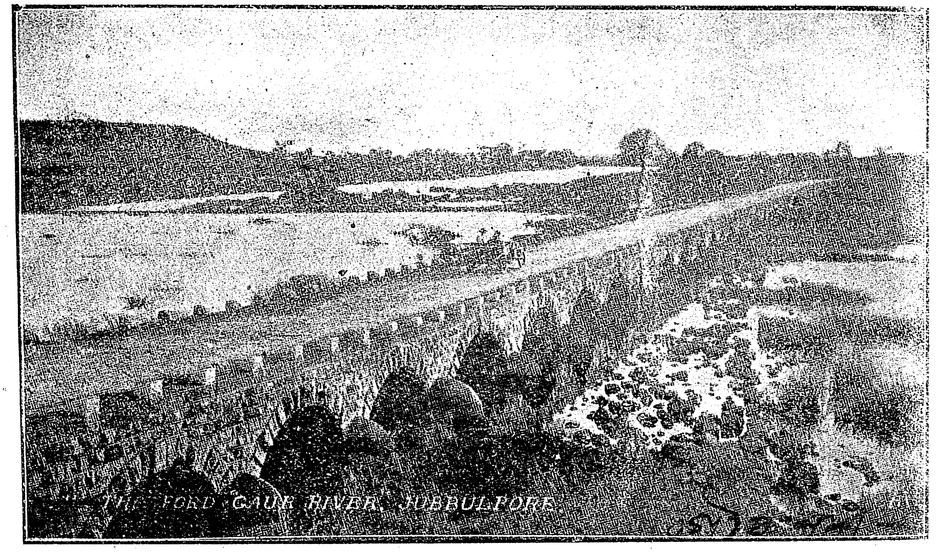

গৌর নদীর সেতু

মার্ব্বেল রক দেখা হইলে পর, আবার ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, পদব্রজে নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখিতে গেলাম। ডাকবাংলার অনতিদূরবর্ত্তী একটি লতাগুল্ম-আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র জঙ্গল অতিক্রম করিতে না করিতেই প্রচণ্ড কল্লোল শোনা গেল। সে যেন কোন ক্রুদ্ধ দানবের দূরাগত আহ্বান। বুঝিলাম, ইহাই নর্ম্মদাপ্রপাত। উৎসাহ-প্রদীপ্ত হৃদয়ে তটিনী-পুলিনের উপর দিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। নিকটে আসিয়া দেখি, প্রায় ৫।৬ ফিট উচ্চ হইতে বিপুল জলধারা পাথরের বাঁধ দেখিলাম। তাহার উপর দিয়া স্থানে স্থানে নদীর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। সেই বাঁধের উপর দিয়া তটিনী-কিনারে আসিয়া বসিলাম। শুনিলাম, এখানে একটি ময়দার কল ছিল। প্রপাতের শক্তি বলে তাহা পরিচালিত হইত। যাহা হউক, প্রপাত দেখিয়া কিন্তু তৃপ্তি হইল না। শুনিলাম, গ্রীষ্মকালে জল প্রায় ৩০ ফিট নিম্নে পতিত হয়। এ সময় নদীতে এত বেশী জল যে, প্রপাতের বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হইল না।

নর্ম্মদা-পুলিনে বসিয়া গল্প-গাথায় মজগুল হইয়া

আছি, এমন সময়ে পশ্চাতে সুপরিচিত কণ্ঠে শ্রুত হইল, "বল হরি, হরিবোল।" এ কি! এই সুদূর নির্জ্জন স্থানে পরিচিত এ কার স্বর? চাহিয়া দেখি, নারাণ, যতীন, হারাণ প্রভৃতি ৫।৬টী বন্ধু byke লইয়া আমাদের খোঁজে সহর হইতে আসিয়া উপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, আমাদের অদর্শন বেশীক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহারা

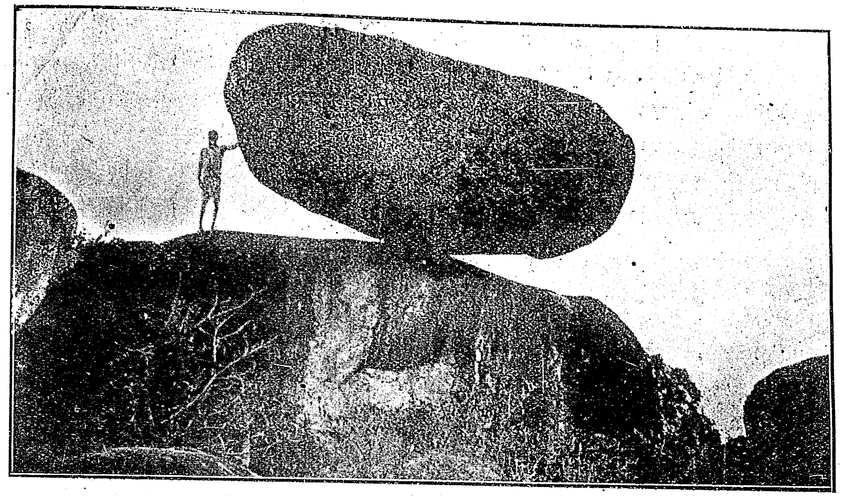

আল্‌গা প্রস্তরখণ্ড—জব্বলপুর

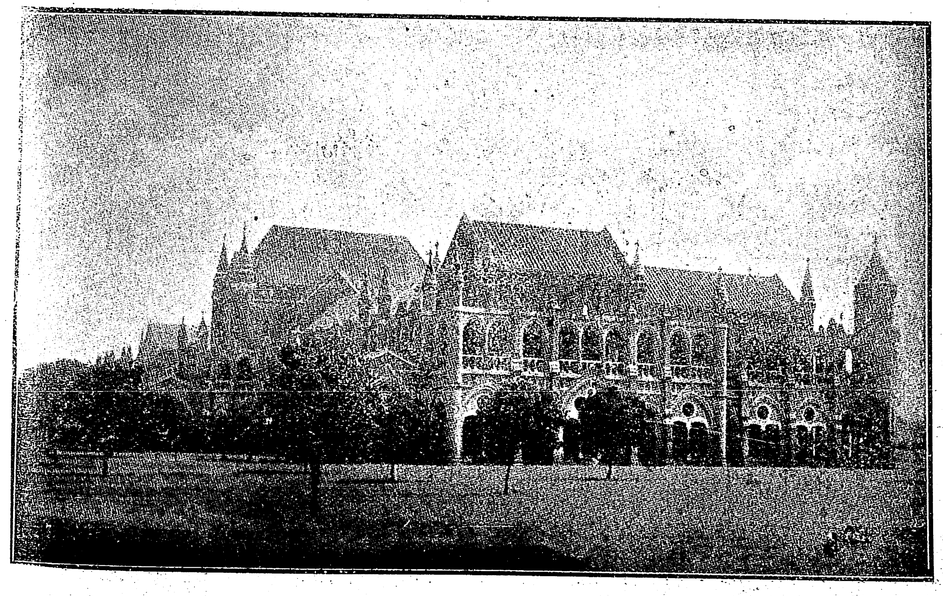

আদালত-গৃহ—জব্বলপুর

Cantonment হইতে কয়েকখানি byke ভাড়া করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেন তাহারা "বল হরি, হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, জিজ্ঞাসা করায়, হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহারা পাহাড়ের নিম্নবর্ত্তী একটি দৃশ্য আমাদের দেখাইল। সে দৃশ্য দর্শনে আমাদের হাসিও আর বাঁধা মানিল না। এমন কি, গম্ভীর-প্রকৃতি রায় সাহেবও হাস্য দমন করিতে না পারিয়া সহাস-কৌতুক-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমাদের সহযাত্রী মিঃ মুখার্জ্জী সাহেব মানুষ। পুরো সাহেবী সাজে মার্ব্বেল রক দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই পথটি অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাকে সহসা পথিমধ্যে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, নবাগত বন্ধুগণের শেষের দিনের বাঁশের দোলার কথা মনে পড়িয়া যায়। তাই তাঁহাদের এই আনন্দধ্বনি! বাস্তবিক, অসমান পাহাড়ের উপর উঠিবার সময়ে, বন্ধুবর যে ভাবে সভয় ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী বাহকটির গলা থাকিয়া থাকিয়া জড়াইয়া ধরিতেছিলেন, তাহা বাহক ও আরোহী উভয়েরই প্রাণান্তকর হইলেও দর্শকমাত্রেরই উপভোগ্য, সন্দেহ নাই।

এইবার চৌষট্টিযোগিনী দর্শন। সেই পূর্ব্বকথিত লতাগুল্ম-আচ্ছাদিত জঙ্গলটি অতিক্রম করিলেই, মন্দিরের

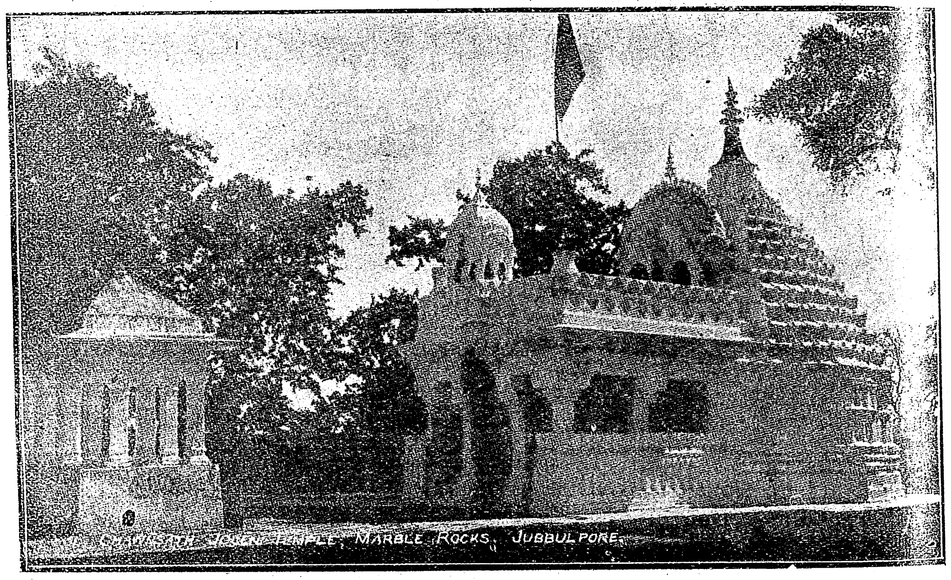

চৌন্‌ষট্ মন্দির—জব্বলপুর

টোঙ্গা হইতে ডাকবাংলা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া কিন্তু সাহেবের গলদ্-ঘর্ম্ম হইয়াছিল। আবার ডাকবাংলা হইতে প্রপাত দেখিতে যাইতে হইলে চরণ-যুগলের আশ্রয় লইতে হইবে শুনিয়া, তিনি যাইবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ডাকবাংলায় রাখিয়া আমরা প্রপাত দর্শনে চলিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সম্ভবতঃ একলাটি বসিয়া থাকিতে তাঁহার মন টিঁকিল না। তাই চারিখানি বাঁশের সাহায্যে একটি চেয়ারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া চারিজন বাহকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি পদপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। মন্দিরে উঠিতে হইলে, সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮টী ধাপ অতিক্রম করিতে হয়। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "গৌরীশঙ্কর"। মন্দির অভ্যন্তরে তাঁহাদের মূর্ত্তি বিরাজমান। সম্মুখে একটি নাতিবৃহৎ মণ্ডপ। তাহাতে একটি বৃহদাকার ঘণ্টা। প্রাঙ্গণটি গোলাকৃতি। চতুষ্পার্শে অনতি-উচ্চ চাতাল। তাহারই চারিধারে কতিপয় প্রস্তরে-গঠিত স্ত্রীমূর্ত্তি। প্রত্যেকেরই পাদপীঠে আমাদের অপরিজ্ঞাত কোন লিপিতে কি লেখা রহিয়াছে দেখিলাম। সম্ভবতঃ ইহা মূর্ত্তিগুলির পরিচয়

জ্ঞাপক। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, ইঁহারাই শ্রীদুর্গার সহচরী যোগিনীনিচয়। ইঁহাদেরই নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীদুর্গার সহচরী পুরাণ অনুসারে ত ৬৪ জন; অথচ এখানে ৮২টী স্ত্রীমূর্ত্তি বিরাজমান কেন, ইহার উত্তরে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। আমার মনে হয়, কোন সংগ্রহকারী নানা স্থান হইতে বৌদ্ধযুগের শক্তি-মূর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিয়া এই মন্দিরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ গবেষণা করিয়াছেন কি না, জানি না।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ দর্শন করিলাম। শুনিলাম, এই সুড়ঙ্গ মদনমহল অবধি বিস্তৃত। যাহাই হউক, ইহার মুখ এক্ষণে প্রস্তর দ্বারা বন্ধ; সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও কোন অনুসন্ধিৎসুর সত্য আহরণের উপায় নাই।

চৌষট্টিযোগিনী দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পঞ্চমীর চাঁদের মৃদু-মন্দ আলোকে ফিরিয়া আসিয়া একটি দোকান হইতে কিছু মার্ব্বেল প্রস্তরের দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম। এখানে Gold Stoneএর নানাবিধ উপহার-দ্রব্য এবং আংটি ও ব্রুচ প্রভৃতির জন্য নানাবিধ সুন্দর সুন্দর প্রস্তর পাওয়া যায়। নর্ম্মদার জলের এক অদ্ভুত গুণ এই যে, ইহার গর্ভস্থিত প্রস্তর-নিচয়ে উপরিভাগস্থ কোন দ্রব্যের ছায়া পতিত হইলে, তাহার ছাপ সে প্রস্তরে চিরস্থায়ী হইয়া যায়। এইরূপ সুন্দর সুন্দর ছাপ-(Impression) যুক্ত অনেকগুলি প্রস্তর দেখিলাম। কোনটিতে নর্ম্মদা-বক্ষ-বাহী ক্ষুদ্র তরণীর প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে, কোনটিতে অস্তগামী রবির বিদায়-দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, কোনটিতে বা তীরস্থিত পত্রপল্লবের Photo নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একজন স্থানীয় বন্ধু বলিলেন, তিনি একবার একটি পাথর এখান হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহাতে একটি ইংরাজ সৈনিক পুরুষের স্কন্ধে আরোহণকারী এক পোষা বানরের ছাপ বড় চমৎকার ফুটিয়াছিল। বন্ধুবর অনাথ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমরাও ত নর্ম্মদার জলের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলাম; আমাদের ছাপও নিশ্চয়ই নর্ম্মদার কোন পাথরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। আগামী বৎসর আসিয়া আমি খোঁজ করিব।" বন্ধুবর সুপুরুষ, তিনি সে আশা করিতে পারেন। আমার কিন্তু কথাটা মোটেই ভাল লাগিল না। এই চেহারার একটা চিরস্থায়ী ছাপ কোন জায়গায় অঙ্কিত হইয়া থাকিবে, ইহা ভাবিয়া মনটা কেমন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আহারে ব্যভিচার

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

কলিকাতায় যত প্রবাসী ছাত্ররা থাকেন, তাঁহারা যদি হঠাৎ কলিকাতা ত্যাগ করেন, তবে কলিকাতার বেশীর ভাগ খাবার-জিনিষের দোকান উঠিয়া যায়। "মেসে" বা "হষ্টেলে" মামুলী যা খাবার তাঁহারা খাইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি হয় কি না বলিতে পারি না; কিন্তু রসনার তৃপ্তি হয় না, এ কথা জোর গলায় বলিতে পারি। এ কারণে, বেচারীদিগকে "হোটেলের" শরণাপন্ন হইতে হয়। এই হোটেলগুলি সাহেবপাড়ার হোটেল নহে। তাহার অভদ্র অনুকরণ মাত্র। আজ সেই উপলক্ষে আমাদের খাবারের সম্বন্ধে মোটামুটি দুচারটি কথা বলিব—কথাগুলি "মেসের" ছাত্রদিগের ও গৃহস্থের—উভয়েরই জন্য বলা হইবে।

"মনকে চোখঠারা"

হিন্দুর খাবারের কথা বলিলেই,—আমরা সহরবাসী,—পাকশালার "পাচক ঠাকুরের" কথাটাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয়। কলিকাতার মত স্বল্প-পরিসর ও ঘন-নিবদ্ধ, ধূলি-ধূম-সমাকীর্ণ, অন্ধকার ও আর্দ্র ঘরে বাস করিতে হয় বলিয়া, গৃহস্থের বৌঝিয়েরা হেঁসেলে ঢুকিতে চাহেন না। ঐ সকল অজুহাতে হেঁসেলে না ঢুকিলে, আমি দোষ দিই না; কারণ, কতক পরিমাণে ঐ রকম, রৌদ্র ও হাওয়া-বর্জ্জিত গৃহে নিত্য বাস করিবার জন্য, কতকটা বৎসর বৎসর সন্তান জন্ম দিবার জন্য, এবং কতকটা যথেষ্ট ও পুষ্টিকর আহার্য্য না পাইবার জন্য,

আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে ক্ষয়কাশের অতিবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। দৈহিক অসামর্থ্য বশতঃই হউক অথবা বিলাসিতার তাড়নেই হউক, আজ সহরে ঘরে-ঘরে পাচকঠাকুর বর্ত্তমান—"মেসে"র ত কথাই নাই!

এখন দেখিতে হইবে—এই পাঠক "ঠাকুরটি" কে?—আজ উড়িষ্যা, মেদিনীপুর ও কতক পরিমাণে বাঁকুড়াই বাঙ্গালীর হেঁসেলের কর্তৃত্ব করিতেছে। ঐ ঐ দেশবাসীরাই কলিকাতায় পাচকতা করিতেছে। যত লোক "ঠাকুর" সাজে, তাহাদের মধ্যে কত জন যে সত্য সত্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। গলায় একটা পৈতা ঝুলাইতে ব্যয়ও বেশী পড়ে না, এবং কথাটাও কিছু শক্ত নয়। কাযেই, কলিকাতার পাচকদিগের মধ্যে শতকরা কয় জন প্রকৃত "ব্রাহ্মণ", তাহা কাহারো জানা নাই; এবং গোলযোগের ভয়ে কি গৃহস্থ, কি মেসের বাবুরা, কেহই ঐ কথার মীমাংসার জন্য অগ্রসর হন না। অথচ, "ঠাকুর"-নামধারী অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে অন্দরমহলে, পাচকরূপে গ্রহণ করিতে হিন্দু কুণ্ঠা বোধ করেন না। "জাতীয়তার" বনিয়াদ কত সুদৃঢ়, তাহা এইখানে সুপ্রকাশ।

তাহার পর দেখা কর্ত্তব্য—এই "পাচকঠাকুরদিগের" অভ্যাস. আচার-ব্যবহার, ও রীতি-নীতি। ইঁহারা কেহই গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকেন না—রাত্রিকালে বারবিলাসিনী-গৃহে রাত্রি যাপন করেন। কাযেই, উপদংশ (সিফিলিস্) ও প্রমেহ (গণোরিয়া) নাই এমন পাচকই নাই—বিশেষতঃ "উড়ে বামুন"ই নাই—বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ইঁহারা সকলেই প্রত্যহ স্নান করেন কি না, সেটাও সময়ে সময়ে জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। আর যদিও স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানকালে যে গামছা ব্যবহার করেন এবং স্নান করিয়া যে কাপড় পরেন, তাহার নিকটে যাইতেও ঘৃণা বোধ হয়। বেশী বা বাজে পয়সা খরচ হইবার ভয়ে, কেহই "ঠাকুরের" কাপড়চোপড় পরিষ্কার রাখিবার জন্য, মাঝে মাঝে সাবান একখানি তাহাকে দান করাটাও কর্ত্তব্য মনে করেন না। তাহারা নিজেরা সাবান ব্যবহারের মর্য্যাদাও জানে না। তাহার পরে, হেঁসেলে বসিয়াই, যখন-তখন মুখের দুই কষ-বাহী লালাস্রাব দুই আঙ্গুলে মোছা; যখন-তখন নাক খোঁটা; যখন-তখন দদ্রু-চুলকান; যখন-তখন অস্থানে উপদংশ বা প্রমেহজনিত ক্ষতে হাত দেওয়া; নাক-ঝাড়িয়া গামছায় বা হেঁসেলের দেওয়ালে হাত মোছা; ঘর্ম্মাক্ত দেহে গামছা রগ্ড়ান বা আঙ্গুলে করিয়া ঘাম ঝাড়িয়া ফেলা; ইত্যাদি কদভ্যাসের ফলে, তাহাদের গামছাখানিতে যে কত রোগের বীজ লিপ্ত থাকে, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তাহার চেয়েও মারাত্মক, তাহাদের আঙ্গুলের বড় বড় নখের নীচে ঐ মুখামৃত (থুথু), সিক্নি, ঘায়ের রস, দাদের রস প্রভৃতি যে কি পরিমাণে থাকে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কারণ, ঠাকুরের "এঁটো"ও ময়লা আঙ্গুলে পরিবেশন কালে, আমাদের প্রত্যেক খাদ্যের গ্রাসের সহিত, ঐ সকল মিশিয়া যায়! ওঃ কি বীভৎস ব্যাপার! এই এই ব্যাপারের প্রত্যেকটি আমরা জানি, অথচ সকলেই বেমালুম হজম করিয়া ফেলি—পাচক তথা "উড়ে বামুন" না থাকিলে, হিন্দুর একদণ্ডও চলে না! এরকম ভণ্ডামি, এরকম মনকে চোখঠারার দৃষ্টান্ত আর কোনও সমাজে নাই। এই হইল ভণ্ডামির প্রথম দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় ভণ্ডামি ঘৃত লইয়া। ধর্ম্মকর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দাও—ঘৃত না হইলে হিন্দুর রান্নাই হয় না। সকল হিন্দুই জানেন যে, ঘিয়ে চর্ব্বি থাকেই থাকে; অন্ততঃ সস্তার ঘিয়ে ত বটেই! অথচ কোন হিন্দু এই ঘৃত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিরা ভেজালে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কিন্তু মাড়োয়ারী ধর্ম্ম ও প্রাণ উভয় নাশকারী ভেজালের যে পথ দেখাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের নাম করাও পাপ। কোনও পাশ্চাত্য জাতি প্রাণনাশকারী পদার্থ দিয়া খাদ্যদ্রব্য ভেজাল করে নাই—কিন্তু, মাড়োয়ারী ও এদেশের পশ্চিমারা লাভের মোহে, কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া, সদ্যোপ্রাণ-ঘাতী দ্রব্য দ্বারা ভেজাল করে; এবং ধর্ম্মের ভণ্ডামি করিয়া ঘৃতের দর বাড়াইয়া দিয়া এ দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করে। আর রাশি রাশি ভেজাল-দেওয়া সেই ঘৃত খাইয়া, আমরা স্বয়ং কেবল যে মরিতে বসিয়াছি, তাহা নহে;—নরপিশাচ ভেজালকারীদিগের কোষও অর্থে পূর্ণ করিতেছি!

এই দুইটি ভণ্ডামির প্রসার দেখিয়া আমার মনে হয় যে, যে বিভিন্ন জাতীয় অসহযোগী হিন্দুসন্তান বা স্বল্পশিক্ষিত যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ ফেরি করিয়া বেড়ান, যদি তাঁহাদিগকে প্রথম প্রথম মেসের পাচকগিরিতে বাহাল করা যায়, তবে তাঁহাদিগের অন্নের সংস্থান ত হয়ই,—পরন্তু শিক্ষার্থীদের সঙ্গ করিয়া তাঁহারা পরে আপনাদের অবস্থান্তর ঘটাইয়া লইতে পারেন। মেসের বাসায়, এবং, এমন কি, গৃহস্থের সংসারেও, ভদ্রবংশীয় ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণেতর যে কোনও জাতীয় বাঙ্গালী যুবক, তথাকথিত "উড়ে বামুনের" অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়। এই মনের বলটুকু দেখান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এবং চর্ব্বিমিশ্রিত বলিয়া জানা অথচ মহার্ঘ্য ঘৃত ভোজনের অভিমান ত্যাগ করিয়া, সর্ষের তৈলে অথবা সদ্যো-ক্রীত টাট্কা মেষ-চর্ব্বিতে রন্ধন করায় স্বাস্থ্যলাভেরই বেশী সম্ভাবনা।

"চায়ের দোকান"

কি মেসের ছেলেরা, কি ইতর-ভদ্র গৃহস্থ—সহরের বেশীর ভাগ অধিবাসীরা আজ চা-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ, এক পেয়ালা (প্রায় আধসের) চা'র মূল্য অতীব সুলভ—দুই পয়সা বা এক আনা। আধসের দুধের দাম চার আনা—এবং চার পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইলে তবে পেট ভরে। এক পেয়ালা চা-পান করিলে দুই তিন ঘণ্টাকাল পেট বেশ ভার থাকে। ফল কথা, সস্তায় এবং চট্ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার এমন জিনিষ আর দুইটি নাই। তাহা ছাড়া, চায়ের দোকান একটি গাল-গল্পের আড্ডা বিশেষ—এবং চা পান করিতে আরম্ভ করিলে, সময় মত মৌতাতও উপস্থিত হয়।

এই সকল কারণে চা-পান করাটা, সহরে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের বেশীর ভাগ "কাফিখানা" (যেখানে চা, রুটি, মাংস প্রভৃতি পাওয়া যায়)—গুণ্ডা ও বদমায়েসদিগের আড্ডা। একবার এই চায়ের ভিতরের কথাটা একটু বুঝিয়া দেখা যাউক।

চা এদেশজাত জিনিষ বটে; কিন্তু অধিকাংশ চা-বাগানের মালিক, ইংরাজ। কাজেই, চায়ে যে লাভটা হয়, তাহার পনর আনা বিদেশে যায়; মাত্র এক আনা এ দেশের কুলিদের বেতন-স্বরূপ দেওয়ায়, এ দেশে থাকিয়া যায়। এ কথাটা সকলে তলাইয়া দেখেন না—"স্বদেশী" জিনিষ বলিয়া চায়ের পক্ষপাতী হন।

চা স্বদেশজাত হইলেও পুরাদস্তুর বিদেশীদের লাভবান করে—তাই লর্ড কার্জ্জন চায়ের প্রসারের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চায়ের মধ্যে সেরা বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে চা,—তাহা এ দেশের লোকেরা চক্ষেও দেখিতে পায় না;—তাহা পনর-ষোল টাকা পাউণ্ড হিসাবে বিলাতে বিক্রীত হয়; এ দেশে তাহার ক্রেতা নাই। সমস্ত ভাল চা বিক্রীত হইয়া পরিত্যক্তাংশ যাহা থাকে, তাহারই পাঁচ মিশেলী চায়ের পাতা বা গুঁড়া এ দেশে পাওয়া যায়; আর আমরা অমৃত বোধে তাহাই পান করিয়া থাকি। এই গেল খাঁটি চায়ের কথা। তাহার পরে, ঐ পরিত্যক্ত হীন জাতীয় চায়ের পাঁচ মিশেলী, সাহেব বাড়ী ও হোটেলে ব্যবহৃত হইবার পরে, খানসামারা ঐ ব্যবহৃত পত্রগুলিকে জমাইয়া বিক্রয় করে; পরে ঐ ব্যবহৃত পত্রগুলিকে শুকাইয়া কাগজের ঠোঙায় পুরিয়া বাজারে "খুচরা চা" বলিয়া বিক্রয় করা হয়; অধিকাংশ বাজারের "চায়ের দোকানের" চা, ঐ খুচরা-চা। গরান কাঠের গুঁড়া সময়ে সময়ে খুচরা চায়ের সহিত মিশান হয়। তাহার ফলে তৈয়ারী চায়ের রং বেশ লাল টক্টকে হয়! কেমন, এই-চা ভাল লাগে ত?

ভাল করিয়া ঘরে চা প্রস্তুত করিলে, তাহাতে উপকারী চারিটি পদার্থ থাকে। প্রথম, গরম জল; গরম জল পান করিলে, হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুতগতিতে হয়;—অর্থাৎ সমস্ত শরীরের রক্ত-চলাচল ক্রিয়া দ্রুত হয়,—শরীরটা বেশ গরম ও উত্তেজিত বোধ হয়। শীতকালে, এটি পরম উপভোগ্য এবং গ্রীষ্মকালে ইহার ফলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি করিয়া শরীরের ক্লেদ নাশ করে। তদ্ব্যতীত, শূন্যোদরে কতকটা গরম জল পড়িলে, পাকস্থলীতে পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যকণা, শ্লেষ্মা প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, তাহা ধৌত হইয়া যাওয়ায়, বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইবার কথা। প্রস্তুত চায়ের দ্বিতীয় উপকারী মশলা—চা। চায়ে কেফীন্ ও থীন নামক হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক দুইটি পদার্থ থাকায়, শরীরের রক্ত-চলাচল ক্রিয়া, ঘর্ম্ম ও মূত্র সকল গুলিই বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য, অবসাদ চলিয়া যায়, পুনরায় কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আইসে। এক কথায় চায়ের গরম জল, কেফীন, ও থীন এবং চিনি—এই দ্রব্যচতুষ্টয় শ্রমহারক ও উত্তেজক। চায়ে এত সামান্য পরিমাণে দুধ থাকে যে, তাহার উপকারিতা অতীব সামান্য। বরঞ্চ, আমার মনে হয় যে, [illegible] সহায়তা করা অপেক্ষা, চায়ের পাতায় যে অপকারী কষ (ট্যানিন্) থাকে, তাহার অপকারী ধর্ম্মকে নষ্ট করাই দুধের উদ্দেশ্য। এক কথায় বলিতে গেলে, চা একটি সস্তার খাবার এবং চায়ের প্রধান ধর্ম্ম, শ্রম-অপনোদন করা। জনবহুল চীনদেশে, অসংখ্য লোকে পুরুষানুক্রমে নদীর উপরে বাস করিতে বাধ্য হয়। কাজেই, তাহাদের দেশের নদ-নদীর জল চির-নৌবাসীগণ দ্বারা সর্ব্বদা দূষিত হইতে থাকে। এমত অবস্থায়, যদি চীনারা সেই দূষিত জল পান করিত, তাহা হইলে, তাহারা উদরাময়, আমাশয়, ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যারামে উজাড় হইয়া যাইত। তাই বুদ্ধিমান চীনারা, কাঁচা জল পান করে না—ফুটান (ষ্টেরিলাইজ্ড্) জল পান করে। ফুটান জল বিস্বাদ বলিয়া, উহাতে কাঁচা চায়ের পাতা (গ্রীণ-টি) দুচারটা ছাড়িয়া দেয় এবং যখনিই পিপাসার্ত্ত হয়, তখনি সেই গ্রীণ-টি মিশ্রিত ফুটান জল পান করে। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে এত চায়ের ব্যবহার। তাহারা আমাদের মত মুখে "আপো নারায়ণ!" বলিয়া ভণ্ডামি করে না—তাহারা জানে যে, জলে তাহারা মলত্যাগ করিতেছে; অতএব সে জল পান করা নিরাপদ নহে। আর আমরা যে জলের ধারে শৌচ ক্রিয়া করি, সে জলে স্নান করি ও বাসন মাজি ও মুখ ধুই; সেই জলই পান করি ও দেবতার পূজায় ব্যবহার করি! আমাদের ভণ্ডামির কি অন্ত নাই!!!

চায়ের পাতা বারম্বার সিদ্ধ হইলে, তাহা হইতে অপকারী কষ জলই (ট্যানিন্ দ্রব) বাহির হয়। সেই কষ জল পানের ফলে, পরিপাক-ক্রিয়ার হানি ঘটে। তাহার পরে, সস্তার চায়ের দোকানের চা পান করিলে, কষ জল, গরাণের গুড়াসিদ্ধ, নামে মাত্র একটু চিনি ও পালো মিশান ছিটে ফোঁটা দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয় না। উপরন্তু মান্ধাতার যুগের ময়লা "ন্যাতা" দিয়া একই বালতির ময়লা জলে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত চায়ের পাত্রগুলিকে ধৌত করা হয় বলিয়া, সেই ছত্রিশ জাতির মুখের লালা মিশ্রিত এঁটো জলও উদরে যায়। তবু ছাত্রেরা পরম তৃপ্তির সহিত দোকানের চা পান করিয়া ধন্য হন!!! যাঁহারা একটু সৌখীন, তাঁহারা আবার চায়ের সঙ্গে সখ করিয়া কেক্ খান। বাজারের যত অবিক্রীত বাসি ও হয়ত পচা ডিম দিয়া এই কেক্ নামক অদ্ভুত খাদ্যটি নোংরার বেহদ্দ গরীব মুসলমান বাবুর্চ্চি কর্ত্তৃক, তাহাদের নোংরা ঘরে প্রস্তুত হয়। বস্তির মধ্যে গরীব মুসলমানের ঘরে পাঠক মহাশয় কখনো ঢুকিয়াছেন কি? যদি ঢুকিয়া থাকেন, তবে আমার কথার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন। ময়লা আবহাওয়ায় পচা জিনিষের সাহায্যে কেক্ জন্মায়—আর দুপয়সায় একখানা কেক্ বা ছয় আনায় এক পাউণ্ড প্লাম-কেক খাইয়া আমরা কি বাবুয়ানাই না করি।

চপ্-কাট্‌লেটের দোকান।

চায়ের দোকানের পরেই, বাবু ছাত্রদিগের পরম আনন্দের স্থান—চপ্ কাট্‌লেটের দোকান্। "আশ্রম," "ইটিং হাউস," "কেবিন্," "রেস্তরাঁ" প্রভৃতি চটকদার নামে এই স্থানগুলি ছাত্রমহলে পরিচিত।

এই দোকানগুলি ক্রমশঃই সংখ্যায় বাড়িয়া যাইতেছে। এমন কি, কোনও কোনও কলেজের ভিতরেও স্থাপিত হইতেছে। অবান্তর হইলেও, প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে দেখিয়া লই—আমাদের ছেলেরা এত মাংসাশী হইতেছে কেন? ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। ইহার প্রথম উত্তর—"মেসের" যে বাসায় রন্ধন হয়, তাহা নিত্য খাইয়া, রসনা ও মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে "গর্‌গরে" ঝাল-মসলা-পেঁয়াজ-রসুনযুক্ত মাংস না খাইলে, প্রাণটা খারাপ হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, মাংসের দোকানে টেবিল চেয়ারে বসিয়া খানা খাইলে, উহার মধ্যে একটু "চাল," "বড়মানুষী," একটু "সভ্যতা" প্রকাশ পায় বলিয়া, অন্ততঃ মাঝে মাঝে "হোটেলে" খাওয়া চাইই-চাই! তৃতীয় কারণ, অনেকের ধারণা, মাংসই দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে পুষ্টিকর ও ইষ্টিদাতা খাদ্য—কাজেই মাংস খাইতে হয়। চতুর্থ কারণ, সাহেবেরা উঠিতে বসিতে মাংস খায়, কাজেই সাহেবের পদসেবী, অনুকরণ-প্রিয়, বাবুকেও মাংস খাইতে হইবে! পঞ্চম কারণ, যত দিন হইতে আমাদের মা লক্ষ্মীরা হেঁসেলে ঢোকা ছাড়িয়াছেন, অর্থাৎ বাঙ্গালীর সংসারে যে দিন হইতে অতীব মুখরোচক নিরামিষ ব্যঞ্জনগুলি লোপ পাইয়াছে, তখন হইতেই মাংসের প্রতি লোভ বাড়িয়াছে।

মাংস খাওয়ার দোষ গুণ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, আমাদের বাঙ্গালাদেশে একই আকাশ তলে, একই চন্দ্র সূর্য্য আলো ও বাতাস মাটি ও জল অবলম্বন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান বাস করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে দেহ ও চরিত্রগত যে পার্থক্য, তাহার অনেকটা মাংস-ভক্ষণজনিত। আজ আমরা সুধু ইংরাজী পড়িয়াছি, তাহা নহে—আজ ইংরাজের ভাব, ইংরাজের শিক্ষা, ইংরাজের দীক্ষা ষোল আনাই আমরা মনে ও প্রাণে গ্রহণ করিয়াছি। তাই আজ ইংরাজের অনুকরণে সদ্যোপ্রসূত শিশুকে রৌদ্রে রাখি না, সার্সি-আঁটা ঘরের ভিতরে জামা-জোড়া দ্বারা মুড়িয়া রাখি। নিত্য সাবান মাখি, সদা সর্ব্বদাই গেঞ্জি-সেমিজ গায়ে রাখি ও মাংসের উপকারিতায় প্রশংসায় শতমুখ হই। ইংরাজ মাংসপ্রিয়; কাজেই তাহারা মাংসের গুণ খুবই দেখে। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, মাংসের কোনও গুণনাই—অথবা মাংসের কেবল অগুণই আছে। আমরাও মুক্তকণ্ঠে মাংসের গুণ স্বীকার করিতেছি। কিন্তু স্বীকার করিতেছি না এইটুকু যে, মাংস না খাইলে দেহের পুষ্টি বা বৃদ্ধি হয় না! অর্থাৎ, যাঁহারা আজীবন নিরামিষাশী, তাঁহারা যদি রীতিমত আলো ও রৌদ্র সেবন করেন, এবং রীতিমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা করেন, তাঁহারাও মাংসাশীদের ন্যায় সুস্থ, সবল ও যথা পরিমিত দেহ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের লোককে তিনটি জিনিষের মূল্য বুঝান কঠিন; সে তিনটি এই ঃ—(১) মুক্ত আলো (সূর্য্যকিরণ) ও বাতাস সেবন—সখ করিয়া জামা জোড়া পরিয়া দুটার ঘণ্টার জন্য নয়—সদা সর্ব্বদাই সেবন; (২) টাট্‌কা তরীতরকারী বা ফলমূল ভোজন এবং যথেষ্ট পরিমাণে দুধ-ঘি ভোজন; এবং (৩) নিত্য নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা। ইংরাজরা ব্যায়াম করে, কাযেই ব্যায়ামের আদর বাঙ্গালীকে বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না—যদিও কাযে-কলমে বাঙ্গালী ব্যায়াম-বিমুখ। কিন্তু মুক্ত রৌদ্র ও বাতাসের যে কি অসীম উপকারিতা, তাহা যতক্ষণ ইংরাজের মুখ দিয়া না বাহির হইতেছে, ততক্ষণ সুধু আমি বলিলে বাঙ্গালী শুনিবে কি? ইংরাজ সার্সি আঁটিয়া থাকে, মোজা জামা পরে। তিন বেলা মাংস খায়। কাযেই আমাদিগকেও তাহা করিতে হইবে বৈ কি? ইংরাজের প্রকৃত ভারতবিজয় এইখানেই!

যাহাই হউক, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সুধু মাংসাশী হইলেই দেহ পুষ্ট হয় না। পরন্তু, রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া যাঁহারাই মাংসাশী হন, এ দেশে তাঁহারাই হয় হাঁপানি, নতুবা ডায়াবিটিস্ (মধুমেহ), নতুবা হাই ব্লাড প্রেসার, বা বৃক্ক প্রদাহ (ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ) অথবা আর্টীরিও স্ক্যারোসিস্ প্রভৃতি ব্যায়ামে প্রৌঢ়বয়সে ভুগিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তদ্ব্যতীত মাংসাশীরা রুক্ষ মেজাজী, অসংযত, কামপরায়ণ ও স্থূলবুদ্ধি হন। এ সুধু আমাদের মত নহে—মাংসাশী সাহেবদেরও মত তাহাই।

যাহাই হউক, আমাদের ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রম ত করেনই না, বরং বিলাসিতার সায়রে হাবুডুবু খাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রয়াসী। অথচ, তাঁহারা ক্রমশঃই অতিমাত্রায় মাংসপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। এবং কি বিড়ম্বনার কথা, এ দেশের লোকে "রন্ধন করা মাংস" বলিলে, খুব ঘি-মশলা-সংযুক্ত কারিই (curry) বুঝেন! এ কারণে, ভুল কথা, এ দেশের বেশীর ভাগ রান্নাই এখন ঘি-মশলা-সংযুক্ত হইয়া পড়ে (all our dishes are curries)। আমাদের আসল হিন্দুর নিরামিষ রন্ধনে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এবং সেই দক্ষতার ফলে ব্যঞ্জনে যে অতি মধুর অথচ অতীব কোমল সুতার জন্মায়, তাহা কোনও মোগলাই অথবা বিলাতী রন্ধনে পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ সৈরিন্ধ্রীরা পাকশালার সহিত অসহযোগ করিয়াছেন বলিয়া, বাবুদিগকে হোটেলের সহিত অতিমাত্রায় সহযোগ করিতে হইতেছে!

এই হোটেলগুলির উদ্দেশ্য কি?—ইহাদের উদ্দেশ্য পয়সা রোজগার করা। যথা-সম্ভব কম খরচে কাজ চালাইয়া, যথাসম্ভব বেশী লাভ করা। যাহাদের উদ্দেশ্য এই, তাহাদের কার্য্যপ্রথা কখনো ভাল হইতে পারে না। এই কথাটির প্রমাণ আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি ঃ—

হোটেল-ঘর ও সরঞ্জাম।—আজকালকার ফক্কিকারী সকল ব্যবস্থানুযায়ী, সুধু চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে দু'চারিটি বাসন থাকিলেও, হোটেল-ঘর ও সরঞ্জাম অতীব অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যে ন্যাতার সাহায্যে ঘরের মেঝে পরিষ্কৃত হয়, সেই একই ন্যাতার সাহায্যেই টেবিল ও ভোজনপাত্রগুলিকে সাফ করা হয়। দেওয়ালে সিক্‌নি মোছা, ছাদে ঝুল,—এ সব যথারীতি থাকিয়াই থাকে। যাহারা হোটেলের পাচক বা খানসামা, তাহাদের দেহ ও বেশভূষার অবস্থা গৃহস্থের ঘরের "বামুন ঠাকুর" অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট;—কারণ, গৃহস্থের ঘরে, সময়ে-সময়ে গৃহস্থের তাড়নায় "ঠাকুরে"

ভব্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু, হোটেলে সে সকল বালাই নাই। কাজেই, হোটেলের পাচক ও চাকরদিগের দেহের ময়লা ও বেশের ময়লা অত্যন্ত অধিকই হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার জিনিষ—তাহাদের আঙ্গুলের বড় বড় নখ। সে নখের নীচে কত সিক্‌নি, কত গায়ের ময়লা, কত এঁটো বাসন মাজা ময়লা, কত অস্থান-চুলকান ময়লাই যে থাকে—তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়! অথচ ইহারাই হোটেল "বয়" বা "খানসামা" এবং ইহারাই আঙ্গুলে করিয়া সকল খাবার খাঁটা-খাঁটি করে!!! কি পরিতাপের বিষয়—এ দেশের লোক নখ ও নখের নীচের ময়লার সম্বন্ধে কি সর্ব্বনেশে রকমে উদাসীন!!! তাহার পরে, যেখানে হোটেলের বাসন ধোয়া হয়, সেই নরককুণ্ডটি কেহ দেখিয়াছেন কি? যাহারা বাসন ধোয়, তাহাদের "পরিষ্কার"-সম্বন্ধে জ্ঞান কতদূর, তাহাও দেখিবার বিষয় বটে। আর ইন্দুর, আরসুলা, মাছি প্রভৃতি যে খাবারে মাঝে মাঝে পড়িবে বা বিড়ালে মুখ দিবে, সেটাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

হোটেলের মাংসাদি সরবরাহ।—(১) মাংস।—অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ঝাঁকা-ঝাঁকা মুরগী কলিকাতায় চালান আসে। তাহারা যা পায় খাইতে, না পায় স্বচ্ছন্দে থাকিতে; কাজেই, কতকগুলি মুরগী প্রত্যহই মারা যায়। বলা বাহুল্য যে, ঐ গুলি পূর্ব্ব হইতেই দুর্ব্বল বা রুগ্ন থাকে বলিয়াই মরে। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে—৩টা—৪টার সময়ে সেই মৃত মুর্গীগুলিকে ছাড়াইয়া অনেক হোটেলওয়ালাদিগকে দেওয়া হয়। অত সকালে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য—লোক-লোচনকে ফাঁকি দেওয়া।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গোমাংসই অতীব সুলভ। বলা বাহুল্য যে, অনেক হোটেলে ঐ মাংসই প্রচুর পরিমাণে যাইয়া থাকে। যেহেতু, তাহা না হইলে, বাবুদিগকে সস্তায় মাংস খাওয়াইয়া আবার তাহার উপরে লাভ করা অন্যথা অসম্ভব।

পাঁঠার অন্ত্র (আঁত) গুলিকে ধুইয়া, তাহারই সাহায্যে সসেজ্ ও তাহাকে "কিমা" করিয়া চপ্ ও তাহারই জলে সিদ্ধ হইয়া পাঁঠার যুনি প্রস্তুত হয়। এক পাঁঠার আঁত হইতে তিন রকমের খাবার প্রস্তুত হয়।

(২) ঘি।—ঘি নামে যে চিনাবাদামের তেল বিক্রীত হয়, তাহা, এবং চর্ব্বিই হোটেলের ঘৃত রূপে ব্যবহৃত হয়। আমি বরং সদ্যঃপ্রস্তুত চর্ব্বি ভক্ষণে মত দিব, তবু "ঘি"—নামে যে বিষাক্ত পদার্থ বিক্রীত হয়, তাহা খাইতে অনুমোদন করিব না। ভেজাল ঘৃত ভোজনে নানা রকমের পীড়া হইতে পারে।

(৩) "বেসম"—নামে যে পদার্থ ব্যবহৃত হয়, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুটের ডাল হইতে প্রস্তুত না হইয়া খেঁসারী ডালের হয়। আর এই খেঁসারী ডাল বেশী দিন খাইলে পক্ষাঘাত হইবার ভয় আছে।

হোটেলে রাঁধা মাংসের ইতিবৃত্ত।—(Resurrection মাংস ক্রীত হইবার পরেই, তাহা হইতে সেই দিনেই "সুপ" ও "রোষ্ট" রন্ধন করা হয়। পূর্ব্বদিনের অবিক্রীত রোষ্টের মাংসগুলিকে গরম জলে ধৌত করিয়া, পরদিবসে ঘৃত সংযোগে "কারি" তৈয়ারি করা হয়। আবার পূর্ব্বদিনের অবিক্রীত কারি হইতে "ঝাল ফ্রেজী" নামক ঝাল দেওয়া মাংস খাদ্য প্রস্তুত হয়। অবিক্রীত ঝালফ্রেজী হইতে পরদিবসে "ক্রোকে," "চপ্" বা "কাট্‌লেট্" তৈয়ারী হয়। ময়রার দোকানে যেমন জিলাপী ও অমৃতি পরদিনে "দরবেশে," তাহার পরদিনে "লবঙ্গলতিকায়" পুরে, এবং সবশেষে "গজায়" পরিণত হয়—অনেক "হোটেলে," প্রথম দিনের অবিক্রীত মাংস হইতে সেই রকমেই চপ্ শেষ পরিণতি।

যাঁহারা কুক্কুট-মাংসের কাট্‌লেট্ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা অনেক সময়ে অপর মাংসে সংলগ্ন দুইটি "কুক্কুটপদ" ব্যক্তি হইতে ব্যক্তি পর্য্যায়ে একই জোড়া পদযুগল পাইয়া থাকেন; যেহেতু, ঐ পদযুগ কেহই ভক্ষণ করেন না, অথচ দেখিতে পাইলেই খুসী হন—আর হোটেলওয়ালারাও একজোড়া পদ বহুবারই চালায়।

যাঁহারা হোটেলে বা চায়ের দোকানে খান, তাঁহাদের কি ভক্ষণ করিতে হয় ও কেমন অবস্থায় তাহা ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারা গেল। যাঁহারা ঘরে পাচক "ঠাকুর" রাখিয়া আহার করেন, তাঁহারাও যে কি জঘন্য লোকের হাতে খান, তাহাও দেখাইলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে, "স্বপাক ভোজন" শীর্ষক প্রবন্ধে, এই জাতীয় আরো তথ্য চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছিলাম। এই সকল কথা একত্র করিয়া ভাবিলে, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে, যে, প্রথমতঃ, স্বপাক বা অন্ততঃ আপনা আপনি কর্ত্তৃক রন্ধন করিয়া ভোজন করাই শ্রেয়ঃ; এবং দ্বিতীয়তঃ, আজকালকার দিনে, হোটেলে মাংসাদি ভোজন না করাই ভাল।

সাধারণতঃ, যাঁহারা অতি গরীব, তাঁহারা মাংস খাইতে পান না বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহারা মাঝে মাঝে মাংস খাইবার অবসর পান; ধনীরা নিত্যই মাংস খাইতে পান—কিন্তু "বাঙ্গালী সাহেবরা" তিন বেলাই মাংস খাইয়া থাকেন। কাজেই, ধনীর সন্তানেরা ও সাহেবীয়ানার অনুকরণে যে সকল বাঙ্গালীবাবু বাস করেন, তাঁহারাই অতি মাত্রায় মাংসভোজনজনিত নানা প্রকারের ব্যারামে ভোগেন। তাঁহারা ভোজন সম্বন্ধে সাহেবদিগের অনুকরণ করেন বটে, কিন্তু ব্যায়াম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনুকরণ করেন না। এ দেশেও মাংস ভোজন সম্বন্ধে তিনটি অতীব সুপ্রথা প্রচলিত ছিল;—

প্রথম—ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া বা যাগযজ্ঞ করিয়া, তাহারই প্রসাদস্বরূপ মাংস ভোজন করা হইত। ইহার ফলে, নিত্য মাংস ভোজন বা অমিত পরিমাণে মাংস ভোজন করা সম্ভবপর হইত না।

দ্বিতীয়তঃ—গ্রাম্য বা পালিত, জীবকে হনন করা নিষিদ্ধ ছিল। পালিত ও গ্রাম্য জীবগুলি সহজ প্রাপ্যও ছিল এবং নানা ব্যারামে দূষিত হইত। অথচ বন্যপশু বা পক্ষী তাদৃশ সুলভ ছিল না—

কাজেই, রসনার তাড়নায় নিত্য মাংস ভোজন করা সম্ভবপর হইত না।

তৃতীয়তঃ—শিকারলব্ধ মাংস ভোজনই তৎকালে পরম উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইত। আসল কথাও তাই—"ভূতের" মত অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম কর ত মাংস খাও—ঘরে বসিয়া বিলাসিতা করিয়া মাংস খাইবার কাহারো অধিকার নাই।

আমরা কি সে সকল কথা শুনি? না, আমরা বুঝি?

আজ তাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিও পদে পদে।

আমরা হিন্দুয়ানির কত বড়াই করি, জাতীয়তার বাড়াবাড়ি করি—কিন্তু আমাদের হাঁড়ির ভিতরে যত অনাচার, যত ব্যভিচার !!!

কোম্পানির রাজত্বে শিক্ষা-বিস্তার

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর কিছুকাল এ দেশীয় প্রজাদিগকে পাশ্চত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এ দেশীয় শাসন-প্রণালী ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এ দেশে ইংরাজ রাজত্ব বদ্ধমূল করিতে হইলে, শাসন-প্রণালী দেশীয় ভাবে গঠন করা কর্ত্তব্য। এ দেশীয় প্রাচীন শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বিচার-বিধি যথাসম্ভব এ দেশীয় আচার-ব্যবহার ও শাস্ত্র-নির্দ্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তৎকালে ইংলণ্ডে দর্শন বিজ্ঞান আলোচনার সবে মাত্র সূত্রপাত হইতেছিল। এ দেশীয় লোকদিগের ন্যায় তথাকার লোকেরা প্রাচীন সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রতীচ্য সাহিত্য চর্চ্চার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য সাহিত্য দর্শনের আলোচনায় এ দেশীয় লোকদিগের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সমধিক সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া উক্ত গভর্ণর জেনারেল মহোদয় এ দেশীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন।

এ দেশের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক অনেকগুলি বিচারালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিচারালয়ে ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকালে বিচারের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এবং এ দেশীয়দিগের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার কিরূপ, তাহা ঐ সকল বিচারকেরা জানিতেন না। এই জন্য প্রত্যেক বিচারালয়ে ইংরাজ বিচারকের সাহায্যার্থ এক একজন মৌলবী ও জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন। মৌলবী সাহেবেরা মুসলমানদিগের এবং জজ-পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও শাস্ত্রাদেশ ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন, ইংরাজ বিচারকেরা তদনুসারে অভিযোগের নিষ্পত্তি করিতেন। অবশ্য হিন্দু মুসলমানদিগের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সঙ্কলিত করিয়া হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রস্তুত করিবার সময় তখনও হয় নাই।

বিচার কার্য্যে মৌলবী ও পণ্ডিতের নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও, সকল সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষিত মৌলবী ও পণ্ডিত প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় দেশ মধ্যে যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে দেশীয় সাহিত্য-দর্শনের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ দেশীয় রাজা, রাজন্যবর্গ, জমিদার ও ধনী মহাজনগণের অর্থ সাহায্যে নিরুদ্বিগ্নে বিদ্যানুশীলনে নিরত থাকিতেন। রাজ-পরিবর্ত্তনে সকলেরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর চতুষ্পাঠী এবং আরবী পার্শী শিক্ষার্থীর মোক্তব ও মাদ্রাসা রাজকীয় ও দেশীয়দিগের অর্থ সাহায্যের অভাবে দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইতে থাকে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা একেবারে বন্ধ না হইলেও, অধ্যাপক ও পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বিচারালয়ে মৌলবীর অভাব দূর করিবার জন্য ১৭৮১ খৃঃ অব্দে আরবী ও পার্শী শিক্ষার্থ কলিকাতায় একটী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইহার কিছুকাল পরে খৃঃ ১৭৯১ অব্দে জোনাথান্ ডনকান্ (British Resident Jonathan Duncan) নামক একজন উদারহৃদয় ইংরাজ কর্ত্তৃক এদেশীয়দিগের প্রকৃত মঙ্গলার্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ বারাণসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। (তৎকালে বারাণসী বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছিল।) কলিকাতার মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যে ভূমি-সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকা ছিল। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রথম বর্ষে চৌদ্দ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছিল। পর বৎসর হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ৩০,০০০৲ টাকা করা হয়।

কলিকাতায় মাদ্রাসা এবং বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা ব্যতীত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সৈনিকদিগের স্কুল নামক এক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সকল দেশীয় লোক কোম্পানির সৈন্য-বিভাগে কার্য্য করিত, তাহারা ও তাহাদিগের সন্তানগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সংস্থাপিত কোন কোন বিদ্যালয় কোম্পানির অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইত। হিন্দু মুসলমান-দিগের মধ্যে শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কোম্পানির নিকট অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও, কোন কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলমান বিধর্ম্মী ইংরাজ সরকারের অর্থ সাহায্য, এমন কি, সহানুভূতি গ্রহণ করাও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না।

তদানীন্তন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী হিন্দু মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বৈর ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। মুসলমানদিগের মাদ্রাসায় কোরাণ সরিফ অনুমোদিত এবং হিন্দুদিগের সংস্কৃত কলেজে হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এদেশীয়দিগের আচার ব্যবহারের

আচার ব্যবহার দৃঢ় থাকে তদ্বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীরা লক্ষ্য রাখিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেবালয় সকলের অভিভাবক ছিলেন, এবং তীর্থযাত্রীর কর বলিয়া প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ তীর্থযাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেন। পর্ব্বোপলক্ষে তৎকালে তোপধ্বনি করা হইত, সৈন্যগণ বহ্বাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিত, কোম্পানির উপঢৌকন সর্ব্বাগ্রে দেবতাকে উৎসর্গীকৃত হইত, এবং স্থানীয় প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী উৎসবে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন। বহুকাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। গভর্ণর জেনেরাল লর্ড অকল্যাণ্ড বিবেচনা করেন, খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ঐরূপ আচরণ নিতান্ত অগৌরবজনক। তিনি ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের ডিরেক্টরদিগের সম্মতি ক্রমে হিন্দু দেবালয়ের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রীর কর রহিত করেন। (১)

পণ্ডিতগণের সংস্থাপিত বিদ্যালয়গুলি রাজসরকারের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিত না। দেশীয় ধনী মহাজন ও জমিদারগণও ঐগুলির স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য মুক্ত-হস্তে দান করিতে পারিতেন না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীগুলি অন্তর্হিত হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছিল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে অধ্যাপনা ব্যবসা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা চিরাগত অভ্যাস বশতঃ তখনও চতুষ্পাঠী রক্ষা করিলেও, উন্নত সাহিত্য দর্শনের আলোচনার পরিবর্ত্তে কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সামান্য কিঞ্চিৎ অধ্যাপনায় কালাতিপাত করিতেন। গভর্ণর জেনেরাল লর্ড মিণ্টো সংস্কৃতের ধ্বংসোন্মুখী অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮১১ খৃঃ অব্দে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেনরি টমাস কোলব্রুকের স্বাক্ষরিত এক চুম্বক লিপি বিলাতে ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত চুম্বক লিপিতে (Minute) কলিকাতার মাদ্রাসা এবং বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের সহিত নদীয়া ও ত্রিহুত এই দুই স্থানে দুইটী সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুর এই দুই স্থানে দুইটী মাদ্রাসা সংস্থাপনের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের অনুমোদিত না হওয়ায় ঐ প্রস্তাব তৎকালে কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জের নিকট হইতে যে নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহার সর্ত্তানুসারে উক্ত কোম্পানি, এক চীন দেশ ভিন্ন এসিয়ার আর সর্ব্বত্র একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। কোম্পানির ডিরেক্টরগণকে এদেশীয় প্রজাগণের শিক্ষা বিধানার্থ বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য করা হয়; অন্যান্য ইংরাজ বণিকেরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়; এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ কোম্পানির রাজ্যমধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার অবাধ অধিকার লাভ করেন। এই সনন্দ প্রাপ্তির পর হইতে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা এদেশীয়গণের শিক্ষাবিধানের জন্য অধিকতর মনোযোগী হন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে এদেশে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে, এ দেশীয় লোকেরা আভিজাত্য ও চিরন্তন প্রথার প্রতিকূলে পাশ্চাত্য প্রথামত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে চলিতে পারিবে না, এই আশঙ্কা তাঁহাদিগের মনে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আবহমান কাল যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া রাজকীয় সম্মান ও অর্থ সাহায্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহারা গভর্ণর জেনেরালকে উপদেশ প্রদান করেন। (২)

ডিরেক্টরদিগের সম্মতিক্রমে গভর্ণর জেনেরাল শিক্ষা-বিভাগের টাকার কতক অংশ প্রাচীন সাহিত্যপুস্তকের মুদ্রন কার্য্যে, কতক ১৮১৭ অব্দে স্থাপিত স্কুলবুক সোসাইটীর ও ১৮১৮ অব্দে স্থাপিত স্কুল সোসাইটীর জন্য, কতক মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালনে ব্যয়

(১) Meadows Taylor's History of India.

(২) ১৮১৪ খৃঃ অব্দের জুনমাসে ডিরেক্টরেরা গভর্ণর জেনেরালকে যে উপদেশ লিপি প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ এই ঃ—

We have kept in view those peculiar circumstances of our political relation with India, which, having necessarily transfered all power and pre-eminence from native to European agency, have rendered it incumbent upon us from motives of policy as well as from a principle of justice, to consult the feelings, and even to yield to the prejudices, of the natives wherever it can be done with safety to our dominions. Neither of these objects is we apprehend, to be obtained through the medium of public colleges if established under the rules of, and upon a plan similar to, those that have been founded at our universities, because the natives of caste and reputation will not submit to the subordination and discipline of a college; and we doubt whether it would be practicable to devise any specific plan which would promise the successful accomplishment of the objects under consideration. We are inclined to think that the modes by which the learned Hindoos might be disposed to concur with us in prosecuting those objects would be by our leaving them to the practice of usage, long established among them, of giving instruction at their own homes, and by our encouraging them in the exercise and cultivation of their talents, by the stimulas of honorary marks of distinction and in some instances by grants of pecuniary assistance.

করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঐ অর্থ হইতে অন্যান্য বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন। হিন্দু-মুসলমানেরা পরম্পরাগত প্রথাক্রমে দেশীয় অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। নৈষ্ঠিক অধ্যাপকেরা প্রথম প্রথম রাজকীয় সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুই একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই উহা গ্রহণ করিয়া উৎসাহের সহিত প্রাচ্য বিদ্যার অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

এ দেশীয় শিক্ষার উন্নতি করা হইবে, কি প্রতীচ্য শিক্ষা এ দেশীয়দিগের মধ্যে বিস্তার করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় লইয়া ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে। সার উইলিয়াম জোন্স্ (Sir William Jones), হেনরী টমাস কোলব্রুক (Henry Thomas Colebrooke), হোরেশ হেমেন উইলসন (Horace Hayman Wilson), উইলিয়ম হে ম্যাকনটন (William Hay Macnoghton), সার জন হ্যারীংটন (Sir John Harington) ইউলিয়ম সদরল্যাণ্ড (William Sutherland), উইলিয়ম ক্যারী (William Carey), জন মার্সম্যান (John Marshman), এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড (William Ward) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচ্যশিক্ষা প্রচারে, এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য সাহিত্য-দর্শনে সুপণ্ডিত স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং সার এডওয়ার্ড হাইড্ প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রতীচ্য শিক্ষা প্রচারের পক্ষ সমর্থন করেন। এইরূপ মতদ্বৈধ হইলেও, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিতে কখন কার্পণ্য করেন নাই। রাজকীয় অর্থ সাহায্যে অনেকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় বা টোল পরিচালিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্টের সময়ে হিন্দুদিগের সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের সজীবতা সম্পাদনের জন্য কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্ব প্রথম ৫৬জন ছাত্র ও ৮ জন অধ্যাপক লইয়া ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃঃ ১৮২৭ অব্দে চিকিৎসাবিভাগ এবং ১৮২৮ অব্দে ইংরাজী শ্রেণী উহাতে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত না হওয়ায়, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট ঐ উভয় বিভাগ রহিত করেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবে, ঐ সময় এই নিয়ম প্রচারিত হন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রচারিত হওয়ায়, সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে ঐ বিদ্যালয়ে দ্বিজেতর জাতিরা অধ্যয়ন করিতে পারিত না। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতার সময়ে শিক্ষাসমিতি (Council of Education) ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে হিন্দু মাত্রকেই উহাতে অধ্যয়ন করিবার অধিকার প্রদান করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশীয়দিগের মধ্যে প্রচার করা ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য, এই ধারণা সর্ব্ব প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ উপলব্ধি করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর চার্লস গ্রাণ্ট (Charles Grant), খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে, এই অভিপ্রায়ে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পোষকতা করেন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দের ভারত আইন (India Act, 1813) বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মযাজকগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে নূতন শিক্ষা প্রণালীর প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। উইলিয়ম কেরী (William Carey) এবং তাঁহার ঔদ্যমশীল সহযোগীরা শ্রীরামপুরে অবস্থিতি করিয়া দিনেমারদিগের অধীনে কলিকাতা অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধ যে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে—মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের জন্যও তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণের নিকট বিশিষ্টরূপে ঋণী।

গভর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া যখন প্রাচ্যশিক্ষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং অর্থ ও রাজ সম্মানে অধ্যাপকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছিলেন, তৎকালে কলিকাতাবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষালাভ-লালসা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্রধান বিচারক সার এডওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট (Sir Edward Hyde East), ডেভিড্ হেয়ার (David Hare) ও অন্যান্য উদারহৃদয় ইংরাজগণের পোষকতায় রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন কৃতবিদ্য উদ্যোগী ব্যক্তি একত্রবদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষার্থ কলিকাতায় একটী কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। যে সকল বদান্য ব্যক্তির দানে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা, বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাজা গোপীমোহন দেব, এবং বাবু গঙ্গানারায়ণ দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অচিরে লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইলে, খৃঃ ১৮১৭অব্দে হিন্দু কলেজ নামে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা স্বাধীন ভাবে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক নিজেরাই শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া দেশ মধ্যে ইংরাজী বিদ্যা বিস্তারে যত্নবান হন। (৩) হিন্দু কলেজ আদৌ দেশীয়গণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, অবশেষে উহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে হিন্দু কলেজের কলেজ বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং স্কুল বিভাগ হিন্দুস্কুলে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু কলেজেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শুধু বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের গৌরব রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

(৩) In 1831 the Bengal Commitee of Public Instruction reported that "a taste for English had been widely disseminated and independent schools, conducted by young men reared in Hindoo College, were springing up in every direction.

মৎস্যগন্ধা

রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু সংস্কারক ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে (১৮১৩ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে) বঙ্গদেশে শিক্ষার এক নূতন আদর্শ প্রকটিত হয়। হিন্দু কলেজের অনুকরণে অনেক বঙ্গবাসী নিজ নিজ ব্যয়ে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতে থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণ অদম্য উৎসাহে নূতন নূতন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রত হন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে কেরি (Carey) মার্সম্যান (Marshman) এবং ওয়ার্ড (Ward) সাহেব শ্রীরামপুরে সর্ব্বপ্রথম মিসনরী কলেজ স্থাপন করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যে সকল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইগুলির দ্বারাই ঐ কলেজটী পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ১৮২৭ খৃঃঅব্দে ডেনমার্কের রাজা কর্ত্তৃক মিসনরীরা ঐ কলেজ হইতে উপাধি প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮২০ খৃঃঅব্দে শিবপুরে বিশপস্ কলেজ (Bishop's College) এবং ১৮৩০ খৃঃঅব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারক ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ (Alexander Duff) জেনেরাল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন (General Assembly's Institution) নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পকাল মধ্যেই উহা প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু ডাক্তার ডফের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া ১৮৪০ খৃঃঅব্দে ফ্রী চার্চ্চ (Free Church) নামক বিখ্যাত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ উভয় বিদ্যালয় এক্ষণে মিলিত হইয়া স্কটিশচার্চ্চ কলেজ ও স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ভারতবিধিতে গভর্ণর জেনেরালের মন্ত্রণা সভাতে একজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ সদস্য (Legal Member) নিযুক্ত করা হয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মেকলে সাহেব প্রথমে ঐ সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি সাধারণ শিক্ষাসমিতির সভাপতিও ছিলেন। এই সময় সংস্কৃত, আরবী ও পার্শী ভাষার প্রভাব এ দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ডাক্তার উইলসন প্রমুখ (Dr. H. H. Wilson) অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত ও আরবী ভাষার মাধুর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ঐ সকল ভাষা এদেশে প্রচার করিবার পক্ষ সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে শিক্ষানমিতির অন্যতম সদস্য সার চারলস ট্রেভিলিয়ন (Sir Charles Treveleon), মিষ্টার ব্রায়ন হজসন (Mr. Brian Hudgson) এবং ডাক্তার ডফ (Dr. Duff) প্রভৃতি সাহেবগণ ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে যত্নবান্ হন। মন্ত্রণা সভাতে উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে। অবশেষে মেকলে সাহেবের সমর্থনে ইংরাজী প্রচার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

শিক্ষা-সমিতির নির্দ্দেশ মতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক আদেশ করেন—য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রচার করা প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগের নির্দ্দিষ্ট অর্থ ইংরাজী শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে হইবে। দেশীয়গণ যে সকল প্রাচ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাহা তুলিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত না হইলেও, সেই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রগণ যে বৃত্তি প্রাপ্ত হইত, তাহা আর প্রদান করা হইবে না। প্রাচ্য গ্রন্থাদি মুদ্রাঙ্কনে সাধারণ শিক্ষা-সমিতি যে অর্থ ব্যয় করিত, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া, ঐ অর্থে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশীয়দিগকে প্রতীচ্য সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হওয়ায়, ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য রাজকীয় সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রদত্ত হইলেও, কি সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, কি এ দেশীয় চলিত ভাষা, কোনটাই রাজকীয় সাহায্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। দেশীয় চলিত ভাষার উন্নতি হইলে, উহার সাহায্যে, যাহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন ইংরাজী শিক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিবার সুবিধা হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট দেশীয় চলিত ভাষার উন্নতি করিবার জন্য মনোযোগী হন। ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা লইয়া, পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা দেশীয় ভাষার উন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানে সুদক্ষ শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে উৎসাহ প্রদান করা হইতে থাকে। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

পূর্ব্বে বিচারালয় সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদায় কার্য্য পার্শী ভাষায় সম্পন্ন হইত। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনেরাল লর্ড অকল্যাণ্ডের আদেশে সমস্ত রাজকীয় বিচারালয়ে পার্শী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী অথবা স্থানীয় চলিত ভাষার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং বঙ্গদেশের বিচারালয় সকলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হইল। বাঙ্গালার ভদ্র মুসলমানেরা কখনই বঙ্গভাষার অনুরাগী না থাকায়, তাঁহাদিগের কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। গভর্ণর জেনেরালের এই নূতন আদেশে তাঁহাদিগকে শুদ্ধ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের ভাষা শিক্ষা করিতেও বাধ্য করা হইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রায় আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন পত্র গভর্ণর জেনেরালের সমীপে উপস্থিত করা হয়। এ দেশীয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন—এ কথা ঐ আবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশীয় ভাষার দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে। প্রত্যেক ইংরাজী বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবার নিয়ম প্রচারিত হয়। দেশীয় ভাষার সহিত প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিং ও ডালহাউসীর সময়ে অনেকগুলি আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া উচ্চইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-গুলির মধ্যে আবার কোন কোনটী উচ্চশিক্ষার উপযোগী রূপে গঠিত হওয়ায় কলেজে পরিণত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে হুগলী কলেজ, ১৮৪১ অব্দে ঢাকা কলেজ এবং ১৮২৩ অব্দে বহরমপুর কলেজ স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের অনুকরণে এদেশীয় কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এ দেশে প্রচার করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্ব্ব প্রথম ১৮২২ খৃঃ অব্দে দেশীয়দিগের শিক্ষার্থ ডাক্তারী বিদ্যালয় (School for native Doctors) স্থাপন করেন। ১৮২৭ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত উভয় বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ডাক্তারী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। ইংরাজী চিকিৎসা পুস্তক হইতে হিন্দী-ভাষায় অনূদিত একখানি সংগ্রহ পুস্তক অবলম্বনে হিন্দীভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মনুষ্যের ও প্রাণীর দেহ কর্ত্তন করিয়া শবচ্ছেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদত্ত হইতে থাকে। কিন্তু এরূপ শিক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়ায়, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট পঞ্চাশৎজন ছাত্র সংগ্রহ করিয়া, বর্ত্তমান মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপন করেন। প্রথম প্রথম কলেজের ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা নিবাসে (Hospital) গিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। ১৮৩৮ অব্দে কলেজেই একটি ক্ষুদ্র চিকিৎসা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর উহার আয়তন বৃহত্তর করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান কলেজ হাসপাতালটি মেডিক্যাল কলেজের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। ঐ সময় হইতেই কলেজের অধ্যাপকগণ উক্ত হাসপাতালের ভিষক ও অস্ত্র-চিকিৎসক হইয়া আসিতেছেন।

বহু শতাব্দীর শিক্ষায় এ দেশীয় ভদ্রলোকেরা যে উন্নত মানসিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন প্রাচ্য শিক্ষা হইতে নবাগত প্রতীচ্য শিক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে মুসলমানদিগের রাজত্ব-কালে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে আবার নূতন রাজ সরকারে প্রবেশ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আগ্রহের সহিত ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ দেশীয় ছাত্রদিগের বুদ্ধি ও মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে সাধারণ শিক্ষা কমিটি (The Public Instruction Committee) হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায়—সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষায় এ দেশীয়গণ যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, য়ুরোপীয় অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেরূপ করিতে পারে। (৪)

মুসলমানগণ স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তনের বিরোধী। যত দিন পার্শী আদালতের ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল, তত দিন মুসলমান ভদ্রলোকেরা অনেক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ ভাষা আদালত হইতে অপসারিত হইলেও, তাঁহারা ঐ ভাষা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পার্শী ভাষাই তাঁহাদিগের নিকট উন্নত ও সাধু ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। উহা শিক্ষা না করিয়া অন্য ভাষা শিক্ষা করা তাঁহারা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। অগ্রে পার্শী শিক্ষা করিয়া পরে ইংরাজী শিক্ষা করা একে অত্যন্ত কষ্টকর, তাহার উপর আবার ইংরাজী শিক্ষার সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায়, মুসলমান ভদ্রলোকগণ খৃষ্টানের কর্ত্তৃত্বে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে প্রদান করিতে সম্মত হইতেন না। এই জন্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৎকালে মুসলমান ছাত্র প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টা করিতেন। উচ্চ শিক্ষা যাহাতে গভর্ণমেণ্ট একায়ত্ত করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা ছিল। গভর্ণমেণ্টের কলেজের ন্যায় তাঁহাদিগের কলেজের ছাত্রেরাও যাহাতে সর্ব্ববিধ সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কোন উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে তাঁহাদিগের কলেজের ছাত্রের দাবী উপেক্ষা করিয়া রাজকীয় কলেজের কোন ছাত্রকে নিযুক্ত করিলে, তাঁহাদিগের অসন্তুষ্টির সীমা থাকিত না। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে গভর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা করিতেন না।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনেরাল হার্ডিং প্রচার করেন, সাধারণ শিক্ষা সমিতি (The Committee of Public Instruction) রাজকীয় কার্য্যের প্রার্থীদিগকে পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতানুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন ; গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন সমিতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে। পরীক্ষা-সমিতি গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বিষয় ও পুস্তক পরীক্ষার পাঠ্য বহির্ভূত বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইহাতে প্রচারকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠেন ; এবং রাজকীয় কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রেরা অযথা অনুগ্রহ লাভ করে, এইরূপ দোষারোপ করিয়া বিবাদ করিতে থাকেন। গভর্ণমেণ্ট ও মিসনরীদিগের তীব্র বাদ-প্রতিবাদের ফলে কলিকাতায় শিক্ষা-সমিতি (Council of Education) ১৮৪৫ খৃঃঅব্দে কলিকাতায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরীক্ষা গ্রহণ করাই উক্ত সমিতির কার্য্য হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সভা (Senate) কর্ত্তৃক অনুমোদিত গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কাহারও প্রতিষ্ঠিত যে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তৎকালে ঐ প্রস্তাব সমর্থন না করায়, উহা কার্য্যে

(৪) "a command of the English language and a familiarity with its literature and science have been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe."

পরিণত হইতে পারে নাই। ইহার দশ কি একাদশ বর্ষ পরে ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; কিন্তু ইহার বর্ষকাল পরেই কোম্পানির রাজত্বের অবসান এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়।

কোম্পানির রাজত্বে বঙ্গদেশে তিন প্রকার বিদ্যালয় ছিল। ১ম—গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়। ইহার সমুদায় ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করিতেন। ২য়—মিসনরী বা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের বিদ্যালয়। ইহা উক্ত প্রচারকদিগের অর্থে পরিচালিত হইত। গভর্ণমেণ্টও উহাতে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন।

৩য়—দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়। এই শ্রেণীর প্রায় সকল বিদ্যালয়ই গভর্ণমেণ্ট হইতে আংশিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত।

১৮৫৩ খৃঃঅব্দে বঙ্গদেশে যে সকল স্কুল ও কলেজ ছিল, তাহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ৩১টি ও মিসনরীদিগের ২২টী ছিল। দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত কতগুলি বিদ্যালয় ছিল, তাহার সংখ্যা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ঐ বৎসর স্কুল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক চারি হাজার ছিল। হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইবার ছত্রিশ বর্ষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কোম্পানির রাজত্বে এদেশের শিক্ষোন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারা গেল, খৃঃ১৮১৩ অব্দে কোম্পানির নূতন সনন্দ প্রাপ্তির পর হইতেই এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৮১৭ অব্দে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইলে, ইংরাজী শিক্ষার প্রচার হইতে থাকে। মিসনরীরা প্রথমে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮১৮ অব্দে কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি সাহেবেরা শ্রীরামপুরে মিসনরী কলেজ স্থাপন করেন। ১৮২০ অব্দে শিবপুরে বিশপস্ কলেজ এবং ১৮৩০ অব্দে ডাক্তার ডফ কর্ত্তৃক জেনেরাল এসেম্বিজ কলেজ স্থাপিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঢাকা, হুগলী ও বহরমপুরে কলেজ এবং প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। শিক্ষা-সমিতির সভাপতি মেকলে সাহেবের প্রযত্নে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনেরাল লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ শিক্ষা সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা প্রচার করেন। এদেশীয় লোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করায়, তাহারা দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইয়া উঠে। দেশীয় প্রচলিত ভাষার উন্নতির জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার উন্নতির মূলে কোম্পানির শাসনকর্ত্তাদিগের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

বর্ত্তমান ভারতের ক্ষাত্রশক্তি

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

১৭৯৬ সালে ইয়োরোপীয় সৈনিকগণের সংখ্যা প্রায় তের হাজার ছিল। এবং দেশীয় সৈনিক বাংলায় ২৪ হাজার, মাদ্রাজে ২৪ হাজার, ও বোম্বাইয়ে ৯ হাজার ছিল। কিন্তু ১৭৯৬ সালের সৈন্যসংস্কারের ফলে দেশীয় সৈনিক সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম দলেও একজন বৃটিশ্ অফিসার (নায়ক) নিয়োগ করা হ'ল। এই সময়ে গোলন্দাজ (artillery) ব্যাটালিয়ানও গঠিত হ'ল, এবং পূর্ব্বের যে স্বাধীন ব্যাটালিয়ান ছিল, সেটা ভেঙ্গে ডবল ব্যাটালিয়ান রেজিমেণ্ট গঠিত হ'ল। অর্থাৎ, পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্য দেশীয় নায়কগণ দ্বারা পরিচালিত হ'ত ; কিন্তু এখন থেকে প্রত্যেক রেজিমেণ্টে একজন বৃটিশ্ কার্ণেল, এবং প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ণেল, একজন মেজর, ৪ জন কাপ্তেন, ১১ জন লেফ্‌টেনাণ্ট, এবং ৫জন এন্‌সাইন্, (এতদ্ব্যতীত ১ জন বৃটিশ্ নন্‌কমিশনড্ অফিসার), অর্থাৎ মোট ২২ জন বৃটিশ্ অফিসার বাহাল হ'ল, এবং কালা আদ্‌মির অফিসার হওয়ার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হ'ল। অধিকন্তু এ পর্য্যন্ত দেশীয় নায়কগণের যতটুকু প্রভুত্ব ও পদমর্য্যাদা ছিল, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

১৭৯৬ সালে এই যে প্রথম ভারতের সৈন্যসংস্কার সাধিত হ'ল, তারপর একেবারে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ছোটখাট অনেক পরিবর্ত্তন ঘট্‌লেও, বিশেষ বড় রকমের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি। অতিরিক্ত রাজ্যবৃদ্ধি হওয়ায়, প্রত্যেক প্রেসিডেন্‌সি সেনাদলের কার্য্যের গতি ক্রমেই বৃহত্তর হ'তে লাগ্‌ল। শেষটা এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কোন্ কোন্ সেনাদলকে কোন্ যুদ্ধে বা কোথায় শান্তিরক্ষা কর্‌তে হবে, তার কিছু স্থির নিশ্চয়তা না থাকায়, স্থানে স্থানে অস্থায়ী স্থানীয় সেনাদল গঠন করে, এবং কতকটা অপর কোন রাজশক্তির নিকট ধার করা সৈন্য সাহায্য নিয়ে, সিপাহী বিদ্রোহ দমনের অনেক পরিমাণে সুবিধা করে'নিতে হ'ল। ১৮০৫ সালে প্রেসিডেন্‌সি সৈন্যদলের সংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে ছিল।—

	বৃটিশ সৈন্য	দেশীয় সৈন্য	মোট
বাংলা	৭,০০০	৫৭,০০০	৬৪,০০০
মাদ্রাজ	১১,০০০	৫৩,০০০	৬৪,০৭০
বোম্বাই	৬,৫০০	২০,০০০	২৬,৫০০
মোট	২৪,৫০০	১৩০,০০০	১৫৪,৫০০

১৭৬৪ সালে বাংলার সিপাহীরা অধিক বেতন ও ভাতার জন্য বিদ্রোহ করে। এবং ১৭৬৬ সালে ইয়োরোপীয় অফিসারগণও অধিকতর ভাতার জন্য বিদ্রোহাত্মক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তার পর ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি ছোট খাট বিদ্রোহ হয়। ১৮০৬ সালে মাদ্রাজে দেশীয় সিপাহীরা, ১৮০৯ সালে ইয়োরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণ, এবং ১৮২৪ সালে বারাকপুরে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।

১৮২৪ সালে কোম্পানি বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, পূর্ব্বের অর্থাৎ ১৭৯৬ সালের যে সংস্কার, তাহা সৈন্যদিগের পক্ষে সন্তোষজনক হয় নি। পুনরায় সেনাদলের সংখ্যা নূতন করে নির্ণীত হ'ল ; অর্থাৎ প্রত্যেক

রেজিমেণ্ট, ব্যাটালিয়ন্ বা কোম্পানিতে কতগুলি সৈন্য (অশ্বারোহী বা পদাতিক) থাক্‌বে, তাদের উপর কতগুলিই বা দেশীয় নায়ক থাক্‌বে, এবং সর্ব্বোপরি কতগুলি ইয়োরোপীয় অফিসার থাক্‌বে, সেটা স্থির করা হ'ল। ১৮২৪ সালের পূর্ব্বে কোম্পানির অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা বা শক্তি বিশেষ ছিল না। দেশীয় রাজন্যবর্গ, যাঁদের সঙ্গে কোম্পানির ক্রমাগত যুদ্ধ চল্‌ছিল, তাঁরা অনেকে অশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা রাখ্‌তেন। অশ্বারোহী সেনাদলের উপকারিতা অনেক বিলম্বে উপলব্ধি করে, কোম্পানিও পরে স্থায়ী ভাবে অশ্বারোহী সৈনিকের দল গঠন ও সংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌লেন। ক্রমে কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধির ফলে এই হ'ল যে, এক প্রেসিডেন্সির সৈন্যদলকে বাধ্য হয়ে অন্য প্রেসিডেন্সিতে বা প্রেসিডেন্সি ছাড়া অন্য দেশে গিয়েও যুদ্ধ কর্‌তে হ'তো; অথবা যুদ্ধাবসানে সেখানে শান্তি স্থাপনের কাজ কর্‌তে হ'তো; এবং এই কাজের জন্য তাদের অতিরিক্ত ভাতাও দেওয়া হ'তো। বাংলার সিপাহীরা কতকটা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল বটে, কিন্তু মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ের সৈন্যদলে সরেশ ও নিরেশ দুরকমের সিপাহী মিশ্রিত থাকায়, এই তিন প্রেসিডেন্সির সেনাদলের ব্যবহারে অনেক পার্থক্য দেখা যেতো। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করা যেন তাদের এক রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য, যাতায়াতের অসুবিধা হেতু, এবং এক দিকে ষড়যন্ত্রকারীদের কুমন্ত্রণা ও অপর দিকে নানাবিধ দোষত্রুটী একত্র হ'য়ে দেশীয় সৈন্যদিগকে যে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল, তাতে আশ্চর্য্য হ'বার বিশেষ কিছু ছিল না।

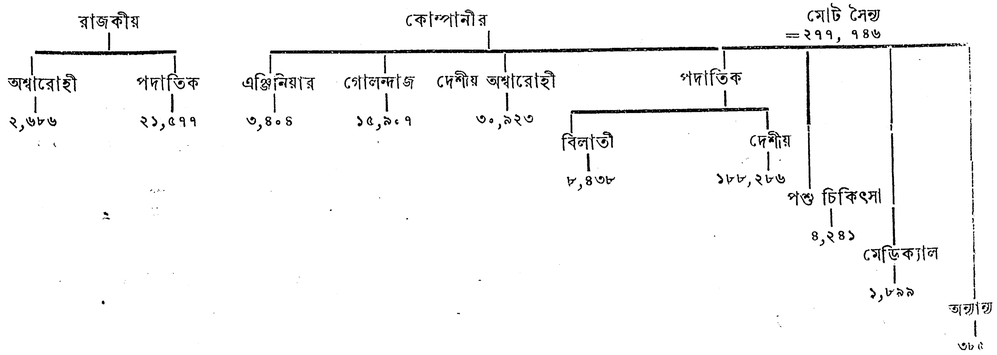

সিপাহীবিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে কোম্পানির অধীনে যে সৈন্য ছিল, তার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হ'ল।—

সৈন্যদিগের মর্য্যাদা ও গঠন-প্রণালী কিরূপ হ'বে; দ্বিতীয়—ইয়োরোপীয় সৈন্যগণ ভারতে এসে ভারত সরকারের দ্বারাই যুদ্ধে নিযুক্ত হ'বে, কি সমগ্র বৃটিশ্ সাম্রাজ্যভুক্ত সৈন্যদলের (Imperial British Army) একাংশ হয়ে থেকে, কেবলমাত্র বিলাতের হুকুমে, যখন যেখানে যুদ্ধে যেতে আদিষ্ট হবে, তখন সেখানে সেই যুদ্ধেই যাবে? অবশেষে শেষোক্ত পন্থাই অনুমোদিত হ'তে, এই স্থির হ'ল যে, ভারতে বৃটিশ্ সৈন্যের সংখ্যা ৮০ হাজারের অধিক হবে না। ১৮৬১ সালে দেশীয় সৈন্যদলের পুনরায় সংস্কার হয়। সেই সময় এই স্থির হয় যে, কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক দল বিতাড়িত হবে; অন্য কতকগুলি দল অপর অপর দলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে; এবং প্রায় সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্যদল বাতিল হবে। ১৮৬১ সালে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের পুরাতন সৈন্যদল ছাড়া পাঞ্জাব সীমান্তে ও হায়দ্রাবাদে কতকগুলি ছোট ছোট সৈন্যদল গঠিত হ'ল। অধিকন্তু এই বৎসরে তিনটি নূতন প্রেসিডেন্সি ষ্টাফ কোরের (staff corps) সৃষ্টি হ'ল। তারপর ১৮৯১ সালে এই তিনটি কোরের আবার একত্র সংমিশ্রণ হ'ল; কারণ দেখা গেল যে, এক ষ্টাফকোরের অফিসারদের অন্য কোরের অফিসার অপেক্ষা শীঘ্র পদবৃদ্ধি হ'চ্ছে; সে জন্য পরোক্ত দলের মর্ম্মপীড়ার কারণ জন্মাচ্ছে। সংমিশ্রণের পর থেকে অফিসারগণ চাকুরীর দীর্ঘতা অনুসারে উন্নতিলাভ (অর্থাৎ বেতন ও পদবৃদ্ধি) করতে থাকলেন।

ভারত-সরকারের যুদ্ধ ব্যাপারের উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্ব থাকায়, ভারতে শান্তি রক্ষার ভার ইংলণ্ডকে কতকটা নিজের স্কন্ধে নিতে হয়। ফলে ইংলণ্ডে যতগুলি সৈন্য থাকে, প্রায় ততগুলি সৈন্য তাহার উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলিতে থাকায়, শান্তির সময় এতগুলি সৈন্য

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার কার্য্যতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে নিজের হাতে গ্রহণ করেন; তদবধি কোম্পানির অস্তিত্ব লোপ পায়। ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি বিলুপ্ত হওয়ায়, সৈন্যবিভাগে দুইটি সমস্যার সমাগম হয়; প্রথম—ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় প্রতিপালনের ভাবনায় ইংলণ্ডকে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। পরে কার্ডওয়েলের (Cardwell) পরামর্শে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডস্থ সেনাদলের সঙ্গে বিদেশস্থ সৈনিকদের অবস্থান বদল করাতে সৈন্যগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ায়, সেই প্রথা আবার কিছুকাল পরে রদ করা হ'ল।

১৮৭৮-৮০ সালে আফ্‌গান যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বিভাগের অনেক গলদ প্রকাশ হইয়া পড়ায়, তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ এক সৈন্য সংস্কার কমিশন্ আহ্বান্ কল্লেন, ও সামরিক ব্যয় সংক্ষেপের ব্যবস্থায় মনোযোগী হলেন। এই সময়ে মোট সৈন্যসংখ্যা দুই লাখ ছিল; তন্মধ্যে বৃটিশ্ ৬৫ হাজার ও দেশীয় ১৩৫ হাজার। কমিশনের ফলে বৃটিশ্ অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল, দেশীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হ'ল, তিনটি প্রেসিডেন্সি সেনাদল একত্র মিলিত হ'ল, ও তাদের পৃথক্ ব্যয়ের হিসাব ও অস্ত্রনির্ম্মাণ বিভাগ সমস্ত একত্র হয়ে, ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। পরে পঞ্জাব-সীমান্ত-বাহিনীও পঞ্জাব সরকারের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের জঙ্গীলাটের অধীনে এল।

১৮৮৬-৮৭ সালে সর্ব্বপ্রথম পোষাকী সেনাদলের (Army Reserve) সৃষ্টি হ'ল, এবং ১৮৯১ সালে তিনটি পৃথক প্রেসিডেন্সি ষ্টাফ্‌কোর একত্র হ'য়ে একটি মিলিত ভারতীয় ষ্টাফ্ কোরে পরিণত হ'ল।

ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি

ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লৌহ ও ইস্পাতের প্রস্তুত-প্রণালী জানা ছিল, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান। ইহা খৃঃ ৩১০ সালে প্রস্তুত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, এখনও পর্য্যন্ত ইহা মরীচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই। আজ কালও প্রায় ভারতের অনেক স্থলে সেই প্রাচীন উপায়ে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা হাপরে যাঁতার সাহায্যে লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার লৌহ প্রস্তুত করিবার হাপরগুলি উচ্চে প্রায় দেড় হাত এবং অনুমান ২॥৩ সের মাত্র লৌহ প্রতিবারে প্রস্তুত হইতে পারে! লৌহ-প্রস্তরের সহিত কাঠকয়লা মিশ্রিত করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া যাঁতার সাহায্যে লৌহ বাহির করা হয়। কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এখনও বড় বড় হাপরে করিয়া লৌহ প্রস্তুত হয়। এই সকল হাপর হইতে দিনে প্রায় একমণ হইতে দেড়মণ পর্য্যন্ত লৌহ বা ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অল্প সল্প লৌহ প্রস্তুত প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। যখন লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার দরকার হয়, তখন তাহা দুই উপায়ে হইয়া থাকে—(১) বিশুদ্ধ লৌহকে অঙ্গারাক্ত করা; বা (২) অধিক অঙ্গারযুক্ত লৌহ হইতে অঙ্গারের ভাগ কমাইয়া ইস্পাত অনুযায়ী অঙ্গারাক্ত করা। আজ কাল ক্রমে ক্রমে পুরাতন পদ্ধতি হিসাবে লৌহ প্রস্তুত করা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। ১৯০৯ খৃঃ অঃ ভারতবর্ষে এইরূপ লৌহ প্রস্তুত ১৫৯টিতে দাঁড়াইয়াছে। খৃঃ ১৯০৫—১৯০৯ সালের মধ্যে কেবল মাত্র মধ্য-ভারতবর্ষের ভিতরে ৫৫৭ টন (এক টনের ওজন প্রায় ২৭॥০ মণ) লৌহ প্রাচীন উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরের হিসাব এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আজকাল ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বড় বড় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। তাহারই বিবরণ এখানে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম বৃহৎ লৌহ-কারখানা ১৮৩০ খৃঃ অঃ মাদ্রাজ উপকূলে স্থাপিত হয়। ইহার মালিক ছিলেন Joseph Marshall Heath সাহেব। কিন্তু কিছু দিন কারখানা চালাইবার পর, মাল বিক্রয় না হওয়ায়, তাঁহাকে ইহা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর বরাকর অঞ্চলে ১৮৭৫ খৃঃ অঃ Barakar Iron Works Company নামে একটী লৌহ-কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাও বিশেষ সফল হইতে পারিল না। এই কোম্পানিকে ১৮৮৯ খৃঃ Bengal Iron and Steel Co. ক্রয় করিয়া লয় এবং ইহার অনেক পরিবর্দ্ধন করে। তথাপি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাওয়াতে ইহাদিগকে ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্য উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল; এবং পরবর্ত্তী কালেও ইহার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। তবে সম্প্রতি ইহার মূলধন বাড়াইয়া অনেক পরিবর্ত্তনের পর এক্ষণে ভালরূপই চলিতেছে। ইহার নামও বদল হইয়া কেবলমাত্র The Bengal Iron Co. Ld.এ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের Blast furnace, Iron foundry, Engineering shops, collieries, coke-ovens, sulphuric acid and sulphate plants and Iron ore mines—এইগুলি নিজস্ব আছে। পাঁচটী blast furnaceএ বৎসরে ২০০,০০০ টন করিয়া লৌহ উৎপন্ন হয়; ৩৪টী করিয়া চারি স্তর Simon-carves by-product coke ovens (অর্থাৎ কোক কয়লা করিবার উনান) আছে; তাহাতে বৎসরে ২৫০০০০ টন কোক কয়লা প্রস্তুত হয়। Blast furnace ও coke ovensজাত গ্যাস হইতে ৩৩টি Lancashire boiler চালিত হইতেছে। ইহাদের "মনোহরপুর" ও "বেঙ্গল" নামক যে দুই রকমের লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমাদৃত; এবং লঙ্কাদ্বীপ, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্ট, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড দ্বীপ অবধি ইহা রপ্তানী হয়। ইহাদিগের লৌহ প্রস্তর (Iron ore) বর্দ্ধমান ও সিংভূম জেলা হইতে আইসে। ইহাতে শতকরা ৫৫ ভাগ লৌহ আছে। কয়লার খনিগুলি সবই ঝেরিয়া ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত। কয়লার খনিগুলি হইতে বৎসরে ১৫০০০০ টন্ করিয়া কয়লা উৎপন্ন হয়। এই কারখানায় লৌহ নির্ম্মিত pot sleepers, pipes এবং mill columns প্রভৃতি ঢালাই দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়, এবং blast furnace হইতে ferro-manganeseও প্রস্তুত হয়। মূল কারখানায় প্রায় ৮০০০ লোক কাজ করে এবং ২০০০ লোক কয়লার খনিতে ও ৩০০০ লোক লৌহ প্রস্তর খনিতে কাজ করে।

ইহার পরেই বিখ্যাত Tata Iron and Steel, Co. Ld. ১৯০৭ সালে সিংভূম জেলায় সাকচী গ্রামে স্থাপিত হয়। ইহার জনন-কর্ত্তা পরলোকগত জামসেটজী টাটা। কিন্তু তিনি ইহা নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই ১৯০৪ সালে পরলোকগত হন। তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সাহেব এই নগরের নাম 'জামসেদপুরে' পরিণত করিয়াছেন এবং রেল ষ্টেশন 'কালিমাটীর' নামও পরিবর্ত্তন করিয়া 'টাটা নগর'—রাখিয়াছেন। এই কারখানায় লৌহ ও ইস্পাত দুইই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে সর্ব্ব প্রথম ইহাতে ইস্পাত roll হইয়াছিল এবং ইহার এক মাস পরে রেলের লাইন কলে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এই কারখানায় Blast furnace, Open hearth, Blooming mill, Rail mill, coke ovens, sulphuric acid and sulphate plant, plate and sheet mill, Bar mill, merchant mill, machine shop, foundry, millwright shop প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পৃথক পৃথক ভাগ আছে। এই সকলের সচিত্র বিবরণ অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কারণে এ স্থলে উহা বিশদরূপে লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এই কারখানা আজকাল পৃথিবীর মধ্যে একটী সুবৃহৎ ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই কারখানা হইতে বৎসরে ৮০০০০০ টন্ লৌহ (Pig iron) এবং ৫৭০০০০ টন্ ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। সম্প্রতি জামসেদপুরের কারখানায় ৩৬০০০ লোক কর্ম্ম করিতেছে, আর ইহাদিগের কয়লার খনিতে ৪৫০০, লৌহ-প্রস্তর খনিতে (Limestone and Dolomite) ৪০০০ লোক কর্ম্ম করিতেছে; অর্থাৎ এই কারখানার কার্য্যের জন্য মোট ৫২৫০০ লোক খাটিতেছে। তন্মধ্যে প্রায় ২০০ জন বিদেশীয় শ্বেত কর্ম্মকার রহিয়াছে।

জঙ্গল দেশ পরিষ্কার করিয়া কারখানা নির্ম্মাণের জন্য কোম্পানীকে তাহার লোকেদের বসবাসের নিমিত্ত ৪৫০০ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে; এবং ইহাতে অনুমান দেড় কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিন বৎসর যাবৎ একটী Technical Institute খোলা হইয়াছে। ইহাতে বৎসরে ২৫টী করিয়া ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়; এবং তিন বৎসর কারখানায় কর্ম্ম করিয়া ও পড়িয়া শেষ পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উত্তম চাকরী দেওয়া হইবে।

এই কোম্পানী হইতে মাল ক্রয় করিয়া নানাবিধ ব্যবহার্য্য সামগ্রী নির্ম্মাণের নিমিত্ত ইহার নিকটে আরও পাঁচটী কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম (১) The Tinplate Company of India, (২) The Agricultural Implements Co. (৩) The Calmoni Engineering Company (৪) The Indian steel wire products, Ld. (৫) The Enamelled Iron ware Company। ইহারা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পরে খৃঃ ১৯১৮ সালে Burn Co. তিন কোটী টাকা মূলধনে Asansoleএর নিকটবর্ত্তী হীরাপুর গ্রামে Indian Iron and Steel Cor. কারখানা লৌহ প্রস্তুতের জন্য তৈয়ার হয়। এই কারখানায় এখন কেবল মাত্র লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের এখন কেবলমাত্র Blast furnace, by-product coke-ovens, ammonium sulphate ও sulphuric acid প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি দুইটী blast furnace চলিতেছে; ইহার লৌহ উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩৫০ টন্ করিয়া। তবে ইচ্ছা করিলে ইহাকে বাড়াইয়া ৫০০ টন্ অবধি করা যাইবে; কোক কয়লা এখন ৮০টী Simon carves waste heat কয়লার উনান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত লৌহ ঢালাই কারখানা (Foundry), machine shop ও blacksmith shopও আছে। ইহাদেরও আপন আপন কয়লার খনি, লৌহ প্রস্তরের খনি ও চূণ প্রস্তরের খনিও আছে। কারখানায় ব্যবহারের নিমিত্ত যে জল আবশ্যক, তাহা তাহারা এক ক্রোশ দূরে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী হইতে আনয়ন করিয়া, কারখানার ভিতর একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছায় ধরিয়া রাখে; ইহার মধ্যে ৩০,০০০,০০০ গ্যালন্ (এক গ্যালন্ প্রায় পাঁচ সের) জল ধরে। এই কারখানা এখন সম্পূর্ণরূপে চালিত হইয়াছে এবং ইহার মাল ক্রয়েরও যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে।

খৃঃ ১৯২৩ সালে মহীশূরের রাজা ভদ্রাবতী নগরে একটী ক্ষুদ্র লৌহ প্রস্তুত ও wood distillation কারখানা খুলিয়াছেন; এইটী এই নিমিত্ত আশ্চর্য্যজনক যে, ইহা কেবলমাত্র কাঠ-কয়লার দ্বারা চালিত হইতেছে। কারখানা হইতে ৫-১০ ক্রোশের মধ্যে রাজার আপন ৩৫০ বর্গ মাইল জঙ্গল হইতে কাঠ আনয়ন করিয়া তাহা হইতে কাঠ কয়লা প্রস্তুত হয়। এই কাঠ কয়লা প্রস্তুতের নিমিত্ত ১২টী বদ্ধ উনান (Retort) আছে এবং ইহা হইতে নানা রূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে methyl alcohol, calcium acetate এবং আল্‌কাত্‌রাই প্রধান। ইহাদের blast furnaceএ লৌহ-পাথরের সহিত কাঠ কয়লা মিশ্রিত করিয়া লৌহ বাহির করা হয়। এবং ইহা হইতে প্রতি দিন ৬০ টন্ বা বৎসরে ২২০০০ টন্ লৌহ উৎপন্ন হইতে পারিবে। ইহারা লৌহ প্রস্তর দুইটী স্থান হইতে আনয়ন করে। একটী কেম্মান্ গুণ্ডি হইতে; ইহা ভদ্রাবতীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এবং আর একটী হইতেছে চত্তনালী—ইহা আরও ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহারা লৌহমলের নিমিত্ত dolomite প্রস্তর ব্যবহার করে। এখানে পাঁচ ছয় প্রকারের লৌহ প্রস্তুত হইতেছে।

আর একটী কারখানা হইবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত; কিন্তু উহার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঐটী হইতেছে The United Steel Corporation of Asia, Ld.। কলিকাতার Bird & co. এবং বিলাতের বিখ্যাত Cammell, Laird & Co মিলিয়া ইহার গোড়া পত্তন করিয়া [illegible]

ইস্পাতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে। তন্মধ্যে রেলের লাইন, কড়ি, বরগা, angles, channels, plates, ইস্পাতের নানারূপ চাদর, galvanized চাদর, তার ও তারের দ্রব্যাদি প্রভৃতি প্রধান। এই কারখানায় বৎসরে ২৫০,০০০ হইতে ৫০০,০০০ টন্ তৈয়ারী মাল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। ইহা প্রায় টাট কোম্পানির তুল্য কারখানা হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক টাটা কোম্পানি ও মহীশূর রাজার কারখানা ব্যতীত উপরি উক্ত সকল কোম্পানিগুলিরই মূলধন বিলাত হইতে আগত। শেষোক্ত কোম্পানির কার্য্যকরী মূলধন না উঠাতে উহারা এখনও কারখানার কোন কার্য্যই আরম্ভ করে নাই।

ভারতবর্ষে আরও দুই চারিটী লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইলে আর আমাদের বিদেশী লৌহ বা ইস্পাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয় না। এদেশে এখনও কোটী কোটী মণ অব্যবহৃত লৌহ প্রস্তরের পাহাড় রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সকল পাহাড়ের সন্নিকটেই কয়লার খনি মজুত। এইরূপ সুযোগ কোনও দেশে আছে কি না সন্দেহ। এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট লৌহ পাথর, সেইরূপ সস্তা কয়লা ও লোকের মজুরী, এবং রেলের ভাড়াও অপরাপর বিদেশ হইতে সস্তা। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, কালে এই ব্যবসা এখানে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিদেশী লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির উপর শুল্ক বসাইয়া দেশীয় কারখানাওয়ালাদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ১৯১৬ হইতে ১৯২২ সালের মধ্যে যে পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।—

	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২১	১৯২২
	টন্ ওজন	টন্	টন্	টন্	ন্	টন্	টন্
লৌহ (pig iron)	২৪৬,৫৫৩	২৫১,৬৪৮	২৬৪,৬৬৩	৩১৯,৯৮৪	৩১২,৪৩৯	৩৭১,০৬২	৩৪০,২৩৬
ইস্পাত ইত্যাদি	৯১৯৪৩	১০৫,০৩৯	১২০,৪৫১	১২৩৯৬৮	১১০৩১১	১২১৬৪৩	১১০৪৩২

বাউল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

তোমরা তারে করবে করো ঘৃণা—
সে যে সকল লজ্জা ঘৃণার অতীত;
সন্ধানী সে পতিতপাবনেরি;
তোমরা তারে করবে করো পতিত।
ঢিলে তাহার আলখেল্লা দেখে
দুধারেতে পথের লোকে হাসে।
মাথায় চূড়া লম্বা দাড়ি রেখে
নুপূর পায়ে গান গাহিতে আসে।
নেচে নেচে ভঙ্গী করে ঘোরে
সুরের সাথে একতারাটী বেঁধে;
পাগল, আহা, দেয় যে পাগল করে—
হাসতে গিয়ে প্রাণ যে উঠে কেঁদে।
খেয়াল নাহি শাস্ত্র কথা ভাবার,
রস ভিয়ানে এতই মাতোয়ারা;
রাগের পথে তার যে আনাগোণা,
ভাব সাগরে জাল ফেলিয়াই সারা।
সমাজের সে ধার ধারে না কিছু;
কণ্টক-হার গলায় পরে কিনি;
শুভক্ষণে নষ্টচন্দ্র দেখে
সে হয়েছে 'গৌর-কলঙ্কিনী'।
বুঁদ হয়ে যে ফিরছে সহজিয়া;
কত কথাই রটছে তাহার নামে।
সঙ সেজে সে নিচ্ছে জোগাড় করে
পাথেয় তার প্রেমের ব্রজধামে।
বনের বাবুই চরতে আসে ডাঙায়;
নীড় বেঁধেছে শ্যাম তমালে ও যে,—
সে যে চকোর সুধার ক্ষুধায় পাগল
জলায় থাকে চাঁদকে নভের খোঁজে।
নয় সে কমল—মূর্ত্ত পবিত্রতা;
নয় সে জবা—রাঙা পায়ের আলোক;
কদম্ব সে ভাবের কেলি কদম্
কাঙ্গলেরি জমাট করা পুলক।
তোমরা তারে করবে কর ঘৃণা,—
সে যে সকল লজ্জা ঘৃণার অতীত;
সন্ধানী সে পতিত পাবনেরি
তোমরা তারে করবে কর পতিত।

দ্বন্দ্ব

শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর প্রভাত—নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ বাগানের গাছপালায়, মাথায় মাথায় ঝলমল করিতেছে। বাতাস চঞ্চল আর্দ্র শেফালির সুবাসে ভরা। জানালার বাহিরে আমগাছের উপর বসিয়া একটি ছোট পাখী গান গাহিতেছিল।

মিসেস্ রায় তাঁহার ড্রয়িংরুমে বসিয়া কোন প্রয়োজনীয় পত্র রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কক্ষের বাহিরে চাপরাশী মেম সাহেবের আদেশ প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ; কেবল বাড়ীর পাশে কর্ম্মনিরত এক দরজির সেলাইকলের একঘেয়ে ঘর্ঘর ধ্বনি সেই স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। মিসেস রায়ের মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টেবিলের উপরিস্থিত কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল; এবং তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল উড়াইয়া বিশৃঙ্খল কেশদাম মুখে চোখে ফেলিয়া খেলা করিতেছিল। "আঃ! পাখাটা জ্বালালে দেখছি!" নিজের মনে মৃদুস্বরে কথাটা বলিয়া, মিসেস রায় বিশৃঙ্খল কাগজগুলা গুছাইতে আরম্ভ করিলেন।

ঘরের বাহিরে আমের ডালে বসিয়া তখনো পাখীটি গান গাহিতেছে। দৃষ্টি তাহার পরিষ্কার, মেঘমুক্ত, নীল আকাশের দিকে। যেন কোন একটা সুদূরের আহ্বান তাহার কাণে বাজিতেছে; সে যেন সেই আহ্বানে কোন অসীমের মাঝে উধাও হইয়া উড়িয়া যাইতে চায়!

মিসেস রায় কিছুক্ষণ একদৃষ্টে জানালার বাহিরে পাখীটির দিকে শূন্যমনে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার গর্ব্বোদ্ধত মুখখানি আজ কিসের চিন্তায় পরিম্লান; নয়নের দৃষ্টি বিষণ্ণ। তিন মাস পূর্ব্বের একটি সুখময় চিত্র তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহার চিত্ত মথিত করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে গান বন্ধ করিয়া ছোট পাখী এক দিকে উড়িয়া গেল। মিসেস রায়ও একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন।

অকস্মাৎ ঘরের বাহিরে সে স্থানের নীরব গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া সুমিষ্ট হাসির শব্দ ধ্বনিয়া উঠিল। পদক্ষেপের শব্দে চকিত হইয়া মিসেস রায় তাঁহার সুদৃশ্য টেবিলের উপর হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার ছোট মেয়ে লীলা ঝড়ের মত উদ্দাম গতিতে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার দিকে একবার চাহিতেই, রাগে ও বিরক্তিতে মিসেস রায়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

লীলার ঢাকাই সাড়ীর স্থানে স্থানে কুকুরের দন্তাক্ত পায়ের চিহ্ন। রৌদ্রে এতক্ষণ ছোটার ফলে তাহার মুখ রক্তবর্ণ। ঘন-কৃষ্ণ চুলের রাশি ঘর্ম্মসিক্ত ও অবীচ্যুত হইয়া চোখে, মুখে ও পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একটি ছোট কুকুর তাহার কাঁধের উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া মিট মিট করিয়া চাহিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে লীলা তাহার মাতার টেবিলের নিকট দাঁড়াইল। —"উঃ! আজ মাঠে যে দৌড়নটা হয়েছে মা! তুমি যদি দেখতে একবার। অত বড় ধানক্ষেতটা ঠিক দশবার আমি চক্কর দিয়েছি—উঃ! হাঁপ ধরে গেছে!"

মিসেস রায় অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, সে তোমার চেহারা দেখেই যথেষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার কাণ্ড দেখে দেখে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি লীলা! তোমার পায়ের দিকে ও কার্পেটের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি!

মাতার এই বিরক্তিপূর্ণ কথায় লীলা তাহার বুক হইতে টেরিয়ারটিকে একটু সরাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, তাহার জুতা কাদায় ভরা; বারাণ্ডা হইতে ঘরের কার্পেট পর্য্যন্ত কর্দ্দমাক্ত জুতার দাগে ভরিয়া গিয়াছে!

অপরাধী কিন্তু ইহাতে কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করিল না। বরং তাহার চঞ্চল চোখ দুটি কৌতুক ও দুষ্টামিতে ভরিয়া উঠিল। মাকে আরও বিরক্ত করিয়া

একটা তুলনামূলক সমালোচনা শুনিবার ইচ্ছায় সে খুব সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, কিন্তু বীণা কখনো এ রকম নোংরামি করতে পারে না—না মা?

মিসেস রায়ের মতে বীণা চারুতা ও শীলতার আদর্শ-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই দুবিনীত লীলাকে বীণার আদর্শে চলিতে শিক্ষা দিতেন। লীলার কথা শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নীরস স্বরে বলিলেন, নিশ্চয়ই নয়! আমি কখনো ধারণা করতে পারি না যে, সে এ রকম নির্ব্বোধের মত কোন কাজ করতে পারে। তার সঙ্গে যে তোমার কত তফাৎ, সেটা যে তুমি নিজের বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছ, তাতে আমি খুসি হলুম। সকাল বেলা এমন করে সর্ব্বাঙ্গে ধুলো কাদা মেখে কোথা থেকে এলে? কোন কালেই কি তোমার একটু বুদ্ধি-বিবেচনা হবে না?

লীলা টেবিলের উপরিস্থিত মিসেস রায়ের ভুক্তাবশেষ বিস্কুট একখানা তুলিয়া লইয়া কুকুরের মুখে ভরিয়া দিল। তার পর নিজে কয়েকখানা মুখে পুরিয়া দিয়া, অবহিত ভাবে বলিল, আমি সকালে উঠে জিমিকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে গিছলুম। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা খরগোসকে ছুটতে দেখে, আমার টেরিয়ার তাকে তাড়া করে দৌড়ল, আমিও ওদের পিছনে পিছনে ছুটছিলুম! তাই জন্যেই ত আজ এত দেরি হল! উঃ! যা খিদেটা পেয়েছে আমার!

মিসেস রায় এক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে কন্যার বিশৃঙ্খল মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। দারুণ বিরক্তি ও রোষের চিহ্ন তাঁর ভ্রূকুটী-কুটিল মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল। লীলার এই দুরন্ত বন্য প্রকৃতি যে কিরূপে আধুনিক ভদ্রতা ও সভ্যতার গণ্ডীর ভিতর আনা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। মেয়েটা যে দিন দিন এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল! এই অদ্ভুত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পরিচিত কেহ যদি তাহাকে দেখিতে পাইত! মিসেস রায়ের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

লীলা কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মাতার দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষ সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার প্রিয় কুকুরকে আদর করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস রায় বলিলেন, আর দুদিন পরে তোমার কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হবে; এখনো একটা সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিও তোমার হলো না? আমার সমস্ত জীবনটা তুমি অশান্তিময় করে তুলছ একেবারে! পাটনার জজের মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে কাদা ধুলো মেখে ধানক্ষেতে কুকুর নিয়ে ছুটোছুটী করছে! লোকে দেখলে কি বলতো বল দিখি? এ কথা ভাবতে লজ্জা ও অপমানে আমার সর্ব্ব শরীর হিম হয়ে আসছে! মাঠে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় নি ত তোমার?—"না, খালি কিরণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেও আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিলে!"

"কিরণ?" দারুণ বিস্ময়ে মিসেস রায়ের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল!

লীলা মায়ের ভাব দেখিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ তুলিয়া বলিল, কিরণ গো! বসন্তপুরের জমীদার কিরণ চৌধুরী! দু সন্ধ্যে বাড়িতে আসছে সে, চিনতে পারলে না?

রুদ্ধ রোষে গর্জ্জন করিয়া মিসেস রায় বলিলেন, খুব চিনতে পেরেছি! তোমার কাছে তার পরিচয় আমি জিজ্ঞেস করতে যাই নি! তোমার নির্লজ্জতা ও স্পর্দ্ধা দিন দিন যে সীমা অতিক্রম করছে, তাই দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! আমার সব চেয়ে লজ্জা ও কষ্টের কারণ এই যে, তুমি আমারই মেয়ে!

লীলা সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল, কেন, কি করেছি আমি?

মিসেস রায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, এর বেশি আর কি করবে? একটা নিজের সম্মান-জ্ঞান নেই, সামাজিক ভদ্রতা-বোধ নেই, লজ্জার ত লেশ মাত্র দেখছি না! এই সব শিক্ষা পাবার জন্যে কি তোমাকে লণ্ডনে এত পয়সা খরচ করে আট বৎসর ধরে রেখে দিয়েছিলুম? বীণাও ত তোমার মত লণ্ডনে এতকাল রইলো—এত শিক্ষা পেলে; কই, তার জন্যে কোন দিন আমাকে একটা কথা বলতে হয় না। আর তুমি? একটা সামান্য সামাজিক 'এটিকেট' পর্য্যন্ত তোমার মাথায় ঢোকে না! কিরণ চৌধুরী একটা নিঃসম্পর্ক বাইরের লোক—তার সঙ্গে কত দিনের পরিচয় তোমার? যে, তোমার মত একটা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে তাকে

নাম ধরে ডাকছ; আর তাকেও তোমার সঙ্গে সেই রকম ঘনিষ্ট ব্যবহার করবার অধিকার দিচ্ছ! লজ্জা করে না তোমার একটু? সমাজের লোকে এ সব বেয়াড়া চাল দেখলে কি বলবে বল দেখি?

লীলা এতক্ষণ মায়ের তিরস্কার মন দিয়া শুনিতেছিল। অভিযোগের কারণটা শেষের দিকে বুঝিয়া, অত্যন্ত উপেক্ষা ভরে বলিল, ওঃ! এই কথা! যার জন্যে এত বকাবকি করছো তুমি? বাস্তবিক, একটা নিতান্ত ছোট কথাকে তোমরা যে কি করে বাড়িয়ে তার এত চর্চ্চা করতে পার, দেখলে আমি অবাক হয়ে যাই! তোমার রাগ দেখে আমার হাসি পাচ্ছে মা! সত্যি বলছি!

মিসেস রায় তাঁহার এমন একটা প্রচণ্ড বক্তৃতার উত্তরে লীলার এই লঘুতা দেখিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। মেয়েটা এমন অবাধ্য ও লঘুপ্রকৃতি যে, এ রকম সব গুরুতর সমস্যার বিষয় গুরুতর ভাবে লইতেই জানে না। সব তাতে শুধু হাসি আর ঠাট্টা! কিন্তু পোড়া লোকে ত ভিতরের এত কথা বোঝে না! তাঁরা শুধু তাঁহাকেই দোষ দেয়! বলে, মায়ের কোন শাসন বা শিক্ষা থাকিলে কি আর মেয়ে অমন হইতে পারে? ঘরের বাহিরে লীলাকে লইয়া কি জ্বালাই যে তাঁহার হইয়াছে!

প্রকাশ্যে তিনি তাঁর রক্তদৃষ্টি লীলার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "এটা তোমার কাছে ছোট কথা হলো? বীণার সঙ্গে ত কিরণের তোমার চেয়ে অনেক বেশি দিনের পরিচয়। সে কোন দিন ওরকম করে, দেখেছ?

লীলা বলিল, আমি জানি—সে করে না। করবেই বা কোত্থেকে? তার নিজের কি কোন প্রাণ আছে—না ইচ্ছার শক্তি আছে! সে হলো তোমাদের সমাজের আদব-কায়দা-দুরস্ত যন্ত্র বিশেষ—তোমাদের বাঁধাধরা নিক্তির মাপে সে হাসে, গল্প করে, চলে ফেরে, দম দেওয়া পুতুলের মত। আমি যে ঠিক ও-রকম হতে পারবো না—সে ত তোমায় আমি কত দিন ধরে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি! আমি কোন কালে বীণার মত বা সমাজের আর সব মেয়েদের মত হতে পারবো না। সে আশা তুমি আমার উপর রাখলে, নিজেও কষ্ট পাবে, আমাকেও কষ্ট দেবে। যাক্, যে কথা নিয়ে এত চর্চ্চা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমার মত এই যে, যখন কোন লোকের সঙ্গে যথার্থ অকপট ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্টতা জন্মায়, তখন খামকা কতকগুলো বাজে সম্ভ্রম দেখিয়ে চলা ও কতকগুলো বাঁধা গৎ আউড়ে কথা বলা—শুধু ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। কিরণ ও আমার বন্ধুত্বের মধ্যে ওরকম কিছু থাকতে পারবে না। তাই আমরা সামাজিক ভদ্রতা ও আদব-কায়দা ছেড়ে দিয়ে, দুজনে দুজনকে নাম ধরেই ডাকি। এর মধ্যে তোমার বা সমাজের লোকদের এত লজ্জা পাবার যে কি কারণ আছে, আমি ত তা ভেবে পাই না।

লীলার এই সতেজ বক্তৃতার পর মিসেস রায় হাল ছাড়িয়া দিয়া হতাশ ভাবে বলিলেন, আমি আর তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না। এ সম্বন্ধে যা বলবার আছে, তোমার বাবাকে সব বোলবো। তিনিই ত আদর দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছেন। তিনি এখন নিজে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন; কিন্তু এখন আমার নিজের তোমাকে একটা বিষয় বলবার আছে। তুমি যাও, স্নান করে পরিষ্কার হয়ে এস আগে, এ রকম নোংরামি আমি সহ্য করতে পারি না। চাকরদের মধ্যে কারুকে ডেকে দিয়ে যাও—বারাণ্ডা ও কার্পেট সাফ করুক। আর তোমার ভিজে জুতো এখনি গিয়ে খুলে ফেল, দেরি করো না।

মিসেস রায়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লীলা সহসা মসলিনের মনোরম পর্দ্দা প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার তীব্র ও উচ্চ শিসের শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দূর হইতে দূরান্তরে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

মিসেস রায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটির গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাগ ও বিরক্তিতে তাঁহার ললাটের স্থূল শিরা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের মনে বলিলেন, একবারে হোপলেস! ওর কিছু হবে না! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

২

মিসেস রায়ের নিকট হইতে ফিরিয়া লীলা নিজের ঘরে আসিল, এবং শিশ থামাইয়া উচ্চকণ্ঠে একটা হাঁক দিল, ক্ষেন্তি!

তাহার প্রবল কণ্ঠস্বরে নীচের মহলের চাকর-দাসীরা চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পরই ক্ষান্তকে ডাকিয়া দিবার জন্য এক সঙ্গে অনেকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীক্ষ্ণতম সুর বিচিত্র রবে চারিদিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্ষেন্তি-ই ক্ষে-ন্তি-ই-ই-ই...

মিনিট পাঁচেক পরে ক্ষেন্তি ওরফে ক্ষান্তমণি মোটা সোটা কালো নধর দেহখানি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার পরেই সেখানে একটা বিষম কলরব বাধিয়া গেল।

—"ওমা! এ কি? বলি, এ কি ছিরি হয়েছে? সেই যে সকালে উঠে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল,—তার পরে সর্ব্ব শরীরের এই দশা করে, ধূলো কাদা মেখে, এত বেলায় ফেরা? অবাক করেছ বাছা! আজ না সকালে এই কাপড়খানা আলমারী থেকে বের করে দিলুম? সে কাপড় ছিঁড়ে, কাদা মাখিয়ে—ছি! ছি! এমন দস্যি মেয়ে বাপের জন্মে কখনো দেখিনি আমি! আর তাও বলি, আরো ত একটা আছে ঘরে—কই তাকে ত কখনো..."

ক্ষান্তর অনর্গল বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া লীলা বলিল, যা! যা! তোকে আর দালালি করতে হবে না! বিশ দিন না বারণ করেছি তোকে—এই রকম করে কথা বলতে! তুই কি ভেবেছিস, আমি এখনো সেই রকম খুকিটি আছি—নয়?

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, না গো! না! তুমি খুকি আছ কে বলে? তুমি এখন আমার ঠানদিদি হয়েছ! তা না হলে আর যখন তখন আমায় তেড়ে তেড়ে উঠ? যখন এতটুকু ছিলে, তখন যে রাতকে রাত গেয়ান করি নি, দিনকে দিন বলে মানি নি,—বুকে করে মানুষ করলুম,—তার ফল ফলবে না? আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন চুলোয় জায়গা নেই—এইখানে পড়ে আছি—তেমনি খোয়ার আমার হচ্ছে। আমার নিজের হাতে মানুষকরা মেয়ে—সে কি না আমায় এমন অপমান করে!

ক্ষান্তর সপ্তম সুর ক্রমশঃ খাদে নামিতেছে দেখিয়া লীলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইহার পরে যে কোন্ অবস্থা ও কোন্ কথা আসিবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে সে কথা সবই তাহার জানা ছিল। সে তাহার পূর্ব্বেই সন্ধির আশায় নরম সুরে বলিল, কেন বাজে বকে মরছিস বল্ দেখি? কি বলেছি আমি তোকে? মাঠে খেলতে গিয়ে কাপড়ে কাদা লেগে গেছে বলে মা এতক্ষণ ধরে গালাগালি দিলেন। আবার ঘরে আসতে না আসতেই তুই আরম্ভ করলি! যা তোদের খুসি, কর গে যা—আমি আজ স্নানও করবো না, খাবও না—চুপ করে শুয়ে থাকবো!

এ কথার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। লীলা মায়ের কাছে বকুনি খাইয়া আসিয়াছে শুনিয়া ক্ষান্তর রাগ অভিমান সব ভাসিয়া গেল। নিজে সে যত খুসি লীলাকে বকিতে পারে, তাহাতে কিছু দোষ নাই, কিন্তু আর কেহ তাহাকে একটি কথা বলিলে তাহার সহ্য হয় না।

সে লীলার জুতা খুলিয়া মোজা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল, তা মা আর বকবে না? তোমার ধিঙ্গীগিরি দেখে, দেখে আমারি হাড়ে জ্বালা ধরে; আর তিনি তো হলো গিয়ে মা! পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্লে পরে, হাজারই হোক্ মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে—তাই ত দু'কথা বলতে হয়...

ক্ষান্ত লীলার জন্মের পর হইতে তাহাকে মানুষ করিয়াছে। সেই প্রবল অধিকার-বোধে, এখনো সে তাহাকে ভয় বা মান্য করিয়া চলিতে পারে না। বাড়ীতে তাহার প্রবল প্রতাপ—কেহ এক কথা বলিলে, সে দশ কথা শুনাইয়া দেয়। তাহার শাণিত রসনার ভয়ে মিসেস রায়ও তাহাকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্তর বকুনি সমানে চলিতে লাগিল। লীলা বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া নীরবে রহিল, প্রতিবাদ করিলে ফল আরও মন্দ হইবার সম্ভাবনা। শেষে অসহ্য হওয়ায় সে বলিল, এদিকে বাজে বকবার বেলায় ত তোর মুখের কামাই নেই; আর কাজের সময় থাকিস কোথা বল্ ত? ঘরে এসে ডেকে ডেকে তোর ত দেখাই পাওয়া যায় না। স্নান করে মা এখনি তাঁর কাছে যেতে বলে দিয়েছেন; দেরি হলে আবার গিয়ে বকুনি খেতে হবে! কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষান্ত লীলার ঘন-কৃষ্ণ চুলের রাশির জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল, শোন কথা! যাব আবার কোথায়? জমাদার মিন্সে কাল রাতে তাড়ি খেয়ে বউটাকে একবারে মেরে আধখুন করেছে। ছুঁড়ি তাই হাপুসনয়নে কাঁদছিল। কপালটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। তাই একটু সেখেনে দাঁড়িয়েছি—না অমনি একবারে এখানে ক্ষেন্তি ক্ষেন্তি

রব পড়ে গেছে! বাবা! এক দণ্ড চোখের আড় হবার যো নেই।

লীলা এই কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিল, কি বল্লি? সে আবার তাকে মেরেছে? আমি না সেদিন তাকে বলে রেখেছিলুম—এবার ও রকম হলেই তাড়িয়ে দেব—আবার সেই কাজ?

লীলা এই সব অত্যাচার সহ্য করিতে পারিত না। সে কাহারও এরূপ অন্যায় দেখিলে বাড়ীতে হুলস্থুল বাধাইয়া দিত। ক্ষান্ত তাই কথাটা বলিয়া ফেলিয়া প্রমাদ গণিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি সে উল্টা সুর ধরিল, তা মেরেছে একটু—তাতে আর হয়েছে কি? তোমার আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! সোয়ামি স্ত্রীর মধ্যে অমন ত হয়েই থাকে,—তাতে আবার কথা কি গা! আর তাই কি আর সহজ ভাবে মেরেছে—তাড়ি খেলে কি মানুষের জ্ঞান-গম্যি থাকে কিছু?

লীলা গম্ভীর মুখে বলিল, তাড়ি খাওয়াই বা কেন তবে? বিশ দিন বারণ করেছি না? তাড়ি খেয়ে মানুষকে খুন করবে—আর কোন কথা বল্লেই বলবে—নেশার ঘোরে করেছে—আবদার আর কি! এখানে আমি ও-সব চলতে দেব না। আজ বিকেলে আমি জমাদারের ব্যবস্থা ভাল করেই করবো!

ক্ষান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, তোমার ওসবের মধ্যে যাবার কিছু দরকার নেই দিদিমণি! তুমি হয় ত গিয়ে দেখবে—তাদের দুজনের ভাব হয়ে গেছে! তখন জমাদারকে বলতে গেলে, বৌই তার হয়ে তোমার হাতে-পায়ে ধরতে আসবে! সোয়ামি-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে বাইরের লোকের না যাওয়াই ভালো!

লীলা কথাটা ভাবিয়া দেখিল, এ ক্ষেত্রে ক্ষান্ত ঠিক কথাই বলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে যখনই বধূকে নির্য্যাতনের অপরাধে জমাদারকে শাস্তি দিতে গিয়াছে, ততবার সেই নির্য্যাতিতা বধূই তাহার কাছে শত মিনতি করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে বলিল, এই রকম করে করে তোরাই ত ওদের এতদূর আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে তুলেছিস! জানে ওরা—যা কিছু অত্যাচার করি, এরা সবই মুখ বুজে সহ্য করবে! তা না হলে এত সাহস কখনো হতে পারে?

ক্ষান্ত নির্ব্বিকার ভাবে বলিল, তা কি করবে? সোয়ামিকে ত আর কেউ ফেলে দিতে পারে না?

"ফেলে দেবে কেন—ছেড়ে দিতে পারে তো? জমাদার এত অত্যাচার করে, জমাদারের বউ মুখ বুজে তা সহ্য করে কেন? সে জমাদারকে ছেড়ে দিলেই ত পারে?"

ক্ষান্ত লীলার চটি জুতার ধূলা মুছিতেছিল। সে হাতের কাজ ফেলিয়া, কিছুক্ষণ লীলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর উত্তেজিত ভাবে বলিল, ছেড়ে দেবে? এমন কথা কখনো মুখে এনো না দিদিমণি! হিঁদুর ঘরে মেয়েদের কাজই হচ্ছে সমস্ত সহ্য করে থাকা—মানুষের জীবনে কত দুঃখু কষ্ট আছে, তার মধ্যে সোয়ামির হাতে দুচারটে মার খাওয়া এতই কি দুঃখ? মেয়েমানুষ—যদি তার শ্বশুরঘর ছেড়ে, সোয়ামি ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তবে তার আর লাজ লজ্জা কিছু থাকে কি? জমাদার তো লোক মন্দ নয়, বৌকে ভাল খেতে পরতে দিচ্ছে, গয়না গাঁটি দিয়েছে। তবে যা করে, সে নেশার ঘোরে—সে কথা ধর্ত্তব্যির মধ্যেই নয়; পুরুষ না হলে মেয়েদের এক তিল চলে? ভাত কাপড় বা আসবে কোথা থেকে, গায়ে পাঁচখানা গয়না পরাই বা জুটবে কোত্থেকে! পুরুষ না হলে পয়সা আসে?

—"তুই দেখছি একজন মস্ত ফিলজফার! আর তোর যুক্তিগুলি একবারে অমূল্য ও অকাট্য! দে এখন আমার চটিটা ঝেড়ে এগিয়ে দে দিখি!" লীলা জুতা পরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষান্ত ঘরের জিনিস পত্র ঝাড়িয়া গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে নিজের মনে গজ গজ করিয়া বকিতে লাগিল—'মেয়েটা অ্যাদ্দিন ধরে বিলেতে থেকে একবারে খিরিষ্টেন হয়ে গেছে। তখনি জানি—ও সব পোড়া দেশে গেলে কি লোকের জ্ঞানগম্যি থাকে, না জাত-ধর্ম্ম থাকে! বুদ্ধি শুদ্ধি, জাত জন্ম সব খুইয়ে এরা সব যেন এক একটা কিম্ভূত কিমেকার হয়ে দাঁড়িয়েছে! সীতে সাবিত্রীর কথা চুলোয় গেল, বলে কি না সোয়ামিকে ছেড়ে দিতে! উচ্ছন্নয় গেল একেবারে! ডাহা মেলেচ্ছোর মত সব কাণ্ড-কারখানা! রাম! রাম! (ক্রমশঃ)

আমাদের ব্যথা

শ্রীমতী গিরিবালা রায়

শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" ভগিনী মনোরমা দেবী "আমাদের সম্বন্ধে" যে প্রবন্ধটী লিখেছেন, আমি সে বিষয়ে দুই একটি কথা বল্‌তে অগ্রসর হ'য়েছি—যদিও এতে আমাদের কিছুই ফল দাঁড়াচ্ছে না, শুধু একটু হাল্‌কা সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র।

আমি শিক্ষিতা মেয়ে নই,—এঁরা যাদের খুব ভয় করেন। আমি সংসারের অভিজ্ঞতা থেকে যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি, তাই এঁদের কাছে নিবেদন কর্‌ছি। শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী, আর যাঁর প্রবন্ধ উপলক্ষ ক'রে আমি এই সামান্য লেখনী চালনা কর্‌তে বসেছি সেই ভগিনী মনোরমা দেবী, কারুর প্রতি আমার কিছু মাত্র বিদ্বেষ ভাব নেই, কিন্তু আপত্তি আছে। আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান সাধনা-লব্ধ হ'তে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়। সমাজের ভিতরকার খবর আমার চোখে দেখা—শুধু কাণে শোনা নয়। তাই কিছু বল্‌তে সাহস হ'ল। স্নেহ জিনিষটি ব্যবসা নয়—স্নেহের কষ্টি-পাথর বয়স নয়—প্রাণ। ছোট্ট বউ ঘরে না এ'লে শাশুড়ী ভালবাস্‌তে পার্‌বেন না, এ কথা আমি যেন মান্‌তে পার্‌ছি না। অনেক স্থলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি মেয়ে এনেও শাশুড়ী তাকে মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌ছেন্ না,—নিজের মেয়ের সমান ক'রে ভালবাসা দূরের কথা—বেশ একটু পার্থক্যই রেখে চল্‌ছেন। আবার কোনও জায়গায় দেখা যাচ্ছে, বয়স্থা শিক্ষিতা বধূই শাশুড়ীর মন আকর্ষণ কর্‌তে পেরেছেন। বধূকে শাশুড়ী সৎ শিক্ষা দিবেন এবং বধূ সেটা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে—এটাই হচ্ছে সামাজিক প্রথা ও সনাতন রীতি। সেই পুরাকালের কৌশল্যা, কুন্তী ইত্যাদি শাশুড়ীগণকে স্মরণ কর্‌লে দেখা যাবে, তাঁরা অতি মাত্রায় শিক্ষিতা অর্থাৎ জ্ঞানী ছিলেন। যেম্‌নি শাশুড়ীগণ ছিলেন, তেম্‌নি আবার বধূগণ ছিলেন। তখন বাল্য বিবাহের প্রথা ছিল না—যুবতী মেয়েরাই স্বয়ম্বরা হ'য়েছেন,—বাপ মার কাছে হ'তে তাঁরা স্বামী মনোনীত কর্‌বার পূর্ণ ক্ষমতা পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের দোহাই দিলে তো আর এ স্থলে চল্‌বে না। আজকালকার শাশুড়ীরা নিজেরাই ভালরূপ শিক্ষিতা নহেন,—তাঁরা বধূদের কতদূর শিক্ষা দিতে পারেন? তাঁরা বধূর পড়া শুনা কিছু মাত্র পছন্দ করেন না। কাজেই পিতৃগৃহ হ'তেই আমাদের সম্পূর্ণ তৈরি হ'য়ে আস্‌তে হবে।

একটু বড় শিক্ষিতা মেয়েরাই গুছাইয়া সব করতে পারে; নিজেদের ভাল মন্দ, সৎ অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝে চল্‌তে পারে,—এরূপই আমার ধারণা। সংসার প্রায় কর্ত্তব্যের ওপরেই চল্‌ছে দেখা যায়। কর্ত্তব্য জিনিষটাকে বাদ্ দিলে, শুধু স্নেহ-ভালবাসা-দয়া-মায়া এসব বৃত্তি-গুলির ওপর নির্ভর করলে চ'লে না। কারণ হচ্ছে, এসব বৃত্তি সকলের সবটা সমান থাকে না। লেখা পড়া না শিখলে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উদারতার দিকে প্রসারিত হবে না,—আদর্শ শাশুড়ী, আদর্শ বধূ এসব শুধু কথার ভেতরই থেকে যাবে; এ কথা অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন?

আজকালকার সংসার প্রায়ই দরিদ্র। পিতৃ-গৃহও দরিদ্র, শ্বশুর-ঘরে আসিয়াও মেয়েরা দরিদ্রতাই দেখে থাকে। সুতরাং কি প্রকারে স্কুল কলেজের শিক্ষা—বিলাসিতা—মেয়েরা বজায় রাখতে পারবে, এ যেন আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। তবে ধনীর কথা আলাদা। এ কল্‌কাতা সহরে বড় বড় শেঠ, পাল, বসাক এরাই এখন বিখ্যাত ধনী। এদের ঘরের মেয়েরা এক গ্লাস জল গড়িয়ে খান্ না। প্রসাধন নিয়েই এঁরা সময় কাটান। সে জন্য কি বল্‌তে হবে যে—আধুনিক স্কুল কলেজের আব্‌হাওয়াতেই এঁরা বিলাসিনী হ'য়েছেন?

সাংসারিক কাজ শিক্ষিতা বউ হ'লে করবে না—এ'টা বড়ই ভুল ধারণা ব'লে আমার বিশ্বাস। সব দেশের পারিবারিক নিয়ম এক নয়। পশ্চিম বঙ্গে গৃহস্থ পরিবারে যাঁরা নিজ হাতে সংসারের কাজ করে থাকেন, তাঁদের ভেতর দেখা যায়, যুবতী বধূ ও মেয়ে বসে থাকেন—বৃদ্ধাদের দ্বারাই যত কিছু গৃহ কার্য্য সব সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে সে রীতি নহে। বধূরাই নিজ হাতে সব কাজের ভার নিয়ে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বিশ্রাম দিয়ে থাকেন। এই পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরাই অধিকাংশ শিক্ষিতা, অবশ্য বি-এ, এম্-এ পাশের সংখ্যা এখন পর্য্যন্তও খুবই কম। যাঁরা বি-এ, এম্-এ পাশ ক'রেছেন, এমন মেয়েদেরও আমি নিজের চোখে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাতে দেখেছি।

শিক্ষা দ্বারা বিধি-দত্ত মস্তিষ্কের সৎ ব্যবহার করবার পূর্ণ অধিকার ভগবান মেয়েদেরও দিয়েছেন। স্বাধীনতার নামে যাঁরা আঁত্‌কে উঠেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, স্বাধীনতার মানে কি! স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতাই দায়ী। প্রত্যেক পদক্ষেপে পুরুষদের মত ছাড়া যে তাঁদের চল্‌বার বিন্দু-মাত্রও অধিকার নেই, কোন সনাতন-পন্থী এ কথা পুরুষদের বলে গেছেন, একবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? কোন দাবীর বশে মেয়েদের সব শক্তি-সামর্থ্যকে অত্যাচারের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে রাখ্‌বেন, তাঁদের ভোগের উপকরণেই পরিণত ক'রে রাখ্‌বেন! স্বাধীনতা বলে কোন একটা বৃত্তি তাদের থাক্‌তে পারে, এমন বুঝবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাদের দিতে সে পুরুষগণ নারাজ! তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—তাঁদের স্বার্থ-বুদ্ধির প্রেরণাই নারী জাতির ক্রম অধোগতির মূল কি না?

বাল্য-বিবাহের প্রধান দোষই হচ্ছে, অপরিণত-বয়স্কা মেয়েদের সন্তান প্রসব। এ'তে যে দেশের কি ভীষণ অবনতি হচ্ছে, দিন দিনই শিশু-মৃত্যু ও অকাল-প্রসূতির মরণ বেড়ে যাচ্ছে;—এসব দেখে শুনেও কি ক'রে যে এঁরা বাল্য বিবাহের এত সমর্থনকারিণী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন, জানি না। লেখিকাগণ কেহ কেহ বল্‌বেন যে, ছোট মেয়ের বিয়ে হ'য়ে তার পরেও তো সে সুশিক্ষিতা হ'তে পারে। কিন্তু তাও কি হবার সুবিধা মেয়েরা পেয়ে থাকেন? ছেলেরা যতটুকু মেয়েই কেন বিয়ে করুন না, তাকে দিয়েই একটা প্রেমের রাজ্য সৃষ্টি ক'রে বসেন। এ ছাড়া যে আর স্ত্রীর জীবনে কোন প্রয়োজন হ'তে পারে—স্বার্থান্ধ পুরুষগণ তা বিন্দুমাত্র ভেবে দেখেন না। সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের গাম্ভীর্য্যটুকু ছাড়া শিখ্‌বার, দেখ্‌বার, ভাব্‌বার, বুঝবার কোনই সুযোগ তাদের দেওয়া হয় না।

পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে একটি পুরো মানুষ সৃষ্টি হয়। একজন আর একজনের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে। সনাতন-পন্থীদের একটা সুবিধে যে, তাঁরা সনাতন বিষয়ে কিছুই জানেন না। যে দেশের পুরুষজাত পাশ্চাত্য মদিরায় ভরপুর, যে দেশের পুরুষগণের ভুলেও রাম লক্ষ্মণ ভরত অর্জ্জুন হবার সখ্ নেই, তারা কি করে আশা করে যে আমরা সীতা সাবিত্রী হব! নারী-সমস্যাকে জটিল করেছে

পুরুষ। আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে তখন, যখন আমাদের পুরুষ সবল, সরল, ঋজু হ'য়ে দাঁড়াতে শিখ্‌বে, যখন নর-সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ একটি সাচ্চা কথা বলেছেন "আজকাল হ'ল Masculine Civilisation"। এর ভেতর যত সমস্যা—গূঢ় ভাবে ভাব্‌তে গেলে দেখা যাবে, ওসব সমস্যার উৎপত্তি পুরুষদের অনাচার ও অত্যাচারে। পুরুষ সমাজ গড়েছেন, পুরুষ শাস্ত্র লিখেছেন, পুরুষই বলেছেন, "ন স্ত্রীঃ স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি"। এ হেন পুরুষ জাতি নিখরচায় কোন স্বর্গে গেছেন বল্‌তে পারি না; কিন্তু আমরা যে পঙ্গু হ'য়ে আছি তাদের প্রচেষ্টায়—এ কথা অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন?

সুশিক্ষিতা মেয়ের স্থান অশিক্ষিতা মেয়ের অনেক ঊর্দ্ধে। বিধবাদের ওপর যে সমাজের কত বড় অমানুষিক অত্যাচার, সাংসারিক জীবন যে তাদের কিরূপ ভয়াবহ, সে বিষয় নিয়ে ভালরূপ আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ অনেক বেড়ে যায়। এর জন্যও কি পুরোমাত্রায় দোষী পুরুষগণ ন'ন? পুরুষদের কোন দোষ নেই,—"আমরাই আমাদের দোষে কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে চল্‌ছি" এ কথা বলে তাঁদের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করতে গেলে চল্‌বে কেন?

পুরুষ স্ত্রীকে যতই ভালবাসুন, ক্ষমতা দিন,—সংসারে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বাইরে তাদের সামান্য একটুও ক্ষমতা দিতে চান্ না। দেখ্‌ছি, আজকাল কেহ কেহ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হচ্ছেন, কিন্তু বেশীর ভাগই স্ত্রী-শিক্ষার নামে শিউরে উঠেন। তাঁদের ভাব দেখ্‌লে মনে হয়, যেন উচ্চ শিক্ষা পেলেই মেয়েরা স্বাধীন হ'য়ে যাবে,—সন্তান-পালন, গৃহকার্য্য, সব দূর ক'রে দিয়ে, তরোয়াল হাতে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি বলে দাঁড়াবে।

নিরাশ্রয়াদের নীরবে "ওদের লাথি খাওয়া" ছাড়া আর উপায় কি? সমাজপতিগণের মানের ঘর বজায় রাখ্‌বার জন্য পল্লী-বিধবার মস্ত অভিভাবক হন—তাঁর যে কেহ পুরুষ আত্মীয় আছেন। এ আত্মীয়দের মৌখিক দৃষ্টান্ত "আমার সংসারে দেবী হইয়া থাকুন"; কিন্তু পদের বেলায় দাসীত্ব।

এ সবের জন্য শুধু মেয়েদের প্রতি দোষারোপ করলে চল্‌বে কেন? তারা তো অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মতন, ওপরওয়ালাদের নিকট যেমন আদর্শলাভ করেন, কাজও তেম্‌নি ক'রে থাকেন। "পরের বাড়ী বাসন মেজে রান্না ক'রে" খাওয়ার সংখ্যা বাঙ্গালার মেয়েদের ভেতর বিরল নহে। এতে করে যে কারুর কষ্টের লাঘব হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কোথায়? স্কুল মাষ্টারী, লেডি ডাক্তার, নার্সদের পদ গ্রহণ করতে হলেও, বাইরের জুজুর ভয় দূর করতে হবে তো?

পাশ্চাত্য ভাবের আবহাওয়াই যে মেয়েদের বিলাসিনী করছে, গৃহকার্য্যে তাদের অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, হতে পারে এর ভেতর সত্যতা কতক আছে; কিন্তু তার জন্য দায়ী কি পুরুষগণই নহেন? তাঁরাই তো পাশ্চাত্য শিক্ষার আগুন এনে দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যে দিন পুরুষগণ স্বরাজ লাভ কর্ব্বেন, সনাতন যুগ আনয়ন কর্ত্তে পারবেন, প্রতীচ্যের নারী সে দিন পাশ্চাত্যকে কখনই চাইবে না। যে দেশে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হ'য়েছিল, আবার সে দেশেই উভয়ভারতী জন্মেছিলেন।

মোট কথা, পুরুষ নারীর ভেতর একটা অনৈক্য ভাব থাক্‌লে আমাদের কোনও সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না,—যত দিন পুরুষ নারী এক যোগে কাজ করবার অধিকার লাভ না করবে। "দেবী" আখ্যা আমরা চাইনে, আমরা দাসীও নই। আমরা চাই, পুরুষদের সাথের সাথী হ'তে—তাদের অন্তরের দরদী হ'তে। তা' হলেই আমাদের নারীত্ব মাতৃত্ব ফুটে উঠ্‌বে।—পুরুষ নারীর মিলনের কষ্টি-পাথর হবে—প্রীতি ও স্নেহ;—অনুগ্রহ বা কৃপা নয়।

পতিতার কথা

শ্রীহরিপদ মহালানবাশ

পতিতার পাপের চিত্র, সমাজের কলঙ্কের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি। কলুষ-কলঙ্কের হুঙ্কার-জনক গন্ধের তীব্র ঝাঁজ যাঁহাদের কোমল নাসায় সহ্য হইবে না, যে রুচিবাগীশেরা মনে মনে পাপের নরককুণ্ড পোষণ করিয়াও, এই সকল অভব্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা হইলে, উদ্দেশ্যের পূর্ব্বে লক্ষ্য হারাইয়া, অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠেন, কিংবা, যে সকল আব্রুভক্তেরা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতেছে বলিয়া লেখকের প্রেতি খড়্গ-হস্ত হইবেন, অথবা লেখকের দুর্ম্মতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া, তাহার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন, কথারন্তের পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি, সে সকল সুবোধ সচ্চরিত্র ভাল-মানুষদের নিমিত্ত এই প্রবন্ধ নয় ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এইখানেই ইতি করিয়া লেখককে নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এ যাবৎ পাঠ করিয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই দেখিয়াছি, লেখকগণ, বড় বড় পণ্ডিতদিগের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—মনুষ্যজাতির সৃষ্টির অব্যবহিত পরে, সমাজ-বন্ধনের প্রাক্‌কালে, বিবাহের প্রচলন ছিল না। অর্থাৎ এখন যে সংস্কার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে পুরুষ ও নারীর সন্তান উৎপাদনের অধিকার থাকে না, এবং এক পুরুষ ও এক নারীর জীবনে যে সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের অপর নারী বা পুরুষের সন্তানের জনক বা জননী হইবার অধিকার থাকে না, সেই সংস্কার তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জন্তু মানুষের সম্বন্ধে কথাটা বলিতে এবং শুনিতে একটু কেমন-কেমন ঠেকিলেও, কথাটা কিন্তু সত্য যে, আদিম যুগে মানব-জাতি কতকটা আজকালকার বীরনারী এবং তাহাদের উপাসক-দিগের মতই জীবন যাপন করিত। অবশ্যই তাৎকালিক সমাজে এই অব্যবস্থিত ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল বলিয়া, ইহা বিসদৃশ ও দোষাবহ বিবেচিত হইত না। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে যখন পূর্ব্বতন ব্যবস্থা রদ্ হইয়া সমাজে বিবাহ-সংস্কার কায়েম হইল, কালে যখন পরদার-লিপ্সা কেবল অন্যায় নহে, মহাপাতক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, তখনও কিন্তু মানুষের—অন্ততঃ এক শ্রেণীর মানুষের মন হইতে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অন্যায় অভিলাষ নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গেল না। প্রভেদ এই, পূর্ব্বে যে প্রথা সরল মনে প্রয়োজন বোধে অনুষ্ঠিত হইত, আজ লোকে তাহা গর্হিত জানিয়াও, প্রবৃত্তির দংশনে তস্করের ন্যায় উপাংশু ভাবে আচরণ করে।

সমাজে গণিকা-বৃত্তির প্রতিষ্ঠা ঠিক সমাজের মতই প্রাচীন। পুরাণকারদিগের কথা যদি উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে না চাই, তবে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সেই সুদূর প্রাচীন পরমধার্ম্মিক সত্য যুগেও, ভৃঙ্গ-বধূরা তাঁহাদের মর্ত্ত্যভূমির আকাশে বাতাসে ত উড়িয়া বেড়াইতেন-ই, আবার স্বর্গপুরে ধীরোদাত্ত বিসর্পিত অঙ্গভঙ্গি সহযোগে নাচিয়া গাহিয়া ইন্দ্ররাজার তথা পারিষদ্‌গণের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি গুণধরী সীমন্তিনীরা কেবল যে বেতন লইয়া নৃত্য ও সঙ্গীতকলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা নয় ; কারণ অমরাবতীর অমরাধীশ্বর তাঁহাদের সভাতায় সময় সময় অতি জঘন্য বদ্ চালও চালিতেন। কোনও তপঃপরায়ণ মুনি-ঋষি যাহাতে অত্যধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে অমন সুখের রাজাগিরি হইতে উৎখাত না করিতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি সময় সময় তাঁহার নাচ্‌ওয়ালীদিগের কাহাকেও ঐ তপশ্চারীর তপোভঙ্গ করিতে পাঠাইতেন। তাহার পর, ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যাদিতেও এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখনকার সমাজেও গণিকারা আজকালকার মতই গণনার যোগ্যা ছিল। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি পাপের অত্যন্তাভাবের কথা উল্লেখ করিয়া এই দেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ; ভারতবর্ষে তৎকালে বারবণিতারও সেইরূপ অভাব ছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন

কি না জানি না ; কিন্তু বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাবাসিনী একটি বারাঙ্গনাকে সৎপথে আনিয়া, তাহার মনে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ জ্বালাইয়াছিলেন।

আধি-ব্যাধি যেমন পৃথিবীর তাবৎ দেশেই লোকের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, গণিকা-বৃত্তিও সেইরূপ সমস্ত দেশেরই একটি অন্যতম অপরিহার্য্য উপসর্গ। যে দেশের লোকেরা নিজেকে ধর্ম্মনিষ্ঠা. সুনীতি ও সুরুচির অখণ্ড অবতার বলিয়া মনে করে, নিজেকে ধর্ম্মরাজের বরপুত্র ভাবিয়া আত্মপ্রসাদে উপ্‌চাইয়া পড়ে,—সেই দেশে, আবার যেই দেশের লোকেরা ইহ-জগততিরক্ত আর কিছু ভাবাকে দুর্ভাবনা বা দুর্ব্বলতা মনে করে, যাহারা ভগবানকে অপসারিত করিয়া নিজেকে তৎস্থলে আপাতঃ অভিষিক্ত করিয়াছে—সেই দেশে, যে দেশের নারীরা গোলকধাঁধার হাজার বেষ্টনীর মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া পুরুষের লালস দৃষ্টি হইতে নারীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে,—সেই দেশে, আবার যে দেশের মেয়েরা কতকটা পৌরুষভাবাপন্ন হইয়া প্রতি পদে পুরুষের সহিত টক্কর দিয়া চলে,—সেই দেশে, যে দেশে বিবাহ-বন্ধনের দৃঢ়তা এত শাশ্বত যে চিতাভস্মের তলদেশ হইতেও স্বামী স্ত্রীর নিকট পতিত্বের স্মারক-লিপি লিখিয়া পাঠায়—সেই দেশে, আবার যে দেশে বিবাহ-বন্ধন এত শিথিল যে, দম্পতীযুগলের যে কেহ, যখন ইচ্ছা, অপরকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিতে পারে সেই দেশে,—সর্ব্বত্রই বারাঙ্গনা বলিয়া এক শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব আছে। আমাদের শাস্ত্রকারের কঠোর অনুশাসন নারীজাতিকে এই পাপের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিধি-নিষেধের নাগপাশে নারীজাতিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে কসুর করেন নাই। শ্লোকের পর শ্লোক লিখিয়া টীকার উপর টিপ্পনী কাটিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে—"বাপু হে, মেয়ে জাতটা বড়ই অজাত। ওদের বিশ্বাস করিও না। ওদের পিছনে পিছনে সর্ব্বদা গোয়েন্দাগিরি করিয়া ফিরিও। তোমার মেয়েটিকে ও স্ত্রীটিকে উত্তরীয়ের অঞ্চল প্রান্তে গেরো দিয়ে রাখিও ; বুড়া হইলে কি হয়, তোমার মায়ের উপরও অভিভাবকতার একটু আধটু রেশ চালাইও। কপালদোষে জামাতাটির কাল হইলে শিশু কন্যাটিকেও তার সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে পার ত ভাল ; নচেৎ ঠাকুর দেবতার নাম, স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক আহার প্রভৃতি সহযোগে তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা শিখাইও।"

কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার নাই। সময় সময় ডান্‌পিটে মেয়েগুলি গোবরে পোকার মত বিধি-নিষেধের মাকড়সার জাল ছিঁড়িয়া, ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা উপেক্ষা করিয়া, ঠাকুর-দেবতার ভয় ভক্তি এড়াইয়া সহরের স্থান বিশেষে গিয়া বাড়ী ভাড়া করে। যে সব দেশের নীতিকারেরা, সামাজিক রীতি নীতি প্রণয়নে দয়া-ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়াছেন, সেই সব দেশের সাম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনও নারীকে এই ব্যভিচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কোন সমাজেই বিবাহ সংস্কারে হিন্দুর মত অত বজ্জর আঁটুনি নাই। এই সকল সমাজে বিবাহ-ছেদন ও বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন। ইঁহাদের মধ্যেও বিবাহে ধর্ম্মের একটা দিক্ আছে বটে, কিন্তু ইঁহাদের বিবাহে ধর্ম্মের দিক্‌টাই অপরিহার্য্য বা আসল কথা নহে। ইঁহাদের বিবাহ বাস্তবিক পক্ষে একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র। দুই পক্ষ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে যেমন তত দিনই সেই চুক্তি বলবৎ থাকে, যত দিন না উভয় পক্ষ তাহা রদ্ করিতে ইচ্ছুক হয়, ইঁহারাও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষে একমত হইয়া যদৃচ্ছা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন। ইঁহাদের বিধবারা ইচ্ছা করিলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন না করিলেও পারেন। পুরুষ জাতির দোষ ত্রুটি সর্ব্বত্রই যত সহজে সমাজে রেহাই পায়, কোনও সমাজেই মেয়েরা যদিও ততটা উদারতার প্রত্যাশা রাখিতে পারে না, কিন্তু এ কথা তথাপি স্বীকার্য্য যে, অ-হিন্দু সমাজে বিভ্রান্তা রমণীরা—আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া দুই একবার যাহাদের পদস্খলন হইয়াছে—তাহারা, আমাদের সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় ; সুতরাং নিজেকে সামলাইয়া লইবার সুযোগ সুবিধাও তাহাদের অনেক বেশী। কিন্তু তথাপি ঐ সকল সমাজের মেয়েদেরও কেহ কেহ, সমাজ ও ধর্ম্মের ন্যায়নিষ্ঠ অনুশাসনের প্রতি অবহেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বে-পরোয়া হইয়া ছুটিয়া চলে।

নারীকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিলেও যেমন সমাজ-দেহে ব্যভিচার-পাপের প্রবেশের সুযোগ ও সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি আবার সমাজে নারীর অবাধ গতিবিধি ও পুরুষের সহিত সমান অধিকার এবং স্খলিতচরণা নারীর প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা সত্ত্বেও, সমাজ এই কলঙ্কের কবল হইতে মুক্ত নহে। পাপ-চিকীর্ষা না রাখে কড়া আইনের ভ্রূকুটির তোয়াক্কা, না বোঝে স্নেহের উপদেশের কদর।

বিখ্যাত ইংরাজ মনস্বী মহাত্মা উইলিয়াম্ ষ্টেড্ তাঁহার If Christ came to Chicago নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, বেশ্যাবৃত্তিও একটা অর্থ-নৈতিক সমস্যা মাত্র। চিকাগো সহরের কয়েকটি নামজাদা বেশ্যা-কারখানার (Brothel) অধিকারিণী তাহাদের ঘৃণিত ব্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ এবং কয়েকটি যুবতী বারবণিতা তাহাদের কলঙ্কিত জীবনের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিল। তাহাদের আত্মবিবৃতি শ্রবণ করিয়া ষ্টেড্ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যে সকল রমণী এই ঘৃণিত জীবন যাপন করে, তাহাদের অধিকাংশই এই জীবন আদপে পছন্দ করে না, বরং ঘৃণাই করে। তাহারও জানে যে বেশ্যা-বৃত্তির মত জঘন্য উপজীবিকা আর নাই। কিন্তু তথাপি কঠোর জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া, দারুণ অর্থসঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর না পাইয়া, কেবল অন্নবস্ত্র সংস্থানের নিমিত্ত তাহারা এই পাপের পশরা মাথায় বহিয়া বেড়ায়। তিনি বলেন, কেবল পাপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—এইরূপ বারবণিতার সংখ্যা অতীব নগণ্য।

ইউরোপের সমাজে নারী ও পুরুষের যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ, তাহাতে মনে হয়, ষ্টেড্ সাহেবের কথা, তাঁহাদের দেশ সম্বন্ধে খুবই সত্য। ঐ সব দেশের মেয়েরা অনেকে আমাদের দেশের পুরুষদেরই মত আফিসে দোকানে কাজ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ এবং অপোগণ্ড ভ্রাতাভগিনীদিগকে মানুষ করে। সেই সব দেশে এইরূপ গরীব মেয়েদের প্রায়শঃ স্বামী জোটে না। কদাচিৎ জুটিলেও তাহারা কর্ত্তব্যের খাতিরে, বিবাহ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতা এবং শিশু ভ্রাতাভগিনীগুলিকে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারে না। ইহাদের কাহারও যদি বয়োধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রবল রিপুতেজনা দমন করিবার মত মানসিক বল না থাকে, উপরন্তু সেই সময় যদি তাহাদের দৈবাৎ কোন গুরুতর অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তবে সেই মেয়েটির পক্ষে অসচ্চরিত্র যুবকদিগের প্রলোচনায় পদস্খলন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সকল দেশেই একশ্রেণীর কুকুর-প্রকৃতিক পুরুষ যুবতীর যৌবনের স্নিগ্ধ কান্তির প্রতি শ্যেনদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ফিরে। নারীর চরিত্র-গৌরব পুরুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারে অধিক মূল্যবান মনে করে বলিয়াই হউক, বা অপর যে কোন কারণ বশতঃই হউক, আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পুরুষ সর্ব্বদাই গাঁটের পয়সা খরচ করিতে প্রস্তুত থাকে। নারীর কিন্তু সেই বালাই নাই। তৃষ্ণা শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ অর্থলাভও হয়। মেয়েটি একবার যদি ফাঁদে পা দিল, তবে, তাহার পর সংশোধনের শত অবকাশ থাকিতেও ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহার জীবনের সমস্যাটা ক্রমেই জটিল অপেক্ষা জটিলতর হইতে দেরী হয় না।

আমাদের দেশে কিন্তু বারনারীত্বের সহিত অর্থনীতির তেমন কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় যদিও আমাদের দেশ অতীব দরিদ্র, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্যা যদিও আমাদের দেশে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি, আজিও আমাদের দেশের মেয়েরা আফিসে দোকানে চাকরি করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করে নাই। এই দায়িত্বটা অদ্যাবধি মেয়েদের দূর বা নিকট পুরুষাত্মীয়েরাই নিজেদের স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছে। মেয়েদের পক্ষে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয়, তাহার বিচার করিবার স্থল ইহা নহে; কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়া আত্মীয়স্বজন প্রতিপালন করিতে আরও অনেক দিন লাগিবে। যে বয়সে ইউরোপ আমেরিকার চাকরিণী (চাকরাণী নহে) মেয়েরা দ্বিপ্রহরে আফিসে দোকানে কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই বয়সে আমাদের মেয়েরা দ্বিপ্রহরে অশান্ত কোলের খোকাকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে ঘুমপাড়ানী গান গায়। সুতরাং ষ্টেড্ সাহেবের মতে যে ভাবে অর্থসঙ্কটে পড়িয়া ইউরোপের যুবতীরা পাপের পথে পদার্পণ করে,

এতদ্দেশের নারীর পক্ষে সেই অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা প্রায় নাই। দারিদ্র্যই যদি শৌণ্ডিক-বৃত্তির মুখ্য কারণ হইত, তবে এই দরিদ্রতম দেশের নিত্য নূতন অভাব-নিপীড়িতা নারীর অনেকেই পিতা ভ্রাতা বা স্বামীর যৎসামান্য আয়ের উপর কিঞ্চিৎ উপরি উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিপণে যাইতে পারিত। কিন্তু ভারত-নারীর গর্ভজাত হইয়া, ভারতের মাতৃ-জাতির পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সম্বন্ধে এইরূপ অসত্য অপমানকর ধারণা পোষণ করিয়া নিরয়বাস-আলিঙ্গনের দুরাকাঙ্ক্ষা কে রাখিবে? স্বীকার করি, অপরিণামদর্শিনী সহায় সম্পদহীনা বিধবা অর্থের প্রলোভনে প্রতিবেশী ধনী ভালমানুষটির চরণে আত্ম-সম্মান ডালি দিয়া থাকিতে পারে; হইতে পারে, চক্রীর কুটিল চক্রান্তে কোনও কোনও শিশু বা বালিকা দরিদ্র পিতামাতার অঙ্কচ্যুত হইয়া পাপাত্মাদিগের কবল-গ্রস্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া, কেবল অর্থাভাব-তাড়নায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াই যাবতীয় গণিকারা এই জঘন্য ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মোহাচ্ছন্ন অতীতদর্পী লোক আছেন, যাঁহারা সমাজ সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনাই বরদাস্ত করিতে পারেন না। সমাজের সনাতন রীতি নীতির অন্ধ-স্তাবকতা-মূলক ব্যতীত অপর কোন সমালোচনা শ্রবণ করিলেই ইঁহারা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠেন। পতিতার কথা আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহাদের রোষভাজন না হইতে পারিলে অতীব সুখী হইতাম। কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমাদের হিন্দুসমাজের এই সমাজ-ব্যাধির নিমিত্ত হিন্দুসমাজ নিজেই মুখ্যতঃ দায়ী। যে হতভাগিনীরা আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া, পিতৃ মাতৃ ও শ্বশুরকুলের মুখে দুরপনেয় কলঙ্কের কালি মাখিয়া কুলত্যাগ করিয়াছে, সেই পাপীয়সীদিগের মাথার উপর যত ইচ্ছা অভিসম্পাতের ভার চাপাইতে পার, পূতি-গন্ধময় নরকরাশিতে যত ইচ্ছা তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিতে পার,—কালামুখীরা কোমর বাঁধিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তোমার সহিত লড়াই করিতে আসিবে না। তোমার সমস্ত উক্তি অত্যুক্তি এবং দোষারোপের একটির বিরুদ্ধেও তাহারা একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করিবে না। যে অন্ধকার লোকে গিয়া তাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহার গণ্ডীর বাহিরে একটি তপ্ত নিশ্বাস, একটি কাতর কণ্ঠের করুণ ধ্বনিও তোমার কাণে আসিয়া পশিবে না। কলঙ্কের পথে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমস্ত অধিকার, সমস্ত দাবীদাওয়া নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে;—বুঝি বা মানুষও তাহারা আর নাই।—কিন্তু তুমি ভুলিও না—মানুষকে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত করিবার পক্ষে তোমার দায়িত্ব কতটুকু।

আমাদের সমাজ যদি একদেশদর্শী পক্ষপাতদুষ্ট না হইত, তবে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর অপরাধের গুরুত্বও একই মানদণ্ডে তুলিত হইত। ব্যভিচার সব সময়েই ব্যভিচার; স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ব্যভিচার পাপের নিন্দা ও শাস্তি একই মাত্রার হইবে,—সমদর্শিতা ইহাই চায়। কিন্তু আমাদের সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষের সাত খুন মাপ। সে হয় ত কত অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত সুখের সংসার আগুন লাগাইয়া ছারেখারে দিয়াছে, কত দুশ্চিকিৎস্য অশ্লীল ব্যাধির চিহ্ন হয় ত তাহার সর্ব্বাঙ্গে ট্রেড মার্ক আঁকিয়া দিয়াছে,—কিন্তু তথাপি, সমাজে তাহার বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে একটু অস্ফুট হাসাহাসি হইলেও তাহার প্রতি সামাজিক দণ্ডবিধানের মত অশ্রদ্ধেয় অসম্ভাব্য কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। কারণ সে যে পুরুষ মানুষ! তাহার একটু-আধটু চক্ষুরোগ, একটু-আধটু নৈশ-বিহারের অভ্যাস থাকিবে বই কি! কিন্তু এতাদৃশ গুণধর ব্যক্তির পতি-সোহাগ-বঞ্চিতা নিরাশা-বিষাদিনী পত্নীটি যদি সহজ-বয়োধর্ম্মজাত চঞ্চল পিপাসার বশবর্ত্তিনী হইয়া একবারও ভুল করিয়া বসে, তবে সেই হতভাগিনীর আর রক্ষা নাই। চারিদিক্ হইতে যে সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি আসিয়া তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে, তাহার তীব্র জ্বালা সহ্য করা লড়াই-ফতে-করা বড় বড় বীরপুরুষেরও অসাধ্য। এই অস্পৃশ্যা কুলটার কি গতি করা যায়, গ্রামের বাহিরেই তাহার নিমিত্ত একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া বিধেয়, কি নিকটবর্ত্তী সহরের অনন্তধামে পৌঁছাইয়া দেওয়া সঙ্গত, তাহারই বিচার-সভায় হয় ত পাপীয়সীর স্বামীরত্ন উপদংশ-ক্ষতে মলম লাগাইতে লাগাইতে তাহার দোষ সপ্রমাণে রত হয়। কোনও রমণী হয় ত দৈবদুর্ব্বিপাকে লম্পটের অপাঙ্গ দৃষ্টির কুহকে ভুলিয়া গৃহত্যাগ করিল; কিয়ৎকাল পরে পিপাসা

মিটিলে নরাধম পাষণ্ড হয় ত টাট্‌কা মধুর লোভে টাট্‌কা ফুলের সন্ধানে বাহির হইল, বা বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, সিংহদ্বার দিয়া সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিল। সমাজপতিরাও তাহাকে বরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু যে সরলার সে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে,—যেহেতু সে মেয়েমানুষ, তাহাতে আবার একবার ভুলও করিয়াছে, সুতরাং সেই পাষণ্ডী কুলকলঙ্কিনীর এই আদর্শস্থানীয় মহোদার সমাজে স্থান নাই। অনুশোচনার দাবানলে তাহার হৃদয়ের কলঙ্করাশি ভস্মীভূত হইয়া যাউক, দশের মধ্যে একজন বলিয়া পুনরায় পরিগণিত হইবার আকাঙ্ক্ষানলে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক, সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সুযোগই তাহাকে দেওয়া হইবে না—বেশ্যাবৃত্তিই তাহার একমাত্র গতি।

অথচ ব্যভিচার পাতকের অনুষ্ঠানে প্রায়শঃই যে নারীর অপেক্ষা পুরুষের দায়িত্ব অধিক, তাহা কবুল না করিলেও, অন্ততঃ সমান সমান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাপ যে কেহ করুক, তাহাকে পাপই বলিব। অনুষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের লঘুত্ব-গুরুত্ব হিসাবে পাপের গুরুত্বেরও বিপরীত-ধর্ম্মী তারতম্য হয়,—এ কথা মানিয়া লইব কেন? পুরুষ ও নারী, উভয়েই একই জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া সমান অংশীদাররূপে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়। পাপ-ব্যবসায়ের লভ্য—পিপাসার শান্তি—উভয়েরই তুল্যাংশে লাভ হয়। সুতরাং আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি যে, এই ব্যবসা যদি সমাজের পিনালকোডে বে-আইনী হয়, তবে উভয় অংশীদারের মধ্যে শাস্তিটাও সমান অংশে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তাহা কখনও হয় না। এই সব ব্যাপারে চিরকালই আমাদের সমাজে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল ফলিয়া আসিতেছে। স্খলিতচরণা নারীকে সৎপথে টানিয়া না আনিয়া গণিকাবৃত্তিতে ঠেলিয়া ফেলা, তাহার আত্মীয়গণের নিকট কি করিয়া অধিকতর মর্য্যাদাকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া-স্তম্ভিত হইতে হয়।

স্বসমাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও, এমন কথা কোন্ দুঃসাহসী হলফ করিয়া বলিতে পারে—আমাদের সমাজের কোন বিধবারই প্রলোভনের ফাঁদে পড়িবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই? হইতে পারে, বয়সের অল্পতাধিক্য-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিধবারই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অতীব মহত্ত্ব ও শ্লাঘার কথা; হইতে পারে, অক্ষত-যোনি বালবিধবারও জীবন-যৌবনের সার্থকতা পুনর্ব্বিবাহে নহে! কিন্তু ভাব-বিহ্বল হইয়া সংসারের নিরেট কঠোর সত্যগুলা, সমস্যাগুলা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কাল যাহার স্বামী বর্ত্তমান ছিল, আজ বিধবা হইয়াই সে অতিমানুষ কোন শ্রেষ্ঠতর জীবে উন্নীতা হয় নাই; আজও সে রক্তমাংসের শরীর লইয়া মানুষই আছে। সুতরাং সদসৎ প্রবৃত্তিগুলির সমুদায়ই অপর সমস্ত মনুষ্যের মনের মধ্যে যেমন আছে, তাহার মনের মধ্যেও ঠিক তেমনই আছে। তোমার ও আমার উপদেশে অশান্ত প্রবৃত্তিগুলি স্ববশে না-ও আসিতে পারে। চিত্তজয় করাই না কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরত্বের লক্ষণ। কিন্তু অমন যে মুনি-ঋষিরা যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত কত কত উপদেশ-বাণী ছন্দোবদ্ধ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারও যখন সময় সময় ঐ বীরত্ব হারাইয়া ফেলিতেন—ব্যোমপথচারিণী স্বর্গীয়া বারাঙ্গনাকে অবলোকন করিয়াই যখন একজন ঊর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইতে পারিল, নদী উত্তরণ-কালে পাটনীকে দেখিয়া অধীর চিত্ত হইয়া যখন আর এক ঋষিবর ঐ নীচকুলোদ্ভবা নারীতে উপগত হইলেন, তখন বর্ণ-জ্ঞানহীনা ধর্ম্মশিক্ষা-বিমূঢ়া তরুণীদিগের কেহ যদি বৃদ্ধ পিতার পঞ্চম-পক্ষ গ্রহণ প্রভৃতি নারবান্ দৃষ্টান্ত সকল পরিপাক করিয়া একটু এদিক ওদিক হয়, তবে তাহাতে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া যায় না, তেমন তাহাকে দোষও দেওয়া যায় না। যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের সমর্থন এই প্রবন্ধের বিষয়ান্তর্গত নহে; কেবল কোন্ কোন্ রন্ধ্র দিয়া ব্যভিচার-বিষ সমাজে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করিয়া অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

কেবল মোহবশে স্খলিতচরণা রমণীকেই পাপের জীবনে ঠেলিয়া ফেলিয়া যে আমাদের আত্মঘাতী সমাজ সন্তুষ্ট, তাহা নহে। কামান্ধ নরপশুদিগের দারুণ কবলে পড়িয়া যে সকল নিষ্কলঙ্ক অসহায়া নারী নির্য্যাতিতা ও অপমানিতা হয়, তাহাদিগকেও সমাজের ত্রিসীমানা হইতে বহিষ্কার না করিয়া সমাজপতিরা জলগ্রহণ করেন না। এই যে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গ হইতে উপর্য্যুপরি লোমহর্ষণ নারীনিগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, উহা ভয়াবহ বটে, কিন্তু ততোধিক ভয়াবহ, ততোধিক চমকপ্রদ সংবাদ এই যে, এই সকল হতভাগিনীদিগের কেহই সমাজে স্থান পাইবে না। মগের মুল্লুক আর কাহাকে বলে? তর্কের খাতিরে হয় ত দুই একটা সংস্কৃত বুলি কপ্‌চাইয়া নারীকে মহাশক্তির অংশসম্ভূতা বলিয়া প্রমাণ করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা নারীকে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত করিয়া মেয়েলীত্বে পর্য্যবসিত করিয়া রাখিয়াছি। অতি নগণ্য, অতি সাধারণ কোন দৈব সংঘটিত হইলেই আমাদের নারীরা সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িতে চাহেন। সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলে, বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া ত দূরের কথা, বিভীষিকায় প্রাণ বিসর্জ্জন করা বা নররাক্ষসের হস্তে লাঞ্ছিতা হওয়া ব্যতীত তাঁহাদের অন্য তৃতীয় গতি নাই। কিন্তু প্রাণপাখী তত চট্ করিয়া দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যায় না বলিয়া, এ সব ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া ঘটিয়া উঠে না। শত শত বৎসরের দাসত্বের ফলে আমরা পুরুষেরাও এতদূর কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি যে, আততায়ীর হস্ত হইতে নিজ নিজ জননী, পত্নী ও সহোদরার সম্মান রক্ষার্থ বুকের রক্ত ঢালিয়া দেওয়া ত দূরের কথা, হাত পর্য্যন্ত উঠাই না। আততায়ীরা অক্ষতদেহে পলায়ন করিলে পর, হতভাগিনীরা চক্ষের জলে বসনাঞ্চল সিক্ত করিতে বসে, আর আমাদের পুরুষদের মনে প্রথমেই এই চিন্তা উপস্থিত হয়—এই অপবিত্রাকে কেমন করিয়া ঘাড়ে রাখিব? মূর্খ আমরা তলাইয়া বুঝিতে চাই না—নারীর সতীত্ব, নারীর পাতিব্রত্য ও নারীর পবিত্রতা কি হরণ করিবার জিনিষ? নারী স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি না দিলে, কাহার সাধ্য তাহা লুণ্ঠন করিতে পারে? অবলা অসহায়া রমণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার প্রতি জুলুম করাকে বলাৎকার বল, নির্য্যাতন বল, যাহা ইচ্ছা বল, কিন্তু উহাকে সতীত্বহরণ নামে অভিহিত করিলে শব্দশাস্ত্রের ঘোর অপব্যবহারই করা হইবে।

এই সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য বারান্তরে নিবেদন করিব।

পাহাড়ী ফুল

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ

(ক)

দারজিলিং মেল ছাড়িবে।

প্লাটফরমে ব্যস্ততার অবধি নাই। ইয়োরোপীয়েরা দারজিলিং চলিয়াছে। ইহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য যে সব আত্মীয়-বন্ধু আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। যে বিশেষ বাঙালী সম্প্রদায় ইংরেজদের ঠিক পেছনে পেছনে মুক্তির সন্ধানে যায়, সে সম্প্রদায়ের যাত্রীরও অভাব নাই। রাসভারী ব্যারিষ্টার চলিয়াছেন, বড় ডাক্তার চলিয়াছেন সঙ্গে তিন-চারটী পুত্র-কন্যা লইয়া। ইহাঁদের সঙ্গে নেপালী আয়া আছে, মুসলমান বাবুর্চ্চি-খানসামা আছে, আরোও কত কি।

মোহিত তাহার মাসীমাকে লইয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। আর দুদিন বাদে বাড়ীতে ৺পূজা,—দেরী করিবার আর উপায় নাই। তাই মাসীমার অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইতেছে। মোহিত মাসীমাকে মেয়েদের ইণ্টারে তুলিয়া দিয়া, পাশের ইণ্টারে নিজের সুটকেশ বিছানা রাখিল। তার পর প্লাটফরমে নামিয়া তাহার মাসীমার সহিত তাঁহার গাড়ীর সামনে দরজা ধরিয়া কি দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছিল। দেখিল মেয়েদের গাড়ীতে স্থান নাই, অর্থাৎ আছে,—কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ইহার অধিকারিণী, তাঁহারা অপর কাহাকেও স্থান দিতে নারাজ। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চলিয়াছেন কামাখ্যায় তীর্থ-দর্শনে। ভক্তির ত্রুটী নাই, কথায় কথায় হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিতেছেন, 'এখন মার ইচ্ছে'; এবং উপস্থিত বিশেষ উৎসাহের সহিত পান ও

দোক্তা মুখে পূরিতেছিলেন। মোহিতের মাসীমা দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই বলিয়া, এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অসুস্থদেহে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তিনি একজন প্রৌঢ়া সহযাত্রিনীকে বলিলেন 'আপনার ওই ট্রাঙ্কটার ওপর বসতে চাই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

প্রৌঢ়া বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'ওর ওপরে বসবে কি? ওর ভেতরে আমার স্বপ্নে-পাওয়া মাদুলীটী রয়েচে যে'! স্বপ্নে কি করিয়া মাদুলী পায়, এবং সে মাদুলীর প্রয়োজনীয়তাই বা কি, এই প্রশ্ন গাড়ীর সামনে দণ্ডায়মান মোহিতের মনে উদয় হইলেও, কোনও লাভ নাই জানিয়া সে কিছু বলিল না,—মাসীমাও চুপ করিয়া রহিলেন। মোহিত জানিত, এ দেশের লোক স্বপ্নে যত অধিক সংখ্যক আদেশ ও মাদুলী পায়, পৃথিবীর অন্য কোনও অংশের লোক তাহা অনুমানও করিতে পারে না। দেশের এত বড় একটা উপরি-পাওনা—ইহার বিরুদ্ধে কোন্ কালা-পাহাড় কথা কহিবে? সে কেবল বাহির হইতে মাসীমার দুরবস্থা দেখিতেছিল। মেয়েদের গাড়ী—সে যে উঠিয়া কোনও ব্যবস্থা করিয়া দিবে, সে উপায় ছিল না।

মোহিত একখানা ইংরেজী দৈনিক কিনিতে দূরে সরিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিলে মাসীমা বলিলেন,— দেখ মোহি, ওই যে পাহাড়ী মেয়েটী কোণে বসে আছে—দারজিলিংএর ওধারে কোথায় যাবে। যে মেয়েটী একে তুলে দিতে এসেছিল,—আমরা কুচবিহার যাব শুনে, সে আমায় বিশেষ করে বারবার বল্লে, 'ওকে একটু দেখবেন; সঙ্গে কেউ নেই, একা যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে অনেকটা দূর যেতে পার্ব্বে'। মোহিত চাহিয়া দেখিল, গাড়ীর এক কোণ আলো করিয়া মেয়েটী বসিয়া আছে। মাথায় একরাশ চুল। তাহার মধ্যে যেন মুখখানি স্থলপদ্মের মত ফুটিয়া রহিয়াছে।

মেয়েটীও স্মিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিল।

মোহিত মাসীমাকে বলিল, বেশ, গাড়ী বদলের সময় তুমি যেন ওঁকে সঙ্গে করে নেমো। শুনিতে পাইল, দুই একটী সহযাত্রিনী আপত্তি করিতেছিল 'এ গাড়ীতে এ বুনোটা কেন? মেমের আয়া না কি; তা চাকরদের গাড়ী তো আলাদা রয়েচে'—ইহাতে মেয়েটী বিরক্ত হইল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না; শুধু তাহার সুগৌর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। গাড়ীর বেল্ পড়িল—মোহিত পাশের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী বেগে চলিয়াছে। মিনিট কুড়ি খবরের কাগজ-খানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, মোহিতের আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া, জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া, বাহিরের দৃশ্য —চষামাঠ, তরুচ্ছায়া-বেষ্টিত ছোট গ্রাম, ছোট পুকুর, ছোট বড় অট্টালিকা একমনে দেখিতে লাগিল। দেখিয়া যেন চক্ষু জুড়াইয়া গেল। হঠাৎ চোখ পড়িল পাশের জানালায়। দেখিল, সেই পাহাড়ী মেয়েটীও অনিমেষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। দুজনের চক্ষু এক হওয়াতে, মেয়েটী ক্ষণিকের জন্য যেন একটুকু অপ্রতিভ হইল; কিন্তু দৃষ্টি সরাইয়া লইল না,—অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল। মোহিত দেখিল, মেয়েটী গোধূলির স্বর্ণাভা—যাহা আকাশে প্রান্তরে তরু-বীথিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাহাই যেন চক্ষু দিয়া পান করিতেছে। তাহার কাণের নীল পাথরের দুল দুলিতেছে, চিক চিক করিতেছে; গলায় পাহাড়ী পলার রক্তবর্ণ মালা খেলা করিতেছে।

গোধূলি সন্ধ্যায় মিশিয়া গেল। আহা, সন্ধ্যা এত মধুর! পঞ্চমীর জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি হাসিয়া উঠিল। মধুর সন্ধ্যা! চমৎকার রাত্রি!

* * * *

রাত্রি গোটা আটেক। এক বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, মোহিত নামিয়া মাসীমার খোঁজ করিল। তখন ষ্টেশনে খাবার কিনিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। মোহিত মাসীমার দরজার সামনে যাইয়া দেখিল, মাসীমা স্থান পাইয়া বসিয়াছেন। মোহিতকে দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া, পাহাড়ী মেয়েটীকে দেখাইয়া বলিলেন, ওই মেয়েটীই আমায় জায়গা দিয়েচে। বিদেশিনীর এ ব্যবহার মোহিতকে স্পর্শ করিল। মাসীমা বলিলেন, মোহি, তুই এখানে কিছু খাবিনে? মোহিত বলিল, না, এখন খেতে ইচ্ছে নেই, পরে খাব 'খন।

ভদ্রতার খাতিরে মোহিত মেয়েটীকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল, সে মিষ্টি চায় কি না?

মেয়েটী চক্ষু নত করিয়া, হাসিমুখে পরিষ্কার ইংরেজীতে বলিল, 'না, ধন্যবাদ'!

'চা'?

'না, দরকার নাই। পুনরায় ধন্যবাদ!'

এর পরের জংসনে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গাড়ী বদল। মেয়েটী তাহার চামড়ার সুটকেশ, বেতের বাক্স বাংকের উপর হইতে নামাইতে পারিতেছিল না। অন্যান্য মেয়েরা সব নামিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া, মোহিত গাড়ীতে ঢুকিয়া মেয়েটীকে সাহায্য করিয়া বাক্স দুটি নামাইল। ইহাতে মেয়েটীর হাতের সহিত তাহার হাতের স্পর্শ হইল! মেয়েটী মোহিতের মাসীমাকে লইয়া প্লাটফরমে নামিল। মোহিত ইহাদিগকে লইয়া নতুন গাড়ীর মেয়ে ইন্টারে তুলিয়া দিল। পাশের গাড়ীতে নিজের জিনিসপত্র রাখিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, কুলী দুটীকে তাহার এই তরুণী সহযাত্রিনী পয়সা দিয়া বিদায় করিয়াছে। মোহিত একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া, কুলী দুটী কত লইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। সুন্দরী গিরি-দুহিতা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল, 'না, না, সে কিছু নয়।'

মোহিত এইবার ভাল করিয়া তরুণীকে দেখিল। সুস্বাস্থ্যপূর্ণ, নিটোল, সুগৌর দেহ; মুখ-চোখের গড়নও সুন্দর। আধুনিক মেয়েদের মত সাড়ী পরা; সুন্দর মুখখানি অপরূপ লাবণ্যে ভরা। কুলী দুটীকে মেয়েটী কত দিয়াছে, তাহা মোহিত জানিতে পারিল না; অথচ কি উপায়ে সে ইহা অপরিচিতাকে ফিরাইয়া দিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে এক উপায় ঠাহর করিয়া, নিজের জন্য খাবার কিনিল। তাড়াতাড়িতে সঙ্গে খাবার তৈরি করিয়া আনা হয় নাই; অতএব ইহা ছাড়া আর উপায় কি? মোহিত সেই সঙ্গে আরোও কিছু বেশী মিষ্টি কিনিয়া আনিয়া মাসীমাকে বলিল, 'তুমি ওঁকে দাও'—তাহার নিজহাতে দিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল। মিষ্টিগুলি মেয়েটী মাসীমার হাত হইতে লজ্জা ও সংকোচের সহিত বিনা বাক্যে গ্রহণ করিল। তার পর, তাহার নিজের সঙ্গে যে খাবার ছিল, তাহা বাহির করিল,—লুচি মিষ্টি এই সব, আর দুই একটী ফল। মোহিতকে ইংরাজীতে বলিল, এর কিছু নেবেন?

মোহিতের অনিচ্ছা ছিল না; কিন্তু মাসীমার সামনে সংকোচ বোধ করিয়া বলিল, 'না, না, এই যথেষ্ট'। মেয়েটী আর কিছু বলিল না।

কথাবার্ত্তা? হাঁ, সামান্য দুই একটা হইয়াছিল। মেয়েটী বড় স্বল্পভাষিণী। কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে তাহার সরল চক্ষু দুটী তুলিয়া ধরে। সে কলিকাতায় কি করে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, যেন কি শেখে—মোহিত ভাল বুঝিতে পারিল না, আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাও করিল না।

কোথায় যাবেন? দারজিলিং?

মেয়েটী বলিল, না, কারসিয়ং।

কত দিনে ফিরবেন?

মেয়েটী উত্তর দিল, এক মাস পর।

এমনি ধারা দুই একটী কথা।

মোহিত ঠিক পাশের ইন্টারে উঠিল। মাঝে একটী ছোট জানালা আছে—মেয়েদের অভিভাবক আবশ্যক মত মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। সেটা খুলিয়া মোহিত মাসীমাকে দুই একটী কথা বলিতেছিল; সেই সময় মেয়েটী মোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এলাচ লইবে কি না? মোহিত হাত পাতিয়া এলাচ গ্রহণ করিল।

কত শত নরনারী-কোলে, আঁধারের বুক চিরিয়া ইংরেজের এই দর্পিত মেল ছুটিয়াছে—এ ছোটার যেন বিরাম নাই। আর একবার মোহিতকে ছোট জানালাটা খুলিতে হইল 'মাসীমা, আমার বালিসটী দাও তো, একটু ঘুমুব'।—মাসীমা অসুস্থ, অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, উত্তর দিলেন না। মেয়েটী চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। সে দ্রুত উঠিয়া ইংরেজীতে বলিল, আপনার মাসীমা ঘুমিয়েচেন—আমার এই বালিশটে নিন। মোহিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, দরকার কি? মেয়েটী এবার জোর করিয়া বলিল, নিন না—তার পর জানালা দিয়া বালিশটা বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিল। ছোট-খাট, শুভ্র, তক্‌তকে চৌকা বালিশ! সে মাথা রাখিয়া শুইল—আঃ, কি নরম! মেয়েটীর দেওয়া এলাচ চিবাইতে চিবাইতে, মেয়েটীর দেওয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * গোলযোগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মোহিত দেখিল, গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জানালা দিয়া ষ্টেশন দেখিয়া বুঝিল, এখানে তাহাদিগকে নামিতে হইবে। সে মাসীমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিতা মাসীমাকে জাগাইল। দেখিল, মেয়েটী হাতে মাথা রাখিয়া, কি সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পরনে আর তার সাড়ী

নাই। রাত্রিতে ঘুমাইয়াছে—ঘাগরা বা ঐ ধরণের কি পরিয়া। পূর্ব্বে ব্লাউস ছিল, এখন তাহাও নাই—শুধু একটা কি ধরণের জামা, যাহাতে দেহের অধিকাংশ স্থলই অনাবৃত রহিয়াছে। মাসীমা উঠিলেন; সেও জাগিয়া উঠিল, এবং লজ্জিত ভাবে কাপড় চোপড় সামলাইতে লাগিল। মোহিত বিদায় লইয়া বলিল, ভয় পাবেন না—এই গাড়ীই আপনাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে। তার পর পাহাড়ের ছোট গাড়ী।

সে তাহার পাহাড়ী চোখ তুলিয়া বলিল, এর মাঝে আর চেঞ্জ্ কর্ত্তে হবে না?

মোহিত বলিল, না।

মেয়েটী মোহিতের মাসীমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো মাথায় লইল। ইহাতে মোহিত আশ্চর্য্য হইল। বাঙালী মেয়েদের মত প্রণাম শিখিল কোথা হইতে? মোহিতকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল। বাংলার মেয়েদের ত্রুটীহীন সহজ স্বাভাবিক নমস্কার! মোহিত প্রতি-নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল। শুধু তাই নয়—তাহার বালিশটীও তাহাকে ফেরত দিবার কথা মোহিতের মনে হইল না।

(খ)

বাড়ী পৌঁছিয়া মাসীমা বলিলেন, তুই ইংরেজীতে কথা বলছিলি কেন বল তো?

মোহিত বলিল, কিসে বলবো? ও কি বাংলা বোঝে? পাহাড়ী মেয়ে যে!

মাসীমা বলিলেন, বাংলা শুধু বোঝে না—বাংলা চমৎকার বলতেও পারে।

মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জানলে বল তো?

'বাঃ, আমার সঙ্গে সব কথাই বাংলায় কইলে যে'!

মোহিত বলিল, কি কথা হোলো শুনি?

'তুই আমার কি হোস, কি করিস, কত দূর পড়েচিস—এই সব। আমায় পথে খেতে না দেখে বল্লে, আপনি কিছু খাবেন না? আমি বল্লুম, আমাদের বিধবাদের গাড়ীতে কিছু খেতে নেই। সে বল্লে 'ও, তাও তো বটে!' এই বলিয়া মাসীমা হাসিয়া উঠিলেন।

মোহিত তাহাদের বাড়ীতে ৺পূজা উপলক্ষে মাসীমাকে লইয়া আসিয়াছে। ৺ অষ্টমীর দিন সন্ধি-পূজারম্ভের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে ঠাকুর দালানে বসিয়া ছিল। হঠাৎ একটী আট-নয় বছরের ফুটফুটে মেয়ে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। 'নাঃ, এর চাইতেও তার রং ফরসা' সে মনে মনে বলিতে লাগিল, গিরিরাজ-কন্যা উমা কি তার মতনই ছিলেন,—যাঁর জন্য শিবকেও তপস্যা করিতে হইয়াছিল?

মানুষের চিন্তার ধারা কোনও বাঁধা রাজপথ মানিয়া চলে না—সে সর্ব্বত্র গামিনী। পর্ণ-কুটীরে যার দেহ, মন রহিয়াছে কোন সুদূর মেঘান্তরালে, স্বপ্নলোকে, তাহার সন্ধান মেলে না। মোহিত ভাবিতেছিল, মেয়েটী এখন কি করিতেছে? রাশি রাশি ফুল তুলিয়া সে কি মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, না, ঝরণার গান শুনিতেছে,—না, বুনো মেয়ে বনে মিশিয়ে গিয়াছে? পাহাড়ী গান গাহিতেছে, বুনো ছড়া কাটিতেছে—মানুষ যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে সে কি আজ বিচ্ছিন্ন?

দিন পঁচিশেক পরে একখানা পত্র মাসীমার কাছে আসিল—অপ্রত্যাশিত ভাবে, কারসিয়ং হইতে। পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, মেয়েটীর নাম 'যমুনা ঘোষ'। পাহাড়ী মেয়ের নাম হইবে নাইনি, লাইকা, কাঞ্চি বা ঐ রকমের কিছু। এ নাম সে পাইল কোথায়? মেয়েটী মোহিতের মাসীমার ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিল। পত্রে জানাইয়াছে যে, সে নিরাপদে পৌঁছিয়াছিল। আগামী সপ্তাহে সে কলিকাতায় রওনা হইতে চায়। মোহিতের মাসীমাও যদি সে দিন রওনা হন, তাহা হইলে পথে দেখা হইলে তার বড় সুবিধা হইবে, সে খুব আনন্দিত হইবে। মোহিত বার বার পত্রখানি পড়িয়া বলিল. বাঃ! চমৎকার বাংলা লেখা তো! আমার চাইতে ঢের ভাল।

মাসীমা মোহিতকে দিয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন—তাহাদের সামনের সপ্তাহে রওনা হওয়া হইবে না—তাঁহার পরের সপ্তাহে যাওয়া সম্ভব।

উত্তর আসিল, বেশ, আমি সাতদিন অপেক্ষা করিয়াই যাইব।

মোহিত লক্ষ্য করিল, এই দুই পত্রের কোনওটীতেই তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

যে দিন রওনা হইবার কথা, সেই অনুসারে যমুনাও

শঙ্কর ও চণ্ডাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

COLOURED ILLUSTRATION

রওনা হইবে স্থির ছিল। সে দিন বিকালের দিকে মাসীমার শরীর বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আজ আর পার্চ্ছি না। সুতরাং যাওয়া হইল না।

রাত্রি দুইটার সময় যমুনার সহিত দেখা হইবার কথা। সেই রাত্রি মোহিত একখানা ইংরেজী নাটক পড়িয়া একপ্রকার জাগিয়াই কাটাইয়া দিল। যখন ঘড়িতে দুইটা বাজিল, তখন সে উঠিয়া পাইচারি করিতে লাগিল। পাহাড়ী রূপসী নিশ্চয়ই আঁতিপাঁতি করিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতেছে। এতক্ষণে বুঝিল যে, তাহারা সত্যই জানে নাই। নিরাশার ব্যথায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল না কি? আহা, দূরে থাকিয়াও মোহিতের মন ব্যথায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। মেয়েটী কি বিরক্ত, কিম্বা এতটুকু ক্ষুব্ধ হইল না? মোহিত জানিত, পাহাড়ীর মনে ষড়রিপু যেমন খেলে, তেমন বুঝি আর কোথাও খেলে না; তাহারা প্রেমে বিগলিত হয়, স্নেহে এলাইয়া পড়ে, অপমানে আবার তাহাদেরই চোখ তীক্ষ্ণধার কুক্‌রীর ন্যায় জ্বলিতে থাকে। আদিম মানবের সরলতা, আদিম মানবের প্রেম—এসব যেন তাদের বুকে পাশাপাশি বাসা বাঁধিয়াছে। শয্যায় মোহিতের সযত্ন-রক্ষিত সেই সুন্দর বালিশটী রহিয়াছে। সে যাইয়া সেটী কোলের উপর তুলিয়া লইল। বালিশের চার পাশে ছোট লেসের ঝালর লাগান রহিয়াছে—এ লেস কি বাজার হইতে কেনা, না, মেয়েটীর হাতে বোনা—ইহাই সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ঘড়িতে চারটা বাজিয়া গেল। তখন সে প্রভাতের অপেক্ষায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

(গ)

আর কোনও খোঁজ খবর নাই।

কয়েক মাস পরে একদল বাঙালী সৈন্যকে হাওড়ায় বিদায় দেওয়া হয়। সে দিন মোহিত হাওড়া ষ্টেশনে এই বিদায়-দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিল। সেখানে গুটী কয়েক বাঙালী মেয়ের মধ্যে সে যমুনাকে দেখিয়া চিনিল—রাশি-রাশি যুঁই-মল্লিকার মাঝখানে যেন প্রস্ফুটিত বস্‌রাই গোলাপ। কিন্তু তাহার অগ্রসর হইয়া কথা বলিতে কেমন সংকোচ বোধ হইল। অতি অল্পক্ষণ পরেই … তাহাকে দেখিয়া ভিড় ঠেলিয়া নিকটে আসিয়া বাংলায় বলিল, 'এই যে আপনি'। বিদেশিনীর বাংলা উচ্চারণ এত মধুর!

মোহিত হাসিয়া বলিল, ভাল আছেন?

যমুনা বল্লিল, হাঁ,—আপনি?

'ওই এক রকম'—

যমুনা বলিল, কোথায় যাচ্ছেন? তা হবে না,—চলুন আমার সঙ্গে মার্কেটে—কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। তার পর আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। কি ভাবচেন, চলুন। নিকটে তাহার সঙ্গিনী দুই একটী মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে—এবং সঙ্গের বর্ষিয়সী রমণীকে সে কি বলিয়া বিদায় দিল। ইহার পর মোহিতকে লইয়া প্লাটফরমের বাহিরে আসিয়া, একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল। মোহিত তাহার সামনের আসনে বসিল। পথে যাইতে যাইতে যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মাসীমা কেমন আছেন? মোহিত সংক্ষেপে বলিল, আগেকার চাইতে ভাল।

কিছুক্ষণ আবার দুজনে চুপচাপ।

তার পর মোহিত বলিল, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন! তবে আমার সঙ্গে পথে দারজিলিং মেলে ইংরেজীতে কথা কইলেন কেন?

যমুনা হাসিয়া বলিল, সে আপনি ইংরেজীতে সুরু করেছিলেন বলে।

কিছুক্ষণ বাদে যমুনা স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় যেন আপন মনে বলিতে লাগিল, ছেলেরা যুদ্ধে যাচ্ছে কার জন্যে? যার জন্যে হোক যাচ্ছে। বাংলার মেয়েরা তাদের ফুল দিলে, অন্যান্য কত জিনিস উপহার দিলে। শুভ-কামনা, আশীর্ব্বাদ—এ সবেরও ত্রুটী হয় নি। কিন্তু মেয়েরা কেউ গেল না—সে ব্যবস্থা কেউ করে নি। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ক্রিমীয়ান যুদ্ধে যে আদর্শ রেখে গেছেন, বাঙালী মেয়েরা সেদিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

মোহিত ধীরে বলিল, একদিকে আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, বাংলার মেয়েরা সংসারটাকে বড় করে দেখেচে। তাই ঘরের গৃহিণী, সন্তানের মা, ভাইএর বোন যে ত্যাগ, যে দুঃখ বরণ করে, তা কোনও ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের চাইতে কম নয়। আমার মনে হয়, অনেক বেশী। আর যুদ্ধের কথাই যদি বল্লেন, সেদিক থেকেও

আমাদের সৈন্য হয়ে যাওয়া কতদূর উচিত, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। কোনও শান্তির কথা, সাম্যের কথা নিয়ে যাব, না যাব সৈন্য হয়ে?

যমুনা শুনিয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া, অন্যমনে ভাবিতে লাগিল। তার পর বলিল, বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।

মার্কেটে জিনিস পত্র কিনিবার পূর্ব্বেই যমুনা বলিল, চলুন, ক্ষিধে পেয়েচে, কোনও হোটেলে কিছু খাই। মোহিত বলিল, আমি তো এখানে কখনও খাইনি, এখানকার হোটেলও চিনি নে।

যমুনা উত্তর দিল, ওঃ, চেনেন না,—তা চলুন, খুঁজে নেবো 'খন।

মোহিতের কাছে ট্রামের পয়সা ছাড়া কিছু ছিল না। যমুনা হোটেলে যাইয়া খরচ করিবে—এ কি দারুণ লজ্জার কথা। সে বলিল, না, না, দরকার কি, থাক না।

যমুনা বলিল, আচ্ছা থাক।

ঘণ্টা দুই বাদে জিনিসপত্র কিনিয়া ফিরিবার সময় যমুনা গাড়ীতে বলিল, আচ্ছা, খেলে জাত যেতো? সেই জন্যে খেতে চাইলেন না, কেমন? যেমন সেবার ট্রেণে আমার দেওয়া লুচি খাবারগুলো নেন নি?

মোহিত এ কথায় লজ্জা পাইয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়।

যমুনা বলিল, তবে? ও বুঝেচি, আমার খরচ হবে, এই জন্যে না?

মোহিত হাসিল।

যমুনা বলিল, আপনি বেশ মানুষ যা হোক! যাবার সময় দারজিলিং মেলে কুলীকে ক' আনা পয়সা দিয়েছিলুম, তাও খাবার কিনে মাসীমার হাত দিয়ে ফেরত দিলেন। এমনি করেই কোনও উপায়ে না হয় এটাও শোধ দিতেন।

মোহিত হাসিমুখে বলিল, আমি খেতে ভালোবাসিনে।

তবে কি ভালোবাসেন?

মোহিত আরক্ত মুখে বলিয়া ফেলিল, ভালোবাসি অনেক জিনিস। ধরুন, ভাল বই ভালোবাসি, সুন্দর মুখের মিষ্টি কথা ভালোবাসি।

মেয়েটীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু সে যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিল, বাবা, দুটো জিনিস—সুন্দর মুখ হওয়া চাই, আবার সেই মুখের কথা মিষ্টি হওয়া চাই! আপনি তো খুব লোভী!

মোহিত কথাটী বলিয়া ফেলিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।

যমুনা মোহিতের কথা চাপা দিবার চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, একটা কেন, যতটা ইচ্ছে করুন। মোহিত বলিল, না, একটাই আপাততঃ যথেষ্ট। যমুনা মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা, শুনি। মোহিত বলিল, আপনি কারসিয়ং থাকেন শুনেচি—সেখানেই বাড়ীঘর; কিন্তু আপনার নাম যমুনা হোল কেমন করে, আর আপনি ঘোষই বা হোলেন কি উপায়ে? মোহিত দেখিল, এই প্রশ্নে যমুনার মুখের দীপ্তি যেন এক নিমেষে নিভিয়া গিয়াছে, এবং সেখানে ব্যথার সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোহিত বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটী ঠিক হয় নাই। কিন্তু এখন কি বলিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, কতকটা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। ভাগ্যক্রমে গাড়ী তখন যমুনার মেয়ে-হোষ্টেলের সামনে আসিয়াছে—তাই মোহিত সহজেই নিষ্কৃতি পাইল। যমুনা সেও নিজেকে একটুকু সামলাইয়া লইয়া, স্বাভাবিক স্বরে বলিল, আপনাকে বলবো এ নাম কেন হোল—তবে আজ নয় আর এক দিন।

(ঘ)

যমুনার অনুরোধ সত্ত্বেও মোহিত আর দেখা করিতে যায় নাই। সেদিন কথায় সে যে অসংযম প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে যমুনা কি কিছু মনে করে নাই?

এক এক করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। শীতের কণকণে ভাবটা আর নাই। এমনি এক অপরাহ্ণে মোহিত তাহার ঘরে বসিয়া গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টাইতেছিল। ভীষণ অরহত্যার বই, ছাগলাদ্য ঘৃত—এ সবের বিজ্ঞাপনে আর মন বসাইতে পারিতেছিল না। ইহার পর সে খানকয়েক পত্রের উত্তর দিবার জন্য চিঠির কাগজ লইয়া বসিয়াছে মাত্র, এমন সময় জুতোর শব্দে ফিরিয়া দেখিল, বাড়ীর ঝির সঙ্গে যমুনা তার কক্ষে প্রবেশ করিল।

যমুনা নমস্কার করিল না। এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই

সম্মুখস্থ চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিল। মোহিত দেখিল, যমুনা যেন কৃশ হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি কিছু অস্বাভাবিকরূপ তীব্র। যমুনাই প্রথমে কথা কহিল। সে বলিল, আপনি তো আর গেলেন না, তাই আমিই এলুম। একটুকু থামিয়া বলিল, সেদিন ঠিকানা বলেছিলেন, তাই আসা সম্ভব হোল; নইলে তো আর দেখাই হোত না। যাক, আমার সময় খুব অল্প—আমি কাল মীরাট যাচ্ছি।

মোহিত উদ্বেগের সহিত বলিল, কেন? মীরাট কেন? যমুনা চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, কেন? চাকরী পেয়েচি বাবু। বিদেশীয়েরা যেমন বাঙালীকে 'বাবু' বলে, সে মোহিতকে কথার সঙ্গে মাঝে মাঝে 'বাবু' বলিত।

মোহিত ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাকরী?

অপর পক্ষ ততোধিক ম্লান মুখে উত্তর দিল, মেয়ে পড়ান, বাবু। এক দিল্লীওলা জহুরীর মীরাটে কারবার আছে। তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এই দিন সাতেক আগে আমি দরখাস্ত করেছিলুম। আজ টেলীগ্রাম এসেচে আমার যাবার জন্যে।

মোহিত ধীরে বলিল, তবে অতদূরে কেন যাচ্ছ, তাই আমি ভাবচি।

যমুনা বলিল, কলকাতাও তো আমার নিজের জন্মভূমি নয়। বাড়ী ছেড়ে যখন এসেচি, তখন আমার পক্ষে কলকাতাও যা, মীরাটও তাই নয় কি? মুখে একটুকু হাসির ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আচ্ছা, মাইনে কত পাব, তা তো কই একটীবারও জিজ্ঞাসা কর্লে না? এই সে প্রথম মোহিতকে 'তুমি' বলিল।

মোহিত বলিল, মাইনেই তো সব নয়। অত দূরে যখন যাচ্ছ, তখন মাইনের জন্যই যে যাচ্ছ, এ না-ও হতে পারে।

যমুনা বলিল, বেশ, সে না হয় না-ই জিজ্ঞাসা কর্লে। কিন্তু তোমার সেদিনকার কথার জবাব শুনে নাও—আর হয় ত সময় হবে না। নইলে, তোমার শুধুই মনে হবে, পাহাড়ী মেয়ের যমুনা নাম, তাতে আবার ঘোষ—নিশ্চয়ই জন্মের ঠিক নেই—কেমন এই না?

মোহিত সে কথায় আঘাত পাইয়া বলিল, না বল্লেও ক্ষতি ছিল না।

যমুনা উত্তর দিল, ক্ষতি তোমার কিছুমাত্র নয়,—ক্ষতি আমার।

* * * *

ঘরের আলো মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল।

যমুনা বলিতে আরম্ভ করিল—

বাবার নাম প্রমোদকুমার ঘোষ। সাধারণত ইনি পি, কে, ঘোষ বলেই পরিচিত ছিলেন। নতুন ডেপুটী, ছুটীতে এসেচেন পাহাড়ে বেড়াতে। দাদামশাই তখন কারসিয়ংএ থাকতেন না—'ঘুম'এ থাকতেন। সেইখানে সেই নতুন ডেপুটী তাঁবু ফেলেছিলেন শিকারের লোভে—তাঁর শিকারের বড় বাই ছিল। শিকার সম্বন্ধে তিনি একখানা ইংরেজী বইও লিখে গেছেন; কিন্তু পয়সার অভাবে আমরা ছাপাতে পারিনি। দাদামশাইএর ছিল চালানী ব্যবসা। তিনি পাহাড়ী জিনিস সব—নানারকম পলা, মৃগনাভি, চামর, গরম কাপড়—এক কথায় যাকে Tebetan curios বলে, তা কলকাতায়, বোম্বেতে চালান দিতেন। আবার কলকাতা থেকে অনেক জিনিস আনিয়ে পাহাড়ের ওপরে পাঠাতেন—মায়, কালিমপং, সিকিম পর্য্যন্ত। বহু লোকজন নিয়ে তিনি থাকতেন। তখন আমার মায়ের বয়স অল্প—আঠার-উনিশ হবে। মা অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন। মুখ চোখ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মত গায়ের রং বড় দেখতে পাওয়া যায় না। যমুনা নিজের সুগৌর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আমার চাইতে অনেক ফরসা,—ঢের ঢের। মায়ের রং খুঁজতে হলে, ইরাণ কিংবা বসোরায় যেতে হবে। মাকে দেখে অনেক সাহেব বিয়ে কর্ত্তে চাইতেন; কিন্তু দাদামশাই তাতে রাজি হননি। জানেন তো, তারা আসলে বিয়ে করে না—দু'দশ বছর এদেশে থাকে—তার পর লেনা দেনা চুকিয়ে নিজের দেশে সরে পড়ে। আদত কথা এই যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তা বিয়ে হলেও এদের সঙ্গে হয় না। কিন্তু এই তরুণ ডেপুটীকে দেখে দাদামশাইএর খুব ভাল লাগল। সুশ্রী চেহারা, ভদ্র ব্যবহার, সুন্দর প্রাণ। এঁর সঙ্গেই মা'র বিয়ে হয়।

যমুনা এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিল—যেন আর বলিবে না। আট দশ মিনিট এইভাবে কাটিয়া গেলে, সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আবার বলিতে সুরু করিল, তার পর

আমার বড় দু'ভাই, তার পর আমি জন্মি। বাবা যখন নাটোরে সবডিভিসন্যাল অফিসার, তখন নিমুনিয়ায় হঠাৎ মারা যান। তাঁর নামে সেখানে একটা পাবলিক লাইব্রেরিও রয়েচে। মৃত্যুর বছর দুই আগে তিনি কারসিয়ংএর বাড়ীখানি কেনেন। সেইখানেই আমাদের বর্ত্তমান বাড়ী।

আহা, মা আজ বছর ছয়েক মারা গেছেন। মা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাবার কত কথাই বলতেন। তিনি স্বামীর ভালোবাসার উল্লেখ করে বলতেন, বিশিষ্ট ভদ্রঘরের বাঙালী যেমন ভালোবাসতে পারে, পৃথিবীর অন্য জাত বোধ হয় তার অর্দ্ধেকও পারে না। আচ্ছা, বল তো, এ সত্যি কি? তবে কেন খবরের কাগজে দেখতে পাই, স্বামী স্ত্রীর ওপর জঘন্য অত্যাচার করেচে? এ সব কি মিথ্যে? মা বলতেন, ভালোবাসা অন্য জাতের বহু মনোবৃত্তির মধ্যে একটী; কিন্তু ভালোবাসা বাঙালীর প্রাণ! বাঁচতে হলে তাকে ভালোবাসতেই হবে—আচ্ছা, সত্যি তাই কি?

মোহিত বলিল, বোধ হয়।

যমুনা সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, বোধ হয় কেন, জানো না?

মোহিত দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলিল, আমি তো তেমন করে ভেবে দেখিনি।

যমুনা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল, তাই মা আমার বিয়ের কথায় বলতেন—সে কথা আর আজ বলবো না। আমাদের নাম আমাদের ঠাকুমার দেওয়া। তিনি তখন বেঁচে ছিলেন; মাঝে মাঝে বাবার কাছে এসে থাকতেন। তিনিই আমার নাম রেখেচেন যমুনা। দাদাদের নাম হয়েচে প্রভাত আর প্রকাশ। মা অত্যন্ত সতীসাধ্বী ছিলেন। ঠাকুমার নির্দ্দেশ মত তিনি সাবিত্রীব্রত কর্ত্তেন, স্বামীর কল্যাণের জন্য সিঁদুর পরতেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে যে আলোটী স্তিমিতনেত্রে জ্বলিতেছিল, মোহিত তাহা বাড়াইয়া দেওয়ামাত্র দেখিল, যমুনার চোখ-মুখ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। সে কৌতূহলবশত যমুনার নাম সম্বন্ধে একটী অন্যায় প্রশ্ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে এতদূর গড়াইবে, তাহা সে ভাবে নাই। যমুনার অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া তাহার মন দুঃখে ভরিয়া গেল; এবং সে নিজের উদ্গত অশ্রু দমন করিতে লাগিল। পাছে কথা বলিলে ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। যমুনা তাহার অশ্রুজল মুছিবার বা গোপন করিবার চেষ্টা করিল না, ইহাতে লজ্জিতও হইল না। সে কিছুক্ষণ বাদে বলিল, মাসীমা কোথায়?

মোহিত বলিল, কালীঘাটে গেছেন আরতি দেখতে। ও! তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোল না। তাঁকে আমার কথা বলো। তাঁকে প্রণাম কর্লুম—বলিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল। কাল হাওড়ায় ট্রেনের সময় যাবে তো? বলিয়া মোহিতের হাত ধরিয়া মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এ কি চায়? কিসের ব্যথা, যা সে বহিতে পারিতেছে না, যার জন্যে সে চলিয়াছে দূর-দূরান্তরে! এ দৃষ্টি তো মূক নয়—এ যে অজ্ঞাত ভাষায় কথা কয়! পাহাড়ী বেশী কথা বলে না; কিন্তু দৃষ্টি তাহাদের অনেকখানি প্রকাশ করে।

পরদিন মোহিতের হাওড়ায় যাইতে একটুকু দেরী হইয়াছিল। যাইয়া দেখিল, যমুনা একখানা মেয়ে-কামরার জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিয়াছে। সে চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। মোহিতকে দেখিয়া যমুনা প্লাটফরমে নামিয়া পড়িল, তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব এসেচ। গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট আষ্টেক দেরী; আমার তো মনে হোল, আর এলেই না।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় যমুনার অশ্রুজল দেখিয়া অবধি মোহিতের চিত্ত নিয়ত পীড়া অনুভব করিতেছিল। প্লাটফরম, সেই কোলাহল ও ব্যস্ততা—সামনে দণ্ডায়মান ট্রেন—এই সব দেখিয়া মনে পড়িল, বছর খানেক আগে দারজিলিং মেলে তাহার সহিত প্রথম দেখা। সেই নীল পাথরের দুল তাহার কাণে চিক চিক করিতেছে; সেই রক্তবর্ণ পাহাড়ী গলার হার তার সুগৌর কণ্ঠে দুলিতেছে। পরনে একখানি সবুজ সাড়ী।

যমুনা বলিল, কি গো, চুপ করে রইলে যে?

মোহিত পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এতদূরে কেন তুমি যাচ্ছ?

গাড়ীর শেষ বেল পড়িল। যমুনা গাড়ীতে উঠিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিল, দেখ, এই আংটীটী এ আঙুলে

ঢলঢলে, এটা তুমি রেখে দাও। না, না, তাতে আপত্তি কি? ফিরে এসে নেবে এখন। না হয় ডাকে পাঠিয়ে দিও আমি লিখলে! এখন তো আর বাক্স খোলবার সময় নেই—সে সব ব্রেকে রয়েচে। মায়ের দেওয়া আংটীটী হারিয়ে ফেলবো শেষকালে! নাও গো, নাও। মোহিত হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

গাড়ী ছাড়িল। বন্য সরলতা-মাখান চোখ দুটী নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল—একবার—দুইবার। তার মুখ আর দেখা যায় না,—হাতের কনুইটা দেখা গেল—তার পর আর না। দ্রুত অদৃশ্যমান ট্রেনের দিকে মোহিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—ট্রেন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। তখন হাতের দিকে চাহিয়া দেখিল, আংটী রহিয়াছে—মাঝখানে নীলা পাথরটী যেন যমুনার চোখের মতই জ্বলিতেছে—এক পাশে কেবল ইংরেজী পি লেখা। বোধ হয় যমুনার পিতার নামের প্রথম অক্ষর।

(৬)

মীরাটে পৌছিয়া প্রথম পত্রে যমুনা জানাইল যে নূতন জায়গা তাহার লাগিতেছে এক রকম। যে মেয়েটীকে পড়াইতে হয়, তার ভয়ানক আবদার—এই সব।

মোহিত উত্তর দিল। তার পর যমুনার পত্র সে মাস খানেক পায় নাই। মোহিত ভাবিত, পাহাড়ীর মন তো আষাঢ়ের মেঘ।

প্রায় দেড়মাস পরে দ্বিতীয় পত্রে যমুনা জানাইল যে, গৃহস্বামীর মেয়েদের সহিত সে আগ্রা বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে আর তার চাকরী করা পোষাইবে না। গৃহস্বামীর একটী যুবক পুত্র,—তাহার প্রবাসে যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিকালে সে রাশি রাশি ফুল পাঠাইয়া দেয়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাহার কাছে আসা সুরু করিয়াছে। এর মধ্যে গভীর রাত্রিতে এক দিন তাহার দরজায় ঘা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তাহার কোনও অসুবিধা হইতেছে কি না। সে পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছে, আমরা পাহাড়ী বলেই কি আমাদের সবাই ভোগের বস্তু মনে করে? দারজিলিংএ সাহেব যায়—তার যে ক্ষুধিত দৃষ্টি! মীরাটে এলুম, এখানেও দীল্লিওলা জহুরীর ছেলের চোখে সেই চাহনি। আচ্ছা, বল তো আমরাও তো মানুষ! আমাদেরও তো মন বলে একটা জিনিস আছে, যা অপমানে ক্ষুব্ধ হয়, দুঃখে অভিভূত হয়! আমরা এতে স্বস্তি পাব কেমন করে?

মোহিত এ পত্র লইয়া ঘণ্টা দুই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, এ নারীর মন জাগ্রত—ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না। সে ঠিক করিল যে, সে আজই মীরাট যাইবে। মাসীমাকে বলিল। চাকরকে সব ঠিক করিতে আদেশ দিল। যাইবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাহার মনে হইল, কেন যাব? আমায় সে তো ডাকেনি, না—যাব না,—সে গেল না। কিন্তু দেহ-মন যেন দুঃখে-কষ্টে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। রাত্রিতে ঘুমের মধ্যেও সে এ বেদনার হাত এড়াইতে পারিতেছিল না।

এক উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে যমুনা ফিরিয়া আসিল। অসুস্থ জরাক্রান্ত দেহে সে সোজাসুজি মোহিতের বাসায় উঠিল। মোহিত তাহাকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল—সে অনেক কৃশ, অনেক দুর্ব্বল হইয়াছে। মোহিতের মনে একটুকু শ্রদ্ধার ভাব উদয় হইল। মনে হইল, যেন তপক্লিষ্টা পার্ব্বতী তাহার সম্মুখে।

যমুনা বলিল 'চলে এলুম'। তার পর একটুকু থামিয়া বলিল, আমাদের হোষ্টেলে আর গেলুম না। ছেড়ে যখন এসেচি,—আর যাব কি কর্ত্তে?

এইটুকু বলিতেই যেন তাহার কষ্ট হইতেছিল। সে তবুও বলিল, কালপরশু কারসিয়ং চলে যাব—দাদা তাই লিখেচেন। তার পর চক্ষু নত করিয়া বলিল, যে দুই একটা দিন এখানে থাকি, তুমি আশ্রয় দাও তো ভাল হয়—আমি আশ্রয় ভিক্ষা চাইছি। তোমাদের কিছুই ছোঁব না,—নীচের ঐ ঘরখানায় থাকবো—তাতে কি কোনও দোষ হবে?

মোহিত কি উত্তর দিবে? নীড়হারা ছোট পাখীটীর মত আজ সে যে আশ্রয়হীনা। মোহিতের ভিতর আলোড়িত হইয়া বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যমুনা বলিল, তুমি কথা কচ্ছ না যে? তোমার তাহলে মত নেই? উঃ! আমার জ্বরটাও আজ বড় চেপে এসেচে—আজ যে কিছুতেই আর নড়তে পার্ব্ব না। কালই না হয় চলে যাব। কিন্তু আজ কোথায় যাই? তাহার উত্তপ্ত রাঙা মুখে ভয়-ব্যাকুল উদ্বেগ ও অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মোহিত একটুকু সামলাইয়া লইয়া তীব্রভাবে বলিল, কেন তুমি এসব বকে যাচ্ছ? পাহাড়ী মেয়ের কালো চোখে বিস্ময় দেখা দিল। মোহিত হাত বাড়াইয়া বলিল, 'এসো'। যমুনা মোহিতের এক হাত ধরিল বটে, কিন্তু দুর্ব্বল অসুস্থ দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে পুনরায় বসিয়া পড়িল। আর যে এক পা অগ্রসর হইবে এ সাধ্য তাহার ছিল না। মোহিত ভৃত্যকে জিনিসপত্র আনিতে আদেশ দিয়া, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না—যমুনার শিথিল তনু সে কোলে তুলিয়া লইল,—মা যেমন করিয়া রুগ্ন শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লয়। যমুনা চোখ বুজিয়া তাহার ক্রোড়ে আত্ম-সমর্পণ করিল; এবং দুই হাতে মোহিতের গলা আঁকড়াইয়া ধরিল। মোহিত দ্রুত এবং ত্রস্ত পদে তাহাকে দ্বিতলে আনিয়া শয়নকক্ষে তাহারই বিছানায় শোওয়াইয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিয়া, ওষুধ খাওয়াইয়া, দুধ খাওয়াইয়া তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া দিল।

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমাকে দেখচি না যে? মোহিত বলিল, তিনি বেনারস গেছেন। যমুনা শুধু বলিল, তাঁকে অনেক দিন দেখিনি।

সন্ধ্যার পর মোহিত ভাবিতেছিল যে, সে কোথায় থাকিবে? বাড়ীতে একটীমাত্র উড়ে চাকর। এক ঠিকা বামুন আসিয়া দুইবেলা কোনও রকমে কিছু নামাইয়া দিয়া যায়। যে বেলা বামুন আসে না, সে বেলা সে বাজার হইতে খাবার কিনিয়া কোনও প্রকারে কাটাইয়া দেয়। এখন তাহার অনভ্যস্ত হাতে ষ্টোভ জ্বালিয়া বার্লি, দুধ এ সব জ্বাল দিতে হইল। কতক পড়িল, কতক কি রকম হইয়া গেল। রাত্রিতে অসুস্থ যমুনাকে ফেলিয়া সে অন্য কক্ষে কেমন করিয়া থাকিবে? জাগিলেই যে সে জল খাইতে চাহিবে! অথচ তাহার ঘরে রাত্রি কাটাইতেও কেমন দ্বিধার ভাব জাগিতেছিল। কিন্তু অন্য উপায়ও ছিল না।

রাত্রি গোটা দশেক হইবে। ঘরের টাইমপিস ঘড়িটী আপনমনে টিক টিক করিয়া চলিয়াছে। মোহিত যমুনার শয্যাপার্শ্বে একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। ঘণ্টা তিনেক পরে যমুনা জাগিয়া বলিল, ও, অনেক রাত হয়েচে বুঝি! তুমি খেতে যাও নি? আহা, যাও খেয়ে এসো। মিনিট কয়েক পরে মোহিত খাইয়া আসিলে, যমুনা বলিল, তুমি রাত্তিরে কি এখানে থাকবে না? তাহার চোখে শঙ্কা ও ভয় দেখা দিল। ইহাতেই মোহিতের দ্বিধার ভাব কাটিয়া গেল। সে আশ্বাস দিয়া বলিল, থাকবো বই কি! তোমার কোনও ভয় নেই।

যমুনা রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে হাসি আনিয়া বলিল, তোমার বদনামের ভয় নেই তো?

মোহিত বলিল, সে ভয় তো দুজনারই আছে। তুমি মেয়ে—তোমার তো অপরাধের সীমাই থাকবে না। যমুনা যেন সম্মুখে তাহার সঙ্গ-জাগ্রত দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, সে ভয় আমার নেই। আর যার থাকে থাক, আমার নেই—আমার মন বলে নেই।

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ভোরের দিকে মোহিত ইজি চেয়ারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়া দেখিল, যমুনা তাহার আগেই জাগিয়াছে। সে লজ্জিত হইয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভোরের দিকে আমার শীত শীত বোধ হচ্ছিল। তোমার এ লাল শালখানা তো আমার গায়ে ছিল না, এ আমার গায়ে কে দিলে?

যমুনা হাসিয়া বলিল, ভূতে দিয়েচে।

আজ মোহিত অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কাল যে মোহিত তাহাকে কোলে করিয়া বক্ষে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছে, সে মোহিত যেন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। যমুনা কি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিল, মোহিত তাহার উত্তরই দিল না।

উড়ে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, মিস্ত্রী আসিয়াছে, বাড়ীর কোন জায়গায় কি মেরামত করিতে হইবে। সে চাকরকে বলিয়া দিল, বল গে, আজ নয়, আর এক দিন। কিছুক্ষণ বাদে চাকর আসিয়া বলিল, সতীশ বাবু বসে আছেন। সতীশ মোহিতের বন্ধু। তাহার সহিত এক যোগে একটা বড় প্রেস ও পাবলিশিং হাউস খুলিবার কথা হইতেছিল। সেই বিষয়ের পরামর্শের জন্য মোহিতের নির্দ্দেশ মতই সে আসিয়াছিল। মোহিত চাকরকে বলিল, বলে দে, দিন সাতেক পরে যেন আসেন। আজ সে কোনও কাজেই নিজের মন বসাইতে পারিতেছিল না। সতীশ জানিত, মোহিতের মাসীমা কাশী গিয়াছেন—বাড়ীতে আর কেহ নাই। মোহিত নিজে না আসিয়া চাকরকে দিয়া এরূপ উত্তর কেন পাঠাইল, বলিল না।

চাকরকে বলিল, চল তো দেখি, তোর বাবু কি কচ্ছে। চাকর বাধা দিল না। সতীশ যখন দ্বিতলে মোহিতের দরজার সামনে উপস্থিত হইল, তখন মোহিত যমুনার মাথায় জলের পটি বাঁধিতেছিল। তাহার দৃষ্টি সতীশের উপর পড়িবামাত্র, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, আমি আজ একটু ব্যস্ত আছি। তুমি আর এক দিন এসো ভাই, সেদিন সব কথা হবে। মোহিত সতীশকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সতীশ 'বেশ' বলিয়া অগ্রসর হইল। তার পর ফিরিয়া, যেন নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে বলিল, হাঁ হে, ঘরে মেয়েটী কে?

মোহিতের চোখ মুখ রাঙা হইয়া গেল, তাহা সতীশের নজর এড়াইল না। মোহিত বলিল, আমার আত্মীয়।

সতীশ বলিল 'ওঃ' অর্থাৎ 'বিশ্বাস করিলাম না'। সতীশের দুই চক্ষু কৌতুকে নাচিতেছিল। মোহিত ইহা লক্ষিত পাইল এবং ইহাতে তাহার মুখে আবার এক ঝলক রক্ত আসিয়া রাঙা করিয়া তুলিল। সে বলিল, আর কেউ নয়—আমার স্ত্রী।

সতীশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, স্ত্রী, বাঃ, সেদিকে তো নমস্কার করা হোল না! তা বিয়েটা হোল কবে, জানতে তো কিছু পারিনি।

এইবার মোহিত মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, হয় নাই, হবে। মোহিতের স্বরের অকৃত্রিম দৃঢ়তা অনুভব করিয়া সতীশও চমকাইয়া গেল। সিঁড়ির এক ধাপ উপরে দাঁড়াইয়া মোহিত আবার বলিল, হয় নাই হবে। তাহার চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল। সতীশ সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। সে নত চোখে চলিতে চলিতে নরম সুরে বলিল, তবে আর কি!

সেদিন যমুনার এক ভাবেই কাটিল। ওষুধ, দুধ, বিলাতী ফুড খাইয়া তাহার দুপুর বিকালে গড়াইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিনই মোহিত খুব অন্যমনস্ক ও চুপ-চাপ। সকাল বেলায় সতীশকে লইয়া যে বিশ্রী ব্যাপারটী হইয়া গেল, তাহা মোহিতের মনকে কেমন অস্বস্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সেটা লোকের চোখে এতক্ষণ কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কল্পনা করিয়া তাহার চিত্তের তিক্ততা বাড়িয়া গেল। মোহিতের গাম্ভীর্য্যে যমুনা মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, জোর করিয়া এর বাড়ীতে ওঠা ঠিক হয় নাই। তার পর সকাল বেলায় সতীশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও সে ভুলিতে পারে নাই। যেমন করিয়া হোক, আগামী কাল সে চলিয়া যাইবে। মরিতে হয়, ট্রেণে মরিবে; কিন্তু অপরকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারিবে না।

রাত্রিতে তাহার জ্বর আবার বাড়িল। এগারটার পর হইতে সে একরকম বেহুঁস হইয়া রহিল। মাঝে মাঝে কেবল জল চাহিত মাত্র। সে রাত্রিও মোহিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়া রাত কাটাইয়া দিতে হইল।

পরদিন বেলা নয়টার পর হইতে জ্বর কমিয়া গেল। সে মোহিতকে বলিল যে, আজই সে দারজিলিং মেলে যাইবে। মোহিত কোনও কথা বলিল না। যমুনা বুঝিল, মোহিতের কোনও আপত্তি নাই। আপত্তিই বা থাকিবে কেন? সে ত আর সাধ করিয়া তাহাকে রাখে নাই,—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আশ্রয় দিয়াছে। তবে তাহাকে বিদায় করিতে না চাহিবে কেন? এ ব্যাপারে দুঃখ করিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ নাই; তবুও যমুনার বুকের ভিতরটা ব্যথায় যেন দুলিয়া উঠিল।

ঘরের টাইমপিসে চারটা বাজিল। যমুনা চাকরকে ডাকিয়া শিয়ালদহ যাইবার জন্য একখানা গাড়ী আনিতে বলিল। ইহাতে চাকরটীও বিস্মিত হইল। যে মাত্র এক দিন পূর্ব্বে অসুস্থতার জন্য গাড়ী হইতে নামিতে পারিতেছিল না, সে এই অসুস্থ দুর্ব্বল দেহ কেমন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে? মোহিত শুনিল, কিন্তু কিছুই বলিল না। যমুনার জরাক্রান্ত দুর্ব্বল শরীরে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সে তো চলিয়াই যাইতেছে। তবুও বিদায়-কালে মনে রাখিবার মত এতটুকু সদয় ব্যবহার কি সে পাইবে না? সে তাহার গোপন অশ্রু নীরবে বারবার মুছিয়া ফেলিল।

মোহিত এই সময় জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তবে কি যমুনার যাইবার সময়েও সে উপস্থিত থাকিতে চায় না? ইহাই যমুনার মনে হইতে লাগিল। যমুনা মুখ ফুটিয়া বলিল, আমি যাব যে। মোহিত না ফিরিয়াই বলিল, আমি ফিরে আসি আগে। এ কি কথা?

মোহিতের ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়া। যমুনা চাকরকে দিয়া তাহার জিনিসপত্র

সব গাড়ীতে চাপাইয়া দিয়াছে ; এবং ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শয্যায় শুইয়া আছে। মোহিত আসিলেই রওনা হইবে।

কিছুক্ষণ বাদে মোহিত ঘরে ঢুকিল। আজ বিদায়ের সময় যমুনা মোহিতকে নমস্কার করিল না, পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। বলিল, যাচ্ছি, আর আমি কলকাতায় আসবো না—কখনও না। খেতে না পাই, ষ্টেশনে কুলী হবো—দারজিলিংএর পথে নেবু বেচবো—পাহাড়ী মেয়ে হয়েই বাকী জীবনটা সেখানে কাটিয়ে দেবো। তুমি যদি কখনও সে দেশে যাও তো দেখা হবে। সে শালটী হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। মোহিত তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে তীব্রতা জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করিয়া পরক্ষণেই অগ্রসর হইয়া দুই হাতে যমুনার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, তোমাকে আর আমি কোথাও যেতে দেবো না—তোমার সে আংটীও ফেরত দেবো না—কিছুতেই না। কাল থেকে আমি কেবল ভেবেচি। আজ আমি এ নিঃসংশয়ে জেনেচি যে, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পার্ব্ব না। তাই মাসীমাকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করে দিয়ে এলুম। তিনি এলে অন্য সব উদ্যোগ হবে। তুমি তোমার দাদাদের এ সংবাদ কালই দিয়ে দাও।

মাসীমা আসিয়া কিসের উদ্যোগ করিবেন, এবং সে দাদাদের কি সংবাদ দিবে, ইহা মুখ ফুটিয়া মোহিত না বলিলেও, যমুনা নিজের হৃদয় মন দিয়া তাহা বুঝিল।

মোহিত যমুনাকে পুনরায় বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া চাকরকে গাড়ী হইতে সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া আসিতে আদেশ দিল।

যমুনার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে, যমুনা মাথা নীচু করিয়া লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, মায়ের আদেশ ছিল, আমি যেন স্বামী ছাড়া এ আংটী আর কাউকে না দি।

মোহিতের মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও যমুনার চোখ এড়াইল না। শয্যাশায়িনী রোগিনীর মুখেও ব্যথা বা অতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র নাই। উভয়েই নিশ্চিত মঙ্গলের আশায় উভয়েই উৎফুল্ল।

দুইজনে পরস্পরের হাত ধরিয়া এই নিস্তব্ধ নিঝুম সন্ধ্যা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।

অতি বৃহৎ ভারত এমনি করিয়াই তো 'বৃহত্তর' হইয়া উঠিতেছে—বিভিন্ন জাতির মিলনে, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমবায়ে, এক দেশীয় শিল্পের সহিত অপর শিল্পের বিবাহে ; পূর্ণতার সাধনায় এমনি করিয়াই তো মিশিতেছে—বাংলার শ্যামলতার সহিত পাহাড়ী ডালিয়ার রক্তিম আভা। বেল মল্লিকার সহিত এক ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে হাস্নাহানা, ক্রেসানথেমাম, আরো কত কি! বাঙালীর ঘোমটার সহিত আর্ম্মাণীর কাঁচুলি মিলিতেছে। অচল আয়তনের নিগড় ভাঙ্গিয়া শিল্প ও সাহিত্য প্রাণ-শক্তি পাইতেছে ভিন্ন সাহিত্য, ভিন্ন শিল্পের সহিত আদান প্রদানে—যেমন পাইয়াছে ভারতের ইতিহাসে যুগে যুগে কালে কালে।

সেবা ও সেবক

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

(দাদূ)

সেবক বিসরি' যাবে আপনারে,
সেবা রবে সু-সচেতন সদা ;
দাদূ কহে,—রাম, দাও না আমারে
সমুঝিয়ে সেই তত্ত্ব-কথা।
দাদূ যবে প্রেমে রাম বনে' যাবে,
হবে সে রামের সেবক তবে ;
অখণ্ড সেবা এক রস যেই—
দাদূ সেই রস-সেবক ভবে।
সেবক সেবিবে স্বামীরে যখন
সঁপিয়া আপনা স-পরিবার,
সেবকের দরবারে যে তখন
স্বামীই সেবক সাজিবে তার !
সেবা করে', যাও হে সেবক তুমি,
ডরের কথা তো কিছুই নাই ;
তুমি যাহা—যেন বন্দনা তব
অকপট তাহা হয় রে ভাই !
স্বামী সহ চাই সমানে সাধন,
সমানে সমান সেবা তোমার,
সমানে সমান মিলে' যাবে সুর—
সুখ-পথে বাধা রবে না আর।

সোম

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ

(৬ষ্ঠ)

শণ ও আয়ুর্ব্বেদীয় সোম

শণ শব্দ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদ-সংহিতাতে সংগৃহীত মন্ত্রগুলির মধ্যে শণ শব্দ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে শণ শব্দ পাওয়া যায় ; যথা—শণ কুলায় মন্তরং ভবতি। আদীপ্যাদিতি (৬।৬।১।২৪) অথর্ব্ববেদসংহিতা নামক গ্রন্থমধ্যে যে সকল মন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী মন্ত্রে শণ আছে, যথা :—

শণশ্চ মা জঙ্গিড়শ্চ বিষ্কন্ধাদভি রক্ষতাম্।
অরণ্যাদন্য আভৃতঃ কৃষ্যা অন্যো রসেভ্যঃ॥

(২।৪।৫)

মনুসংহিতাতেও শণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,

কার্ষ্ণ রৌরব বাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণ ক্ষৌমাবিকানিচ॥
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্যতু মৌর্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥

(২।৪১, ৪২)

সুশ্রুত সংহিতাতেও শণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ; যথা :—

শণ মূলকশিগ্রাণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
শক্তবঃ কিন্বমতসী দ্রব্যান্যুষ্ণানি পাচনং॥

(সূত্রস্থান, ৩৬)

হেমচন্দ্রের মতে শণম্ (ক্লীবলিঙ্গ) শব্দের অর্থ ভঙ্গা বা মাতুলাশী। রাজনির্ঘণ্ট মতে শণঃ (পুংলিঙ্গ) শব্দে স্বনামখ্যাত ক্ষুপ। তৎপর্য্যায়ঃ যথা মাল্যপুষ্পঃ, বমনঃ, কটুতিক্তকঃ নিশাবনঃ, দীর্ঘশাখঃ, ত্বক্‌সারঃ, দীর্ঘপল্লবঃ। ইহার গুণ অম্লত্ব, কষায়ত্ব মলগর্ভাস্রপাতনত্ব, বাতকারিত্ব, পিত্তকষায়তীব্রাঙ্গমর্দ্দনাশিত্ব। অমরকোষে শণ শব্দ পাই নাই, কিন্তু শণসূত্র শব্দ আছে। হলায়ুধও শণশব্দের উল্লেখ করেন নাই। ভঙ্গ অর্থে শণশব্দ হেমচন্দ্রমতে ক্লীবলিঙ্গ। ভঙ্গা শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ। শব্দকল্পদ্রুমে ভঙ্গা শব্দে বলিয়াছেন "বৃক্ষবিশেষঃ। তৎপর্য্যায়ঃ মাতুলাশী। দ্বে ভঙ্গায়াং। ভঙ্গা কাশ্মীরেষু স্বনামখ্যাতা" ইতি সুভূত্যাদয়ঃ। ইতি ভরতঃ। এতস্যাঃ ফলং কলায় পরিমাণমিতি সর্ব্বস্বম্।

ইতি সারসুন্দরী। শণাখ্যশস্যম্। যথা—ভঙ্গা শস্তে শণাহ্বয়ে। ইতিমুকুটধৃতরুদ্রঃ। "পুনশ্চঔষধবিশেষঃ। ভাঙ্ ইতি সিদ্ধি ইতি চ ভাষা। যথা—ত্রৈলোক্যবিজয়া ভঙ্গা বিজয়েন্দ্রাশণজয়া। ইতি শব্দচন্দ্রিকা।" বিজয়া শব্দে অভিধান—মাদকদ্রব্য বিশেষঃ। ভাঙ্ ইতি সিদ্ধি ইতি চ ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্দ্রাশনম্, জয়া ইতি শব্দচন্দ্রিকা। বীরপত্রা গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আসন্দা, হর্ষিণী। অস্যগুণাঃ কটুত্বম্, কষায়ত্বম্, উষ্ণত্বম্, তিক্তত্বম্, বাতকফাপহত্বম্, সংগ্রাহিত্বম্, বাক্‌প্রদত্তং, বল্যত্বম্, মেধাকারিত্বম্, শ্রেষ্ঠদীপনত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অপিচ ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলাশী মাদিনী বিজয়া জয়া। ভঙ্গা কফহরীতিক্তা গ্রাহিনী পাচনী লঘুঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্বহ্নিবৰ্দ্ধিনী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ। বৈদ্যকগ্রন্থমধ্যে (পুংলিঙ্গ) শণের যে সকল গুণ ধরিয়াছেন, (ক্লীবলিঙ্গ) শণের (ভঙ্গার) ও তন্মধ্যে অনেকগুলির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ মিল নাই। সুতরাং শণঃ ও শণং অভিন্ন বলা উপযুক্ত নহে। বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে শণ শব্দ অস্ত্রীলিঙ্গ। শতপথ ব্রাহ্মণে যে কন্তিকাতে শণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই। শণ কুলায় মন্তরং ভবতি। আদীপ্যাদিতি ন্বেব যদ্ধেব শণকুলায় প্রজাপতির্যসৈ-যোনেরসৃজ্যত অস্মাৎ উমা উল্বমাসঙ্গনা জরায়ু ইত্যাদি। এ স্থলে শণশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং এই স্থলে শণ শব্দে ভঙ্গা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বৈদিক শণ ও Cannabis indica অভিন্ন। কিন্তু অথর্ব্ব বেদে "শণশ্চ মা জঙ্গিড়শ্চ" স্থলে শণ শব্দে কি বুঝাইবে? অথর্ব্ববেদ প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্ব্বেদের আগম। সুশ্রুতসংহিতাতে শণ শব্দ ডল্লনমতে পুংলিঙ্গ ও তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন "পরিপাক সস্বনফলঃ"। সাধারণ ভাষায় শণ অর্থে যে তরু বুঝায়, অথর্ব্ববেদেও শণ শব্দে সেই তরুই বুঝায়; অর্থাৎ Crotalaria juncea। ইহার ফলের মধ্যে শব্দ হওয়ার সম্বন্ধে Sir George Watt বলিয়াছেন "A genus of plants closely allied to the Broom, the generic name being derived from the Greek Krotalon, (a castanet) in relation to the rattling noise made by the loose seeds within the inflated pods." (Dictionary II. 595) Hooker সাহেবের মতে Crotalaria Junceaর নিবাস হিমালয়ের দক্ষিণে; হিমালয়ের উত্তরে ইহা পাওয়া যায় না। সুতরাং অতি প্রাচীনকালে ঋষিগণ যে Crotalaria Juncea নামক উদ্ভিদের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। Cannabis indica (sativa) নামক উদ্ভিদ হিমালয়ের উত্তরে পাহাড়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল ও এখন আছে (Roxburgh Ill. 772) এবং তাহার ছাল হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে শাণ বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেটী কি Cannabis অথবা Crotalaria, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় কি? যাহা হউক এতদ্দ্বয়ের অন্যতর বটে। আর একটী কথা, আয়ুর্ব্বেদে কি ভঙ্গার উল্লেখ আছে? সুশ্রুত নামক গ্রন্থে, মোটামুটী যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভঙ্গা শব্দের ব্যবহার পাই নাই এবং ভঙ্গা শব্দ অথর্ব্ববেদেও নাই। অথর্ব্ববেদের দুইটী মন্ত্রে ভঙ্গঃ (পুংলিঙ্গ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

পঞ্চ রাজ্যানি বীরুধাং সোম শ্রেষ্ঠাণি ব্রূমঃ।
দর্ভো ভঙ্গো সবঃ স্বহস্তে নো মুঞ্চন্তং হসঃ॥

(১১।৬।৫)

সোম শব্দের অর্থ বিচার করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, যজ্ঞীয় সোম cannabis indica বটে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় সোম তদ্ভিন্ন পদার্থ। অথর্ব্ব বেদে ও সুশ্রুত গ্রন্থে সোম অর্থে সোমলতা। ইহা sarcostemma lesenistigma কিম্বা Periploea aphylla বা Ephedra aenlgaris তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। দর্ভ প্রসিদ্ধ দ্রব্য। ভঙ্গ শব্দে কোন্ উদ্ভিদ্‌কে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। তবে ভঙ্গাকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ইহা ঠিক। ভঙ্গ শব্দ গণ পাঠে দণ্ডাদির মধ্যে ধরিয়াছেন। দণ্ডাদিভ্যো যঃ (পানিনি ৫।১।৬৬) অর্থাৎ ভঙ্গং অর্হতি ইতি ভঙ্গ্যঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভঙ্গ শব্দের অর্থ পুরুষ জাতীয় ভঙ্গা বলিয়া বিবেচনা করেন বটে, কিন্তু কোনও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভঙ্গা শব্দের পুংলিঙ্গ ভঙ্গঃ—এ কথা স্বীকার করিবেন না। শাকটায়ন বলিয়াছেন ভঙ্গোমা তিলাৎ (৩।৩।২৯) পাণিনিসূত্র করিয়াছেন। ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্ (৫।২।১) ধান্যের ভবন ও ক্ষেত্র অর্থে খঞ্ প্রত্যয় হয়। তৎপরে বলিয়াছেন ব্রীহিশাল্যো-

র্ঢক্। যবযবকষষ্টিকাদ্ যৎ। ব্রীহি, শালী, যব, যবক, ও ষষ্টিক, এগুলি ধান্যবিশেষ বটে। তৎপরে বলিয়াছেন বিভাষাতিলমাষোমা ভঙ্গাহনুভ্যঃ। এস্থলে মহাভাষ্য বলিয়াছেন উমা ভঙ্গয়োরধান্যত্বাৎ। * * * ন চ উমা ভঙ্গে, ধান্যে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে শাকটায়ন পাণিনি উভয়েই ভঙ্গা শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে ভঙ্গা শব্দই স্বীকার করিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইবে শাকটায়ন ভঙ্গা শব্দ জানিতেন এবং ভঙ্গা নামক দ্রব্যও (=ভাঙ্) জানিতেন। শাকটায়ন দণ্ডাদি সম্বন্ধেও সূত্র ধরিয়াছেন। দণ্ডাদির মধ্যে ভঙ্গঃ শব্দও আছে সুতরাং, ভঙ্গঃ শব্দও শাকটায়ন জানিতেন। অতএব ইহাই প্রমাণ হয় যে শাকটায়ন ও তৎপরবর্ত্তী পাণিনি ভঙ্গঃ ও ভঙ্গা এতদুভয় শব্দই জানিতেন এবং উভয়েই ভাঙ্ অর্থে ভঙ্গা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই কারণে আমরা বিবেচনা করি যে ভঙ্গ ও ভঙ্গা দুইটী পৃথক বস্তুর নাম। সন্দেহ হইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদে সকল মন্ত্রেই কি সোম অর্থে সোম লতা বুঝিতে হইবে? অথর্ব্ববেদে প্রায় সকল মন্ত্রেই সোম শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতার ন্যায় দেবতা-বিশেষ বুঝায়। কিন্তু কতকগুলি মন্ত্রে উদ্‌ভিদ্ বিশেষ বুঝায়; যথা :—

(১) যথা সোম ওষধীনামুত্তমো হবিষাং কৃতঃ।
তলাশা বৃক্ষাণা মিবাহং ভূয়াসমুত্তমঃ॥

(৬।১৫।৩)

(২) অশ্বত্থো দর্ভো-বীরুধাং-সোমো-রাজামৃতং-হবিঃ।
ব্রীহির্যবশ্চ ভেষজৌ-দিব-স্পুত্রাবমর্ত্তৌ॥

(৮।৫।২০)

এই মন্ত্রদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক বলিয়া বোধ হয়। এই মন্ত্রোল্লিখিত অশ্বত্থ দর্ভব্রীহি ও যব, এ গুলি প্রসিদ্ধ। বীরুধগণের মধ্যে রাজা (=প্রিয় বা প্রধান) যে সোম ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদে সোমলতা বলা হইয়াছে এবং সেই সোমই এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতং হবিঃ, সোমের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, সোম নামের সহিত প্রাচীন সোমের মর্য্যাদা-সূচক রাজন্ অমৃত ও হবিঃ এই সকল ভাবগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় সোমেরও বিশেষণ করা হইয়াছে। বাস্তব পক্ষেও দেখা যায় যে, সোমলতা ঔষধের মধ্যে রাজাবিশেষ। (৩) প্র বা এতীন্দুরিন্দ্রস্যনিষ্কৃতিংসখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতিসংগিরঃ। মর্য ইব যোষা সমর্যসে সোমঃ কলসে শতযামনা পথা॥ (১৮।৪।৬০)

এই মন্ত্রটী প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র। (ঋ-৯।৮৬।১৬) এবং ইহাতে উল্লিখিত সোম, প্রাচীন সোম বটে।

(৪) পঞ্চ রাজ্যানি বীরুধাং সোম শ্রেষ্ঠানি ব্রূমঃ।
দর্ভোভঙ্গোসবঃ সহস্তেনোমুঞ্চন্তং হসঃ॥

(১১।৬।১৫)

ইহা আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক বটে। এবং এ স্থলে যে সোমের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় সোম বটে।

গরবিনী

৺অমলা দেবী

আমি গরবিনী শুধু তোমারি গরবে,
হে মহামহিমময়! তুমি আছ যবে
নিভৃতে নীরবে,
কনক আসনে, অতি নির্জ্জনে, মম
মনোমন্দির মাঝে, ও গো প্রিয়তম!
সুখ স্বপ্ন সম!!

আঁখি রঞ্জন ও গো হৃদয়-দেবতা!
মধু গুঞ্জন ভরে, মরম বারতা
কাঁদিতেছে সদা,
অসীম গৌরব ভরা তোমার চরণে
অভয় নির্ভর সে যে, জনমে মরণে,
এ চির জীবনে!!

পরকীয়া

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প বল্‌তে হবে? হতভাগীর আত্মকাহিনী তোমাদের ভাল লাগ্‌বে কি? কি বল্‌ছ, লাগ্‌বে? তবে শোন। কিন্তু সহানুভূতি দেখিও না, দয়া কর্‌তে চেও না! তোমাদের ভালবাসায় আমার বড় ভয় করে! বড়... হ্যাঁ, কি বল্‌ব, গল্প, বলি—

"সে অনেক দিনের কথা। জীবন-খাতার অনেক-গুলো পাতা তখন অবশিষ্ট ছিল। কোন্ দূরাগত প্রার্থিত অতিথির মত যৌবনের অরুণ-রাগে আমার দেহ-মন রাঙিয়ে উঠেছিল! সংসারের অবলম্বন, জরা-বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত স্বামী, ওপারের ডাক্ শুনে, যাওয়া-না-যাওয়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে, আত্মীয়-স্বজনের উদারতায় এঁর সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র একত্র গ্রথিত হয়েছিল। এ শুভ-কার্য্যে বাধা দেবার প্রবৃত্তি বা দুঃসাহস কারও হয় নি। বাপ রে! নরকে যেতে হবে না!

"যাক্ সে কথা। এমনই উদ্দেশ্য-বিহীন জীবনের জমা-খরচের জের টান্‌তে টান্‌তে বুকের হাড়ের কলমে হৃদয়ের পরতে পরতে সমাজের এ নিষ্পত্তির ফলাফলের অনেক কথাই লিখে চলেছিলুম।

"সেদিন বাদলের চাঁদ আকাশ-কোলে মুখ ঢেকে ছিল। মেঘের বুক চিরে নক্ষত্রপুঞ্জের চোখের জল সারা-সহরে প্লাবনের সৃষ্টি করেছিল।

"হঠাৎ হাঁপানীর বেগ বৃদ্ধি হওয়ায়, স্বামী আমার ইহলোকের আলো নিভিয়ে দিয়ে কোন্ অজানা-আলোকের সন্ধানে চলে গেলেন! শূন্য বাড়ীখানায় একা আমি সেই ভীষণ দুর্য্যোগে অন্তর-বিপ্লবের তাড়নায় অস্থির হয়ে বারিধারার সঙ্গে স্রোত মিলিয়ে দিলুম! চীৎকার করে কাঁদ্‌বার প্রবৃত্তি হলো না, চুপ করে বসে রইলুম। প্রথম গৃহ-প্রবেশেই ত অন্তরে অন্তরে এ দিনের সহিত পরিচিত হয়েছিলুম! এ যে আমার প্রাক্তন! এ যে আমার মামা-মামীর জাতরক্ষার জলন্ত সাফল্য!

"কে যেন কড়া নাড়্‌লে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালুম। দরজার কাছে গিয়ে বল্‌লুম—'কে?'

"'আমি।'

"এ কি! এ যে পরিচিত স্বর! এ স্বপ্ন না সত্য!

"তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিয়ে বল্‌লুম—'এমন সময় তুমি কোথা থেকে অনুপ?'

"অনুপম বল্‌লে—'বল্‌ছি, এখন ভেতরে চল। জামাইবাবু কোথায়?'

"কিছু উত্তর দিলুম না। তাকে নিয়ে গিয়ে স্বামীর পরিত্যক্ত দেহখানির কাছে হাজির কর্‌লুম।

"সে শিউরে বল্‌লে—'এ কি! ইনি যে মারা গেছেন দেখছি! কি হয়েছিল?'

"আমি তার ব্যাকুলতার উত্তরে ধীর কণ্ঠে বল্‌লুম—'বেশী কিছু নয়! যা ছিল, তাতেই!'

"রাত্রে বৃষ্টি ধর্‌ল না। অনুপের বিশেষ জেদ সত্ত্বেও তাকে বাইরে যেতে দিলুম না। বল্‌লুম—'যিনি যাবার তিনি ত গেছেনই! এখন নিজে এই দুর্য্যোগ মাথায় নিয়ে কষ্ট করে অসুখ ডেকে এনে লাভ কি? বিশেষ এ সময় কেউ তোমায় সাহায্য কর্‌বে বলে ত বোধ হয় না। সকাল হোক্। যা কর্‌বার তা ত কর্‌তেই হবে!'

"প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটে গেল। পাড়া-পড়সীদের ডেকে আনা হলো। কাছেই তাঁর ভায়েরা থাকতেন, তাঁরা এসে অনর্গল তিরস্কার করে যেতে লাগ্‌লেন—'একবার খবর পাঠান উচিত ছিল;—হাজার হোক্ ভাই ত! একবার শেষ দেখা হলো না! ডাক্তার দেখান হলো না! দু ক্রোশ নয়, বিশ ক্রোশ নয়!' ইত্যাদি।

"এত দুঃখেও মনে হাসি এল! অনেক দিন শ্বশুর-বাড়ী এসেছি, কই, এক দিনের জন্যেও ত এঁদের খবর

নিতে দেখেছি বলে মনে হয় না! এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এ কি অপূর্ব্ব সহানুভূতি!

"তখন না বুঝলেও বুঝতে বেশী বিলম্ব হলো না। কথায় কথায়, অনুপ যে সেই বিপদের রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে ছিল, এই কথা তুলে পাড়ায় একটা ঘোঁট উঠে গেল। বলা বাহুল্য, এ দলের কর্ত্তা হয়ে দাঁড়ালেন—আমার নিকট আত্মীয়েরাই!

"চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইলে! আত্ম-হত্যার জন্যে মন পাগল হয়ে উঠ্‌ল! কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিলুম। কেন? অসত্য যা, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় কি? কলঙ্কেরই বা আশঙ্কা কিসের? যার সঙ্গে জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলুম, মনে-জ্ঞানে ভালবেসে যাকে ভায়ের পবিত্র আসনে বসিয়েছিলুম, সেই চির-সরল, চির-উদার, চির-সুন্দর অনুপের প্রতি এ কি পঙ্কিল অপবাদ!

"মহামারীর কবলে সকলকে বিসর্জ্জন দিয়ে, অনুপ আমাদের কাছে দিনকতক স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃতি তাকে কি তীব্র ব্যঙ্গই না কর্‌লে! আমার বোঝা মাথায় করে তাকে উপায়ের অন্বেষণে বেরুতে হলো! মামার-বাড়ীতে চিঠি লেখায় উত্তর এল—সমাজ যাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তার স্থান সেখানে হবে না। দুঃখ হলো না, তবে মনের কোণে ঘুমিয়ে-পড়া মায়ের স্মৃতি শুধু একবার জেগে উঠে, আমার অন্তর-সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে গেল!

"দিন চলে, কিন্তু দীনের পক্ষে যে কি ভয়ঙ্কর ভাবে, তা বুঝতে ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ পারে না! যা হোক্, সহরে এসে দুজনে ভাইবোনের মত বাস কর্‌তে লাগ্‌লুম।

"অনুপ আমার জন্যে বুঝি তার জীবনের সব শক্তি ব্যয় করে উপার্জ্জনের চেষ্টায় লেগে গেল!

"আমি অনুযোগ করে বল্‌লুম—'এ কি কর্‌ছ অনুপ, শরীরটা আগে—তার পর...'

"সে হেসে বল্‌লে—'আমার শরীর লোহার তৈরী, আরতি, কিছু হবে না এতে। বিধাতার দেওয়া দান তোমায় যখন পেয়েছি, তখন আমায় অবহেলা কর্‌তে শিখিও না।'

"আমি বললুম—'পাগল হচ্ছ না কি? নাও, ওসব বাজে বকুনী ছাড়। আমি কিছুতেই তোমায় অমন করে খাট্‌তে দেব না!'

"সে বল্‌লে—'আচ্ছা, কিছু সঞ্চয় করে নি, তোমার আখেরের বন্দোবস্ত না করে যে কিছুতেই ঠিক থাক্‌তে পার্‌ছি না। আরতি, আমিই যে তোমার...'

"'যাও, ও সব কথা তুল্‌লে তোমার মুখ দেখ্‌ব না' বলে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।

"এমনই ভাবে কেমন করে পাঁচটী নববর্ষের অভিষেক শেষ হয়েছিল, বুঝ্‌তে পারি নি। হঠাৎ এক দিন অনুপ টল্‌তে টল্‌তে এসে শয্যা আশ্রয় কর্‌লে! ছুটে গিয়ে দেখ্‌লুম—উত্তাপে গায়ে হাত রাখা দায়। অন্তরটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল! অনুযোগ করে বল্‌লুম—'এই ত খাটুনীর ফল ফলে গেল! দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে! যাই, ডাক্তার ডাকিয়ে...'

"সে বাধা দিয়ে হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে—'তুমি কি ক্ষেপে গেলে আরতি! সামান্য জ্বর, দুফোঁটা 'একোনাইট' খেলেই সেরে যাবে 'খন। তুমি আমার জন্যে মর্‌বে দেখ্‌ছি!'

"আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বল্‌লুম—'না, না, ওসব বাজে কথায় চুপ করে থেকে, শেষটা বেশী হলে কি হবে বল ত! দু ফোঁটা জলে ছাই হবে! তোমার কথা যে শোনে, সে আস্ত বোকা!'

"সে বল্‌লে—'সেয়ানা মানুষ ত রয়েছ, তবে আর ভয় কি? দু-দিন দেখ, দুট বল্‌তে ডাক্তার ডাকা ত ঠিক নয়। এখন একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও ত!'

"জ্বর কিন্তু কম্‌ল না। ডাক্তার ডাকা হলো। স্বামীর শেষ চিহ্ন হারগাছা বিক্রয় করে, অনুপের চিকিৎসায় লেগে গেলুম! তার গচ্ছিত সম্পত্তিতে হাত দিতে ইচ্ছা হলো না!—তা দেবতার নৈবেদ্যেরই মত বড় যত্নে সাজান রইল!

"ডাক্তার বল্‌লেন—'অত্যধিক পরিশ্রমেই এঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পড়েছে।'

"আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌লুম না। ওগো, আমারই জন্যে যে তার এই দশা!...আমার...ছুটে গিয়ে তার পা দুটো বুকের ওপর চেপে ধর্‌লুম। তন্দ্রার ঘোরে মগ্ন সে, আমার এ দুর্ব্বলতা বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

সেদিনও বর্ষার কাজল-মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে

গিয়েছিল। প্রকৃতির বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরেও বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল। অতীতের এক সুস্পষ্ট স্মৃতি কেবলই মনের কোণে জেগে উঠ্‌ছিল! কে যেন কেবলই বল্‌ছিল—'অভাগী, আজও তোর সেই দিন!'

"শেষ জবাব দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিয়েছেন,—রাতটা কাটে কি না সন্দেহ! নীরব নিথর দেহে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রোগীর পাশে বসে ছিলুম! হঠাৎ অনুপ আমার হাত দুটো চেপে ধরে ডাক্‌লে—'আরতি!'

"কি মিনতিভরা ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর! আমি বল্‌লুম—'কেন?'

"সে অনিমেষে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল! তার পর গাঢ় কণ্ঠে বল্‌লে—'আজ একটা কথা তোমায় বল্‌ব মনে করেছি! যদি কিছু মনে না কর!' আমি বল্‌লুম—'কিছু না, তুমি বল!'

"সে উদাস অবসন্নভাবে বল্‌লে—'না, থাক্!' "আমি অধৈর্য্য হয়ে বল্‌লুম—'না, তোমায় বল্‌তেই হবে! নইলে আমি আজ কোন মতেই আপনাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ব না! বল!'

"সে ধীর কণ্ঠে বল্‌তে লাগল—'শোনাবার সাধ কখন মনে জাগে নি, কিন্তু আজ জীবন-বন্ধন শিথিল,—মরণ-পথের পথিক হয়ে, কোনমতেই আপনাকে সাম্‌লাতে পার্‌ছি না! আরতি, আমি তোমায় ভালবাসি! ছেলেবেলায় বাস্‌তুম, কৈশোরে বেসেছি! কিন্তু, এখন ভালবাসি তোমায় অন্য রকমে! তোমায় আপন করে নিতে!'

'যেদিন সমাজের বিচারে নিরপরাধিনী তুমি,—তোমায় ভীষণ দণ্ড মাথা পেতে নিতে হলো, কেউ ভবিষ্যৎ ভাব্‌লে না, তোমার অবস্থা কারও অন্তরে চেতনা এনে দিলে না, বরং পাপ-পথে হাত ধরে এগিয়ে দিলে, সেদিন, একটা বড় শক্ত ঘা এই বুকে বেজেছিল! তার পর, এখানে থেকে কেবলই আমার শুক্‌নো মুখখানি আমার আজন্মের সঙ্কল্পে আঘাত করেছে! ধ্বংসের রূপ ধরে এ জাতিটার ওপর বারংবার লাফিয়ে পড়ার জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি! তোমার উপায় খুঁজে খুঁজে শেষে এই!... না, না, এ আমি কি বল্‌ছি! ভুল, মহাভুল! কিছু মনে করো না!'

"আপনহারা উত্তেজিত হয়ে আমি বলে উঠ্‌লুম—'বল, বল, চুপ কর্‌লে চল্‌বে না! আমায় জান্‌তে দাও, আমায় বুঝ্‌তে দাও, তোমার আদেশ! তোমার...'

'না, না, তা হয় না! দুরাশা! আরতি, হতভাগার প্রতি দয়া করে এই বিষাক্ত দিনটার কথা ভুলে যেও! আমার সঞ্চিত টাকাগুলিতে তোমার কোন রকমে চলে যাবে—দেখ, নিজেকে কষ্ট দিও না! কারও কাছে হাত পেত না! জানি না কোথায় আমার স্থান—নরকে কি স্বর্গে! তবে যেখানেই থাকি না কেন, আমার আত্মা তোমার এ সেবায় পরিতৃপ্ত হবে! বল, তাই কর্‌বে? আমায় ক্ষমা কর্‌বে?'

"সন্ধ্যাতারার মত তাহার নয়ন দুটী প্রার্থনা-ভরে স্থির!—অবিকম্পিত! আমি অধীরার মত তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠ্‌লুম! বল্‌লুম—'দোষ কি তোমার! কে যেন আমার কাণে কাণে বল্‌ছে—ভাঙবে! ভাঙবে! এ অবিচার অত্যাচারের শেষ হয়ে এসেছে! যুগ ফিরেছে! শুধু জোরের ওপর আর কোন কিছুরই প্রতিষ্ঠা চল্‌বে না! এ জাতির ওপর আর আমার মমতা নেই, অনুকম্পা নেই, বিদ্রোহী আমি! মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি—সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার কর্‌ছি, এ পারের খেলা শেষ হয়ে গেলে, ও পারের খেলাঘরে দুজনে গিয়ে মিল্‌ব! আরাধ্য দেবতা আমার!... ও কি, অমন কর্‌ছ কেন? কি বল্‌ছ, তোমার সাধ পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু, আমার যে হয় নি! শোন, হে মহাপ্রাণ! তোমায় যে এমন করে পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি!...'

"কিন্তু শুন্‌বে যে, তার আত্মা তখন কোথায়, কোন্ অমরলোকে চলে গেছে! আমি রুদ্ধ বেদনায় তার দেহখানির ওপর লুটিয়ে পড়লুম! ভগবান্!.....

* * * * *

"তার পর আবার দিন চলেছে! আবার ধৈর্য্যে বুক বেঁধে চলেছি! অসম্পূর্ণ মিলন সুসম্পূর্ণ হবার বড় বেশী বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না! যক্ষ্মারোগ আমায় তিলে তিলে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তাকে পাবার দিন ক্রমশঃই নিকট হয়ে আসছে!

"সতীমহলে আমার স্থান হয় নি। অনেকেই আমার সঙ্গে মিশতে বিরক্ত হয়েছেন। কেউ কেউ আমার জীবনের কথা শুনে হেসেছেন, আর ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

'যোগ্য লেখকের নিকট এটী একটী ভাল রসদ! গল্প জমে বেশ!'

* * * *

"পুরীতে সমুদ্র তীরে এসেছি। নীলাম্বুধি ও নীলাম্বরে অপূর্ব্ব মিলন-বৈচিত্র্য! হে দারুব্রহ্ম! হে জগন্নাথ! হে অচল-নিকেতন! তোমায় শতকোটী প্রণাম! তোমার সৃষ্ট এই বিশাল জলধি ও বিরাট্ আকাশকেও বারবার নমস্কার করি!

"স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-মানসে প্রত্যহই এখানে ঘুরে বেড়াই। কোন কোন গিন্নী আমার প্রতি অহেতুক করুণা দেখিয়ে বলেন—'পোড়াকপাল আর কি! মেয়েরা আবার মানুষ, তাদের আবার শরীরের যত্ন! বিশেষ তিনকুলে যার কেউ নেই!'

"আমি তাদের উত্তরে কখন কখন বলি—অন্তর-দেবতা যে আমায় আদেশ করে গেছেন,—আমায় মন্ত্র দিয়ে গেছেন,—তার কি অপমান কর্‌তে পারি!'

"আবার এক এক সময় আপন-মনে হাসি, আর ভাবি—নিজেকে অযত্ন কর্‌লে যে তাঁকেই অযত্ন করা হবে! এঁরা তা বোঝেন না কেন?"

উলা বা বীরনগর

শ্রীস্থজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট সবডিভিসনের অধীন উলা গ্রামটী অতি প্রাচীন। গ্রামটী ই, বি, রেলের মুর্শিদাবাদ লাইনে অবস্থিত ও কলিকাতা হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূর। পূর্ব্বে গঙ্গা উলার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। আজিও উহার ত্যক্ত খাদ সকল "বারমেসে খাল" "ডাকাতের খাল" "চখার বিল" "পচার বিল" ও "ধামার খাল" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেখানে এক্ষণে উলা গ্রামের কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেখানে পুরাকালে গঙ্গার চরে উলু খড়ের বন ছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই উলু বন হইতে "উলো" বা "উলা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আরব্য শব্দ "উলা" অর্থাৎ "সর্ব্ব প্রথম" বা "শ্রেষ্ঠ" শব্দ হইতে 'উলা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

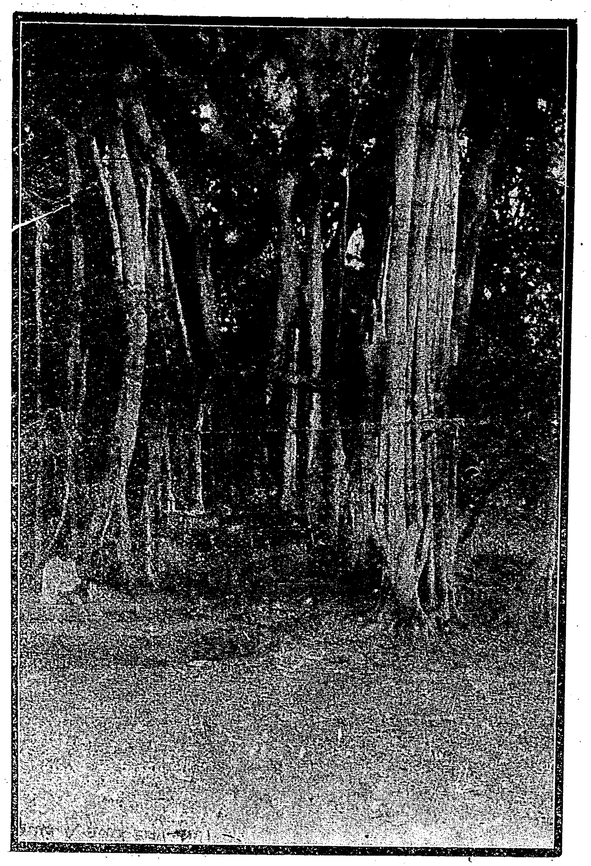

"শিবেশণী" এবং "বদে ও বিশে" নামক ডাকাত সর্দ্দারদিগের দুইটী বিখ্যাত দল এই গ্রামে ধরা পড়ে। বিখ্যাত "মুস্তৌফী" বংশের অনাদিনাথ মুস্তৌফী নামক জনৈক যুবক "শিবেশণী" ডাকাতকে স্বয়ং ধৃত করেন; এবং "বদে ও বিশের" দল গ্রামের মাঝের পাড়ার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাতি করিবার কালে গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। গ্রামবাসিগণের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উলার নাম "বীরনগর" রাখেন। সেই হইতে সরকারি কাগজ-পত্রে উলার নাম "বীরনগর" হইয়াছে। সেই সময়ের প্রচলিত একটী ছড়ার কিয়দংশ এই—

"শিবেশণী মাশুল চোর
ছোকরাতে করেছে পাকড়া
ধন্য উলা বীরনগর।"

বাঙ্গলা সাহিত্যে উলার নাম ছড়াইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থরাজি মধ্যে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"তে উলার উল্লেখ আছে:—

"উলা বাহিয়া খিসমার
আশে পাশে
মহেশপুর নিকটে সাধুর
ডিঙ্গা ভাসে।"

উলার ৺উলাইচণ্ডী তলা

উক্ত চণ্ডীতে কথিত আছে যে, ধনপতি সওদাগর ও পরে শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলে যাইবার কালে এই উলার পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গা বাহিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, শ্রীমন্ত যখন উলার পার্শ্ব দিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ডিঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন, তখন ভীষণ ঝড় জল হইতে থাকে। তিনি আপন বাণিজ্যতরণীগুলি রক্ষা করিবার

জন্য ঐ দিন এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গাতীরে বটমূলে যে শিলাময়ী দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম "৺উলাচণ্ডী"; এবং সেই হইতে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যে পূজা ও তদুপলক্ষে সমারোহ হইয়া থাকে, উহাকে "উলা চণ্ডীজাত বা যাত্রা" বলা হয়। ঐ দিন গ্রাম্য হাড়িগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গোপনে দেবীর সম্মুখে শূকর বলি দেয়। তৎপরে গ্রামের সকল গৃহস্থ ও নানাদিকদেশ হইতে যাত্রীগণ আসিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকে। এই দিন দেবীর চতুর্দ্দিকে বহু ছাগ বলি হয়। লোকে দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া কেহ ব্যাধি শান্তি, কেহ পুত্র কামনায়, কেহ অর্থ প্রাপ্তির কামনায় দেবীর বট বৃক্ষের জটায় ইষ্টকখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া কামনা করিয়া যায়। পরে সেই কামনা সিদ্ধ হইলে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সমারোহে দেবীর পূজা দিয়া থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন উলা চণ্ডী তলায় মেলা বসে। এই দিন দুই প্রহর হইতে বারোইয়ারী পূজা উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও উত্তর পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তির পূজা হয় ও তদুপলক্ষে তিন দিবারাত্রি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিতে থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার মেলা

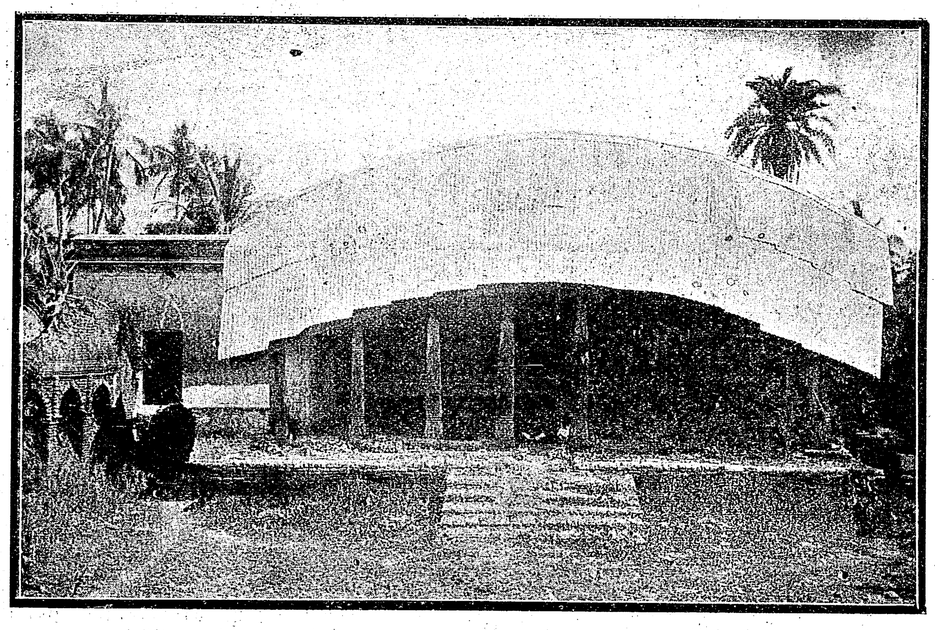

টীন আচ্ছাদিত চণ্ডী-মণ্ডপ

অন্য পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে "আইন-ই-আকবরীতে" উলার নাম আছে। উহাতে উল্লেখ আছে যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে উলা সরকার সুলেমানাবাদের একটী প্রধান নগর ছিল, ও উলার দেয় রাজস্ব বাৎসরিক ৮৯২৭৭ দাম বা ইংরাজী আমলের রৌপ্য মুদ্রার অনুমান ১৮৬০৲ টাকা ধার্য্য ছিল। ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, আধুনিক নদীয়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার কতকাংশ লইয়া সরকার সুলেমানাবাদ গঠিত ছিল। উলার পূর্ব্ব

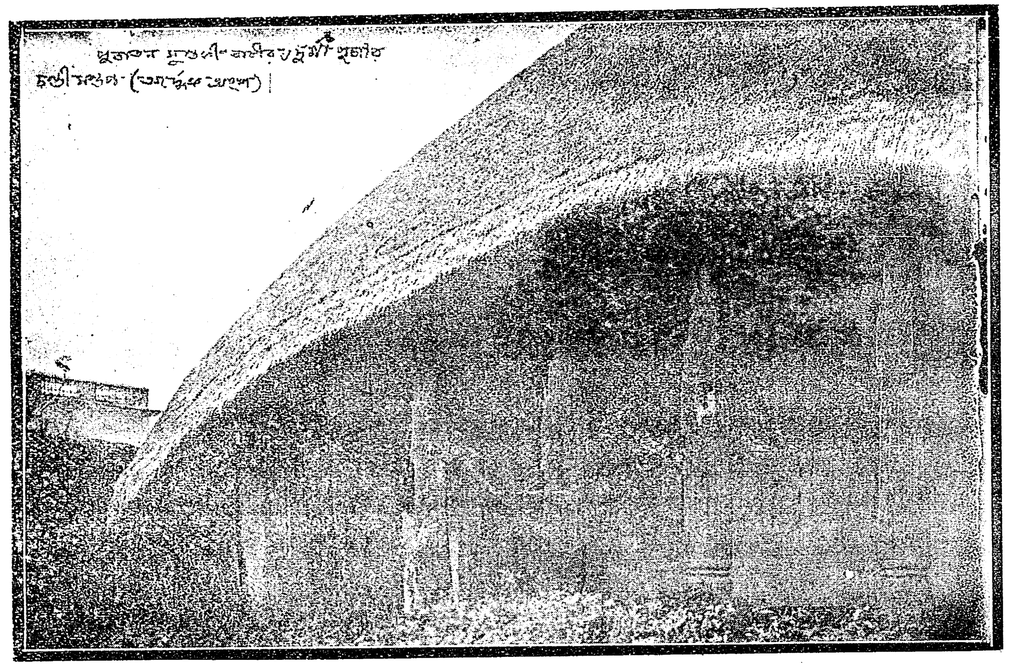

দুর্গাপূজার চণ্ডী-মণ্ডপ

দিকে পুরাতন দীঘি নামক যে বিশাল একটী দীঘির শুষ্ক খাত আছে, উহাকে লোকে মুসলমানদিগের আমলের দীঘি কহে।

আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থে উলার নাম আছে। উহা উলার খড়দহপাড়া নিবাসী ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" নামক পদ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থকার গঙ্গার গতি বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেন :—

"অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া,
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডীকা নহেন যথা ছাড়া।
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়,
নৃত্য-গীত নানা নাট, দ্বিজ করে চণ্ডী পাঠ
মানে যে, মানস সিদ্ধ হয়।
কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম
কাশী তুল্য হেন ব্যবহার,
দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা
মুনি হেন, হেন কুলাচার।"

প্রবাদ আছে যে, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আউলিয়াচাঁদকে ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসে উলার মহাদেব বারুই তাঁহার পানের বরজের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েন। মহাদেব তাঁহাকে ১২ বৎসর কাল আপন গৃহে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন।

নদীয়ার মহারাজগণ পুরাকাল হইতে উলার রাজেশ্বর ছিলেন। কায়স্থ বংশীয় মিত্র মুস্তৌফীগণ নদীয়া রাজের অধীনে এই গ্রামের ও এতদঞ্চলের জমিদার ছিলেন

মুস্তৌফীগণ গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। এই বংশের রামেশ্বর মুস্তৌফী প্রথমে সুবেদার সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদে মুস্তৌফী দপ্তরের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। "মুস্তৌফী" কথার অর্থ সর্ব্বপ্রধান হিসাব-পরীক্ষক, অর্থাৎ এক্ষণে যাহাকে একাউণ্টেণ্ট জেনেরাল কহে। রামেশ্বর সুবে বাঙ্গালার সন্তোষজনক হিসাব-নিকাশ করিয়া দেওয়ায়, নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে দিল্লীতে সম্রাট ঔরঙ্গজীব আলমগীরের নিকট প্রেরণ করেন। রামেশ্বর সুপুরুষ ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকায়, ও সুবে বাঙ্গালার সন্তোষজনক হিসাব দেওয়ায়, সম্রাট তাঁহাকে সুবে বাঙ্গালার মুস্তৌফী পদে নিযুক্ত করিয়া মুস্তৌফী উপাধি ও বঙ্গের নানা স্থানে জায়গীর প্রদান করেন। তন্মধ্যে বেলে, ভোগ্রা, ছুটীপুর ও কল্যাণশ্রী প্রভৃতি কয়েকটী সম্পত্তি আজিও তাঁহার বংশধরগণের দখলে আছে।

উক্ত রামেশ্বরের পিতা মোহন মিত্র উলার নিকটস্থ বেলেডাঙ্গানিবাসী নগর রাজা নামক এক জমিদারের বাটীতে গুরুমহাশয় ছিলেন এবং তিনিই সভ্রাতা টাকা গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া উলায় বাস করেন। মোহনের ভ্রাতা কাশীশ্বরের বংশ আজিও উলায় বর্ত্তমান এবং কাশীশ্বরের একটী প্রাচীন কারুকার্য্যময় মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। রামেশ্বরের বংশধর মুস্তৌফীগণ টেকা বা টাকা সমাজের মিত্র, দ্বিতীয় পো, ও মধ্যম কুলীন। রামেশ্বরের ৮ পুত্র (কেহ বলেন ১০ পুত্র) ছিল।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন শক্তি-উপাসক, নায়িকা-সিদ্ধ ও জ্যোতিষে পারদর্শী ছিলেন। উলার মুস্তৌফী বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ ও শ্রীকৃষ্ণের যোড় বাঙ্গালা মন্দিরের স্থান তিনিই, পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গণনা দ্বারা স্থির করিয়া দেন। রঘুনন্দন (বাঙ্গালা ১১১৪।১৫ সালে) উলা ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার গঙ্গাতীরস্থ শ্রীপুর গ্রামে ৭৫ বিঘা মহত্তরাণ ভূমি বাঁশবেড়িয়ার রঘুদেব রায়ের নিকট হইতে লইয়া তথায় বাস করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি

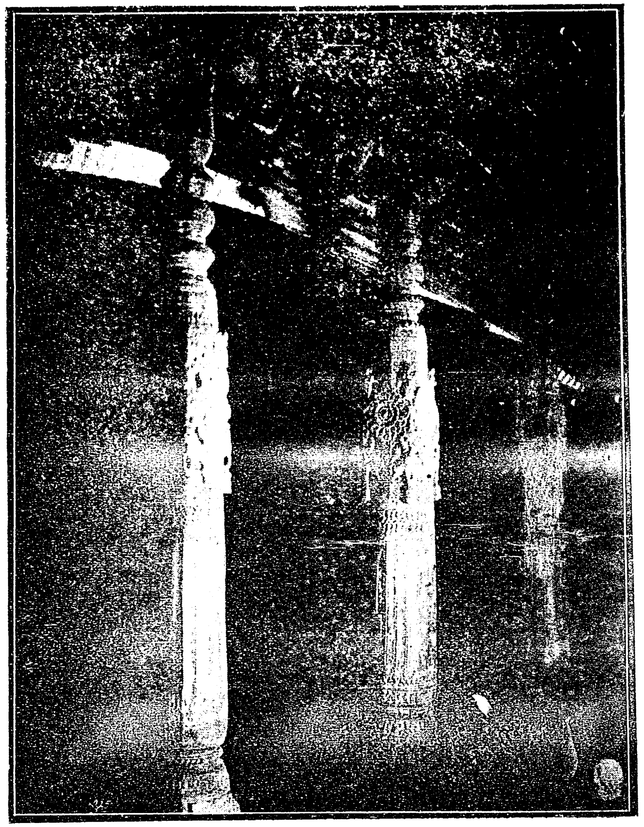

কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য

ঢাকার নবাব সরকারের দেওয়ানী পদ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ পরেই রামেশ্বরের অন্যতম পুত্র অনন্তরাম ও নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায়, অনন্তরাম বর্দ্ধমানাধিপ তিলকচন্দ্রের নিকট তাহা নিবেদন করেন। অনন্তরাম নবাব সরকারে কার্য্য করিবার কালে মহারাজ তিলকচন্দ্রের কোন বিশেষ উপকার করায়, মহারাজ প্রতিশ্রুতি পালনার্থ অনন্তরামের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হুগলী জেলাভুক্ত গঙ্গাতীরস্থ সুখড়িয়া প্রভৃতি চারিখানি গ্রাম ১০০১৲ টাকা মূল্যে অনন্তরামের অন্যতম পুত্র তিলকরামের নামে বিক্রয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। অনন্তরাম উলা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সংসার লইয়া সুখড়িয়া গ্রামে বাস করিতে গেলেন। প্রথম

চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের কারুকার্য্য

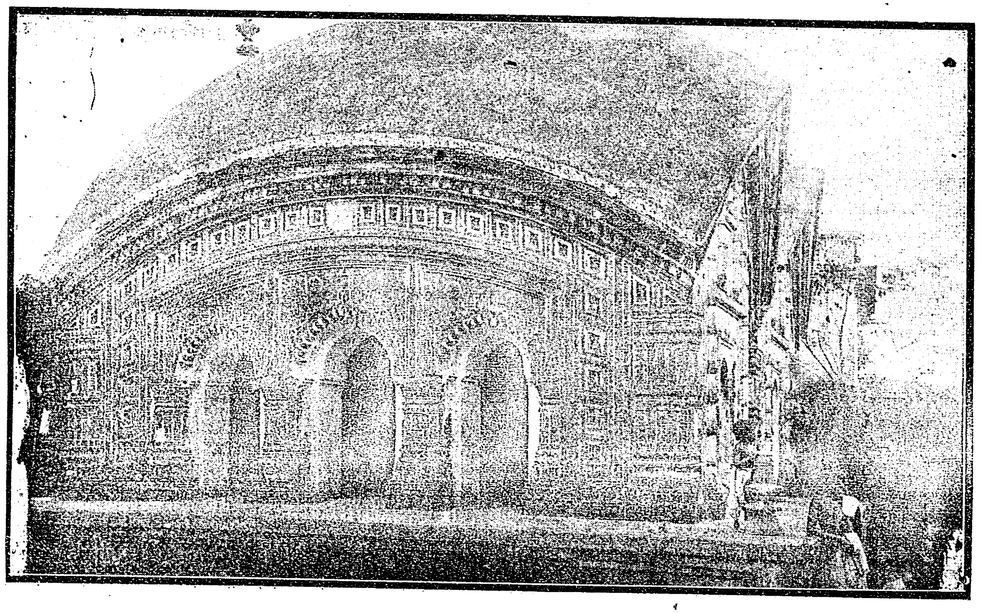

যোড় বাঙ্গলা মন্দির

পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদ্বয়ের বংশ আজিও উলায় "দেওয়ানের ঝাড়" নামে অভিহিত।

রামেশ্বরের অন্যতম পুত্রগণের মধ্যে উলাবাসী মুকুন্দরাম, মুক্তিরাম ও কনিষ্ঠ শিবরাম বঙ্গের নানা জেলায় প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ শিবরাম নবাব সরকারে পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া লাট ভড়োয়া, কুরুণ নুরুণ, নন্দের নন্দন প্রভৃতি অনেকগুলি সম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও দেবালয়াদি প্রস্তুত করেন। পরে শিবরামের মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকৃতি হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার যড়যন্ত্র করিলে তিনি

নালিশ করিয়া আমীন আনিয়া সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয়েন। এ কারণ শিবরামের বংশকে আজিও "খোলা ভাঙ্গার ও ছোটর ঝাড়" কহে।

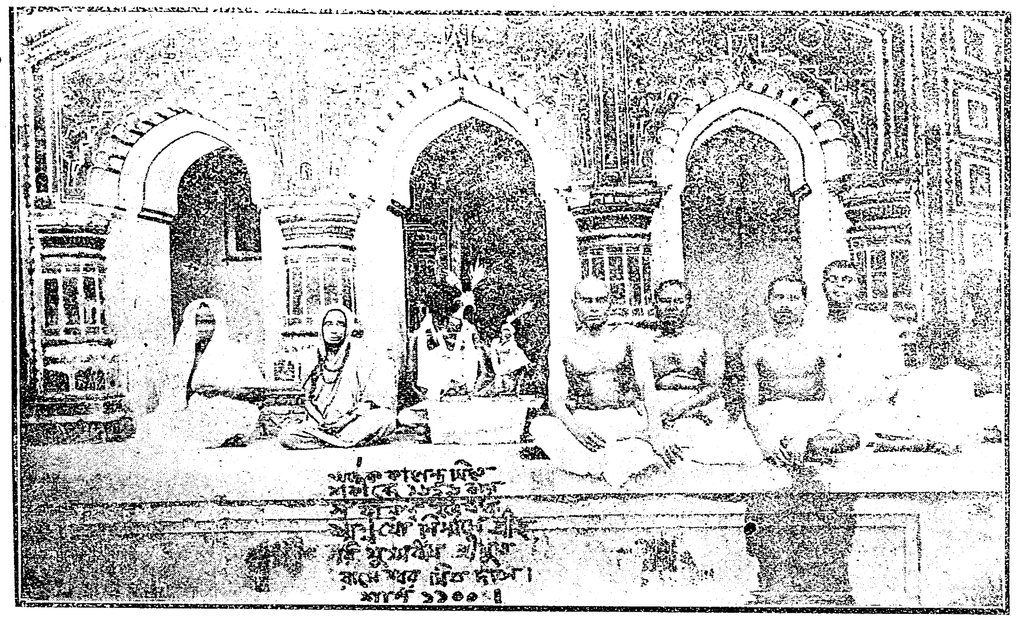

যোড় বাঙ্গলা মন্দিরের কারুকার্য্য

রামেশ্বরের অন্যতম পুত্র মুকুন্দরামের জনৈক পৌত্রের নাম শোভারাম। শোভারাম অনুমান ১১৩৭ শালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অধুনাতন যশোর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামে বাস করেন ও তথায় ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামক শালগ্রাম ও কয়েকটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন। আজিও পুরাতন বনগ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুইটী শিবমন্দির বর্ত্তমান আছে। বনগ্রাম তৎকালে নদীয়া জেলাভুক্ত ও মুস্তৌফীদিগের সম্পত্তি ছিল।

মুস্তৌফীদিগের সমৃদ্ধির চিহ্ন বহু অট্টালিকা, দেবালয় ও দীর্ঘিকাদির ধ্বংসাবশেষ আজিও উলায় বিদ্যমান আছে। মুস্তৌফীদিগের নিকট একখানি পারস্য ও বঙ্গ ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন দলিল আছে। উহার তারিখ ১১ই কার্ত্তিক সন ১১০১ শাল (মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ল সন ৩৯ জলুষ)। ঐ দলিলে দেখা যায় যে, সনাতন দত্ত নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক দেনার দায়ে ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া মাত্র ৯৲ টাকা মূল্যে রামেশ্বর মুস্তৌফীবংশের বিবরণ হইতে আর একটী বিষয় জানা যায় যে, ইঁহারা কন্যা-জামাতাকে স্বগ্রামে বাসস্থানাদি দিয়া প্রতিপালন করিতেন, ও নবাবী কায়দায় জামাতাকে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে দিতেন না। পরন্তু, জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিলে, তাহাকে একটী পৃথক বাটীতে স্থান দেওয়া হইত, ও তথায় দাসীর সহিত কন্যাকে পাঠান হইত। আজিও মুস্তৌফী বাটীতে এইরূপ একটি গৃহের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন "জামাই কোঠার" সাক্ষ্য দিতেছে। আরও জানা যায় যে, আহ্নিক ও চণ্ডী পাঠাদি না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করিত না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে উলা গ্রামটী সুখৈশ্বর্য্যের চরম সীমায় পঁহুছিয়াছিল। নদীয়ার মহারাজ রামকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত মহারাজগণ এই গ্রামস্থ বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিকে যে সকল নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন, আজিও গ্রামবাসীগণ তাহার কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন।

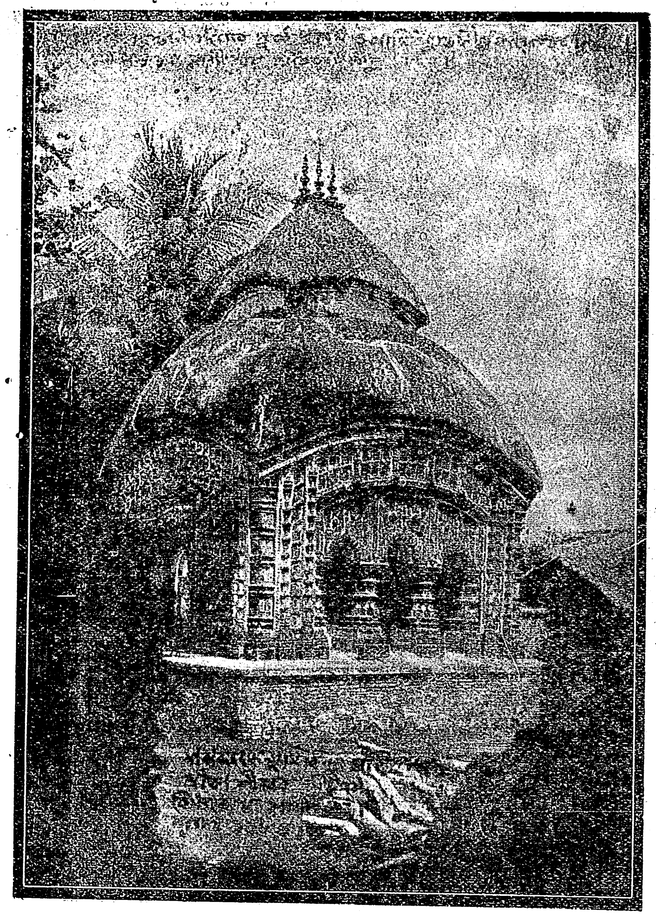

৺বিষ্ণু মন্দির

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে" উল্লিখিত আছে যে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্য যে ৪৯টী পরগণায় বিভক্ত ছিল, উলা তন্মধ্যে একটী। তথায় তৎকালে বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বাস ছিল ও সংস্কৃত চর্চ্চা প্রবল ছিল। উলায় ব্রাহ্মণদিগের একটী বড় সমাজ ছিল ও বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। আজিও খড়দহপাড়া, মুখুয্যেপাড়া, ও সর্ব্বজ্ঞপাড়া প্রভৃতি তাহার প্রমাণ দিতেছে।

এক্ষণে লোকে যাহাকে খাঁ দীঘি কহে, পূর্ব্বে উহার নাম "রাজার দীঘি" ছিল। ঐ দীঘির মধ্যস্থলে জলের মধ্যে আজিও যে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী স্থান আছে, ঐ স্থানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে এক গ্রীষ্মাবাস জলবাটীকা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কোন কোন বৎসর গ্রীষ্মকালে ঐ জলবাটীকায় বাস করিতেন ও ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দক্ষিণা ও তৈজস-পত্রাদি দিতেন। রেভারেণ্ড লং বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র একবার গুপ্তিপাড়া হইতে বানর ও বানরী আনাইয়া তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে হালিসহর, উলা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় হাস্যরসিক ছিলেন। তিনি "রসসাগর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রসিকতার দুই একটী উদাহরণ আছে ; যথা—এক দিন প্রত্যূষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুক্তারামকে কহিলেন, "মুখুয্যে, গতরাত্রে আমি এক মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম, যেন আমি ক্ষীরের হ্রদে পড়িয়া গিয়াছি, ও তুমি বিষ্ঠার হ্রদে পড়িয়া গিয়াছ।" সপ্রতিভ মুক্তারাম উত্তর করিলেন—"মহারাজ, আমিও ঠিক ঐ স্বপ্নটী দেখিয়াছি। তবে পার্থক্য এই যে, আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, আমরা উভয়ে হ্রদদ্বয় হইতে উঠিয়া পরস্পরের গা চাটাচাটি করিতে লাগিলাম।" উপযুক্ত উত্তর পাইয়া নরপতি প্রীত হইলেন। আর এক দিন মহারাজ সংবাদ পাইলেন যে, উলার কোন দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা মুক্তারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুখুয্যে, তোমাদের ওখানে না কি বৌ বিক্রী হয়?" তদুত্তরে মুক্তারাম কহিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমাদের ওখানে বউ নিয়ে যাওয়া মাত্রই

বোধনের প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ

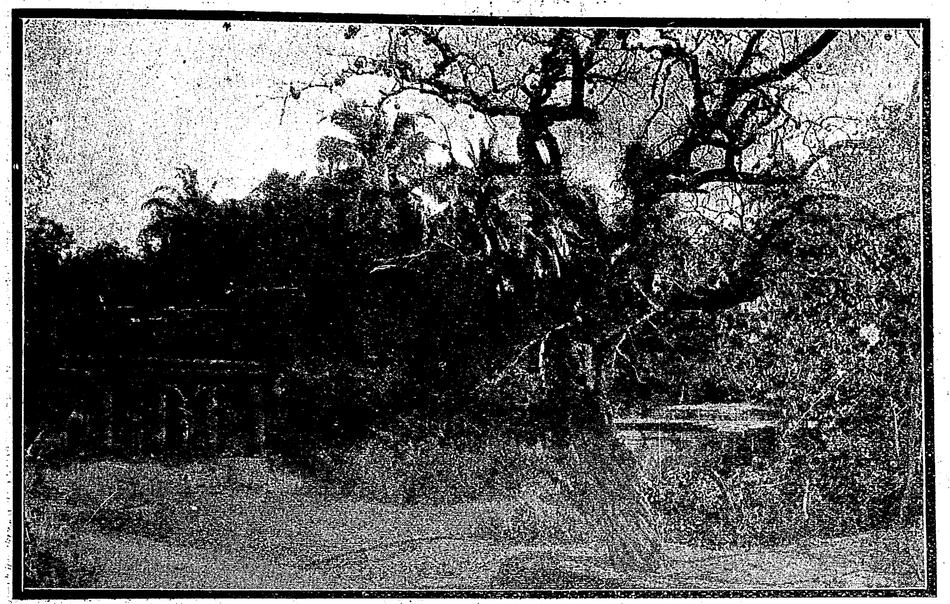

অনুমান ১৮৪৫ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় নদীয়ার মহারাজা ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী অপেক্ষা অন্য

মুস্তৌফীবাটীর সদর দরজা

কোন প্রবলতর জমিদার ছিল না। রাজসাহী, নদীয়া,

ও নীলকুঠী ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা শিরোমণী লর্ড হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের সময় রাজসাহী কালেক্টরীর দেওয়ান থাকা কালে প্রভূত বিষয়-বিভব অর্জ্জন করেন ও উলার পুরাতন বাটী ত্যাগ করিয়া উহার সন্নিকটে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর বিশাল দ্বিতল প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র ১২২৫ সাল হইতে ১২২৯ সালের মধ্যে ৺কালী, ৺দুর্গা, ৺রাধাকৃষ্ণ ও শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন। আজিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটী মন্দির বনজঙ্গলাবৃত হইয়া আছে। ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত দানশীল ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত হরিশপ্রাণ ও শ্যামলপ্রাণ তৎকালে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হরিশপ্রাণের প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ ভিটা ও যোড়া শিবমন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। শ্যামলপ্রাণ প্রথমে হানড়ার, তৎপরে সুখসাগরের ও অবশেষে নদীয়ার সদর আমীন ও সদর মুন্সেফ হইয়াছিলেন (১২৫১-১২৫৮ সাল)। ঈশ্বরচন্দ্রের কতকগুলি কুচক্রী মোসাহেব তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নানারূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও জালজুয়াচুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া ধ্বংসপথে লইয়া যায়। মুস্তৌফীদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উলার মাঝেরপাড়ার

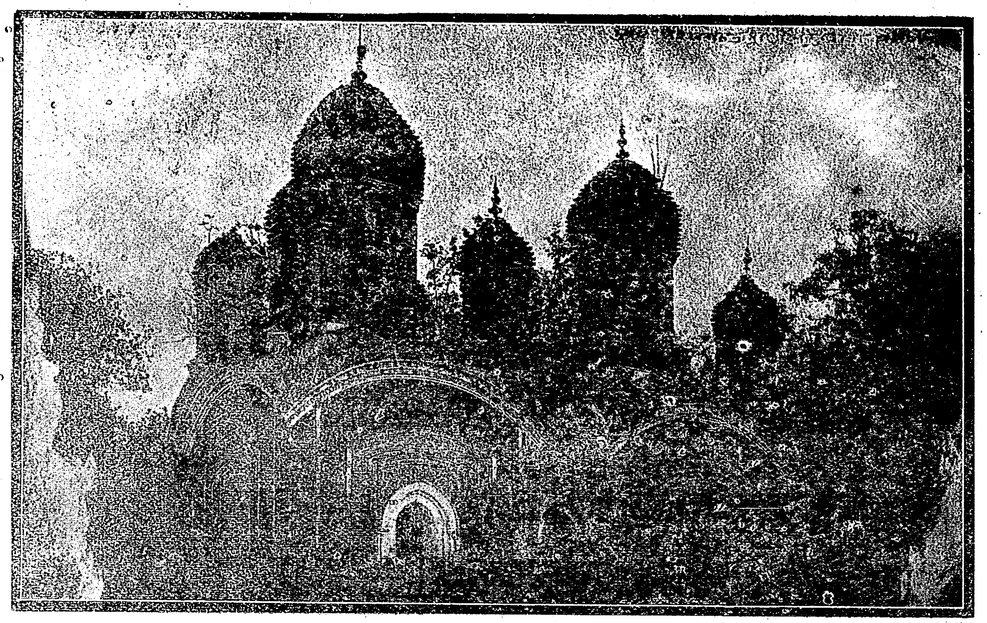

সোড়া শিবমন্দির

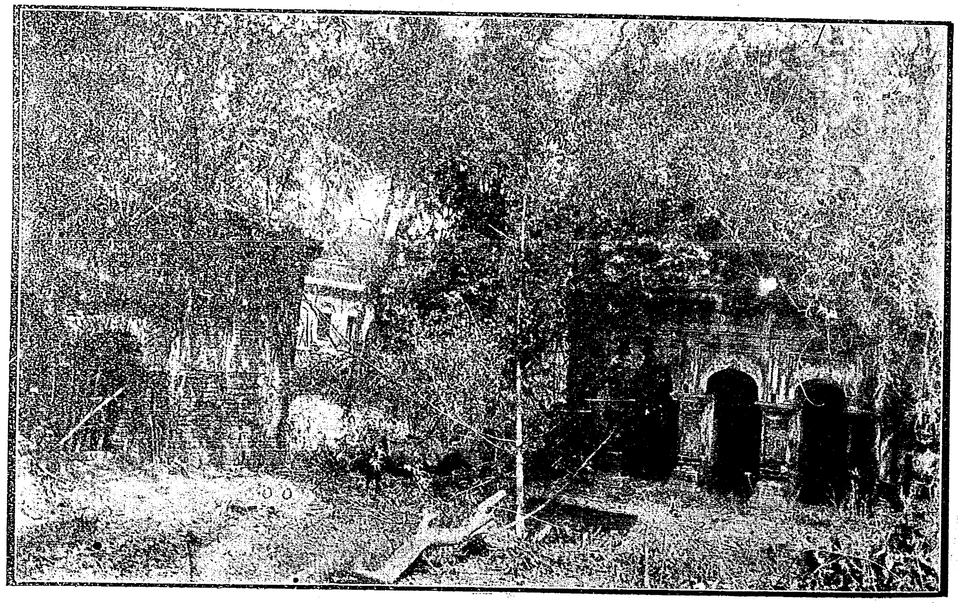

৺সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী

মুখোপাধ্যায় বংশের বামনদাস ও শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়গণ প্রবল হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বামনদাস ও শম্ভুনাথ গ্রামের জমিদার হইয়া পড়িলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। প্রবাদ এই যে, অনুমান ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহাদেব স্বীয় অধ্যবসায় বলে ও রাণাঘাটের স্বনামধন্য কৃষ্ণপান্তির আনুকূল্যে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া জমিদারীর পত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মুস্তৌফীদিগের সম্পত্তি অর্জ্জনের পর উহা আরও বর্দ্ধিত হইল। বামনদাস মহাদেবের পৌত্র। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধরণের লোক ছিলেন এবং অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণবদিগকে তিনি রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার্য্য ও বৃত্তি দিতেন। নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও উলার ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী সমাজ-সংস্কারের ও ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পরন্তু মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নবীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসার কল্পে সচেষ্ট ছিলেন। বামনদাস এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তথা সমাজ সংস্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক উলার রঘুনন্দন মুস্তৌফীকে নিষ্কর ভূমির দান পত্র।

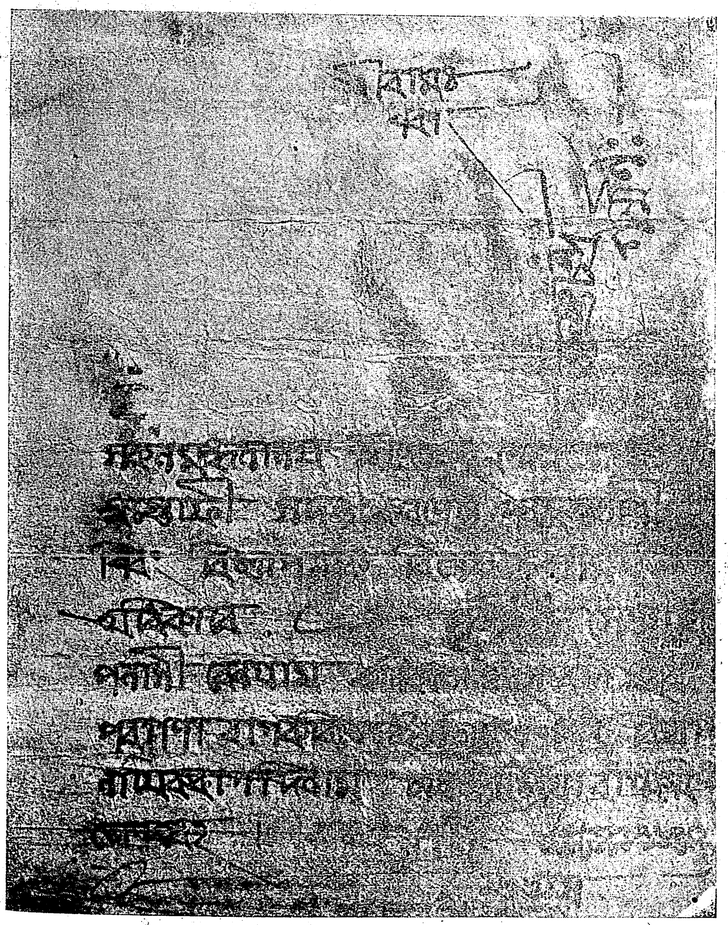

(চিত্রের অনুলিপি)

শ্রীরামঃ

শরণং—

সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত রঘুনন্দন মুস্তৌফী সদন্তঃকরণেষু পরম শুভাশীঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ—আমার অধিকারে ৺পূর্ব্বকুলে সেওয়ায় পলাসী বেলগ্রাম কলিকাতা ও হাবিলি সহর পরগণা বাগ করিতে জঙ্গল ভূমি ৩০ ত্রিশ বিঘা লায়েক দিলাম চারা আজিয়া বাগ করিয়া ভোগ করহ। রাজস্ব মাফ ইতি সন ১১৩৭ ১৬ ভাদ্র

আন্দোলনের এক জন নেতা ছিলেন। এই বংশের শম্ভুনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আশ্রিত-পালক ছিলেন। শম্ভুনাথ ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

কয়েকটি ভগ্ন স্তম্ভ

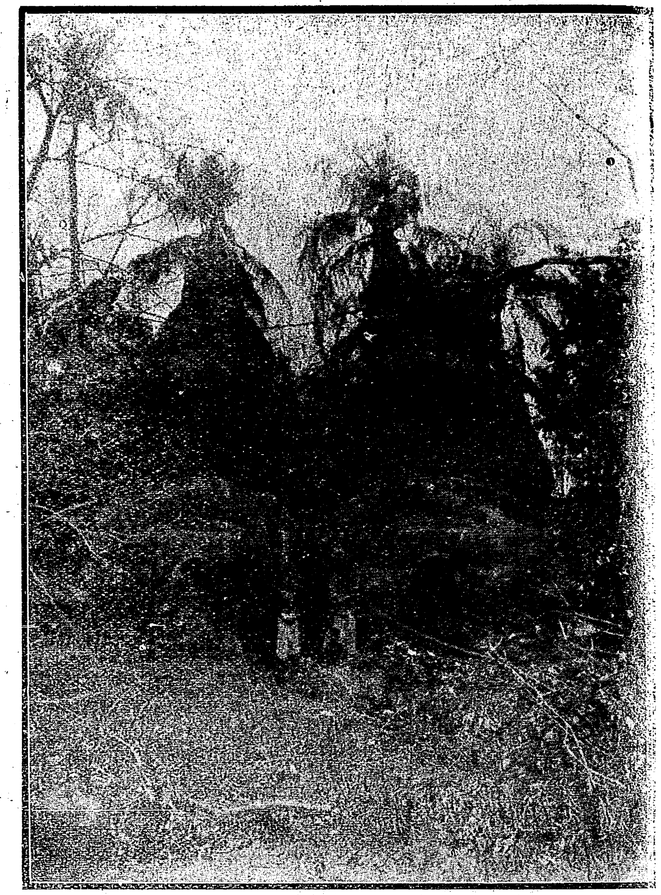

৺চাঁদরাণীর যোড়া শিবমন্দির

উলা অতি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, ১১৭৩ সালের ভীষণ মন্বন্তরের পূর্ব্বে উলায় ৭২০০০ লোকের বাস ছিল। এই মন্বন্তরে উলার বহু লোক ক্ষয় হয়। ১২৬৩ সালের ভাদ্র মাসে মহামারী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উলায় অন্যূন ৪০০০০ লোকের বাস ছিল, ইহা ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় প্রণীত একখানি পুস্তিকায় দেখা যায়। কিন্তু ডাঃ এলিয়ট তাঁহার ১৮৬৭ শালের রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে উলায় ১৮০০০এর অধিক লোক ছিল। ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। উলায় বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তিলি, সুবর্ণবণিক, তন্তুবায়, কাঁশারি, গোপপটুয়া, মালাকর, কুম্ভকার, মুচী, দুলে প্রভৃতির ও সামান্য মুসলমানের বাস ছিল। ১৪০০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহাদিগকে অপর স্থানের ব্রাহ্মণগণ ভয় করিত।

উলায় অনেক পাগল ছিল; তন্মধ্যে বিশ্বনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের মতিবাবু একবার পরীক্ষা করিবার জন্য বহু পাগল একত্র করিয়া প্রত্যেককে রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একমাত্র উলার বিশ্বনাথ ঐ রৌপ্য মুদ্রা কাক-বিষ্ঠা বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। লোকে কথায় বলে "উলুই পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, ও হালিসহরের তেঁদড়।" উলার লোক স্পষ্ট-বক্তা, প্রাণ-খোলা ও বক্তৃতাবাগীশ বলিয়া লোকে তাহাদিগকে "উলুই পাগল" কহিত। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে "ঈশে পাগলা" "শম্ভা পাগলা" প্রভৃতি নামে ডাকা হইত। উলার লোক অতিথি-সৎকারের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। উলায় অনেক "গাইয়ে" "বাজিয়ে" ও "খোরাকে" লোক ছিলেন।

৺রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এক মণ আহার করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "মুনকে রোঘো" বলিয়া ডাকিত। উলার মেয়েরা কৌলিন্যের গর্ব্ব করিত। কথায় বলে "উলোর মেয়ের কুলকুনুটি নদের মেয়ের খোঁপা। শান্তিপুরে হাত নাড়া দেয় গুপ্তিপাড়ার চোঁপা।"

গ্রামে অনেকগুলি টোল ও পাঠশালা ছিল। সর্ব্ব প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর বাটীতে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। তথায় চন্দননগরের ডিজার বারেট নামক একজন ফরাসী সাহেব বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বারেট উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ও জ্যোতিষী ছিলেন; তিনি ধুতি চাদর পরিয়া থাকিতেন; খিচুড়ী ও পরমান্নাদি খাইতে ভালবাসিতেন। তৎপরে মুস্তৌফীদিগের মঠ-বাটীতে আর একটী ইংরাজী স্কুল হইয়াছিল। তৎকালে বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺অক্ষয়কুমার সরকারের পিতা ৺গঙ্গাচরণ সরকার উলায় মুন্সেফ ছিলেন। মহামারীর বহুকাল পরে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল হইয়াছিল। উহা উঠিয়া গিয়া এক্ষণে মাইনর স্কুল হইয়াছে।

উলায় অনেকগুলি গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন।

৺রামেশ্বর মুস্তৌফীর নিকট সস্ত্রীক সনাতন দত্তের আত্মবিক্রয় পত্রে এইরূপ লেখা আছে—

(চিত্রের অনুলিপি)

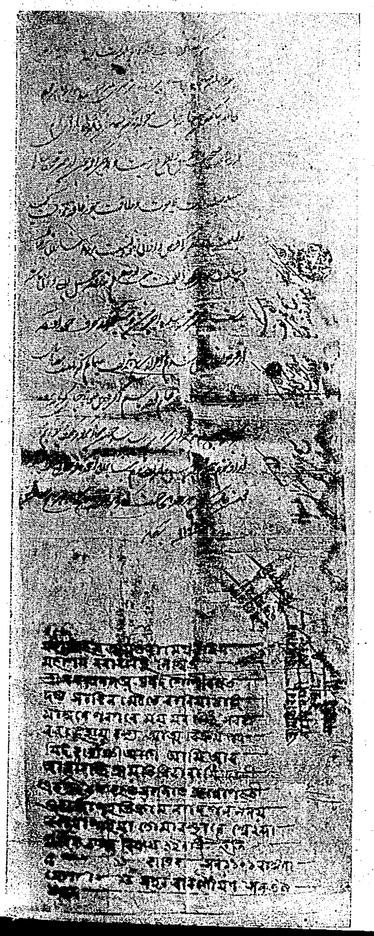

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র মহাশয় বরাবরেষু—লিখিতং শ্রীসনাতন দত্ত ওলদে শ্রীগোপীবল্লভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজাঙ্গ মামুলে পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চা আগে—আমি আর আমার স্ত্রি শ্রীমতি বিবানামিং দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জ্জোপহতি ক্রমে নগদ পন ৯ নয় রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিক্রয় হইলাম—ইতি—— তাং ১১ কার্ত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গলা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ল সন ৩৯ জলুষ————

উক্ত আত্মবিক্রয় পত্রের পশ্চাতে নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের নাম আছে :—

ইসাদ——

শ্রীরামদেব শর্ম্মা সাকিন উলা।	শ্রীবৃন্দাবন মিত্র মহারির পংসেধাবাদ।	শ্রীবৃন্দাবন দত্ত সাং খাজুরডিহি।
শ্রীঅনন্তরাম কর পং কোটালিপাড়।	শ্রীশিবচরণ মিত্র সাং খাজুরডিহি।	শ্রীধনঞ্জয় সেন সাং পংখণ্ড।
শ্রীভুজঙ্গরাম দাস সাং শান্তিপুর	শ্রীযুত নন্দকিশোর রায় চৌধুরী	শ্রীরাধাকান্ত দাস সাং পংব্রমপুর মোং গুপ্তপাড়া সমাপ্তে
শ্রীযুত রাজ রামকৃষ্ণ রায়	শ্রীরামেশ্বর বসু সমাপ্তে সাকিন নদীয়া	শ্রীরামচন্দ্র সাং শান্তিপুর
শ্রীরামকান্ত বসু নিবাস পরগণে আম্মুয়া।	শ্রীশ্রীবল্লভ ঘোষ সাকিন পরগণে ময়মনসিংহ মহরির কানস্তই—সদর	

এই দলিলের ফার্শি অংশে কাজি মহম্মদ আফজল খাঁর সহি ও মোহরাঙ্কিত আছে।

তাঁহাদের রচনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। গ্রন্থকারদিগের নাম—বিখ্যাত "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "তিথিদায়াদি দোষ" প্রণেতা ভূতনাথ সার্ব্বভৌম, "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য" "নরসিংহ" প্রভৃতি-প্রণেতা হেমচন্দ্র মিত্র, "শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত" "জীবধর্ম্ম" "বিজনগ্রাম" প্রভৃতি-প্রণেতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ, "অধিকার তত্ত্ব" "সৃষ্টি" "বেদান্তদর্শন" "পরলোকতত্ত্ব" প্রভৃতি-প্রণেতা চন্দ্রশেখর বসু, " "নাস্তিক বাদ"-প্রণেতা পরশুরাম মুস্তৌফী ও কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কেদারনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "আত্মজীবন চরিতে" ও "বিজন গ্রামে" উলা সম্বন্ধীয় যে সকল পুরাতন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য।

গ্রামে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন পট, অগ্নি-দগ্ধ মৃন্ময় মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় পিতল, কাঁসা ও তাম্রের তৈজসপত্র ও কড়ির

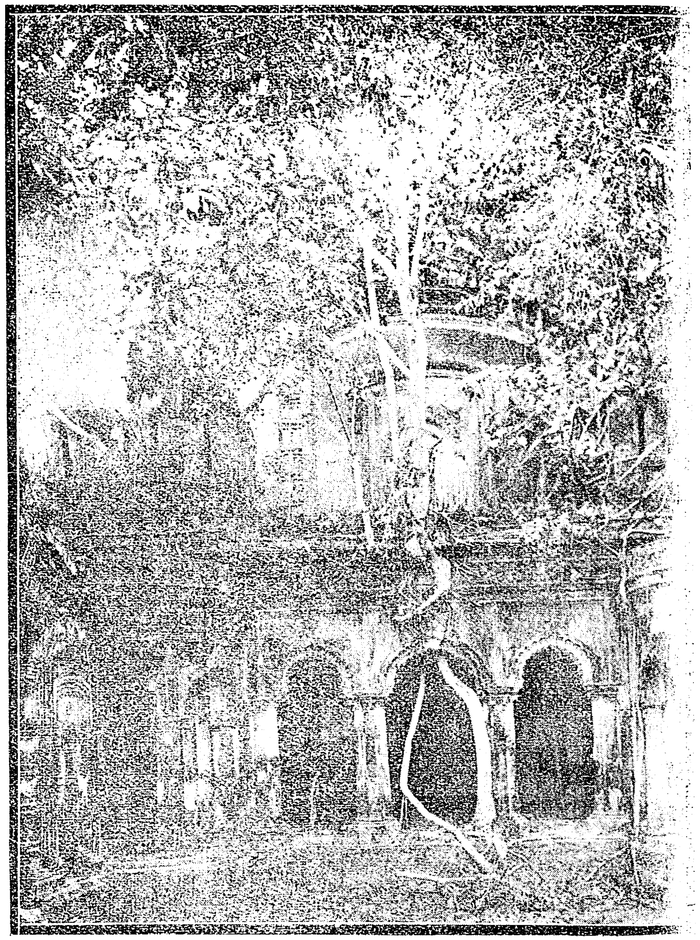

৺দুর্গা মন্দিরের সম্মুখ ভাগ

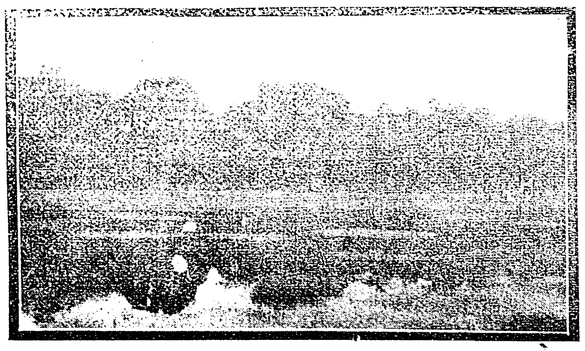

রাজার দীঘি বা খাঁ দীঘির পাড়

আলনা প্রভৃতি তাহার পরিচয় দিতেছে। মুস্তৌফী বাটীতে পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপের কাষ্ঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও নানা প্রকার মূর্ত্তি এবং বাঙ্গলা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট এক ষোড়া ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির-গাত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং দক্ষিণপাড়ার মিত্রদিগের মন্দির-গাত্রের কারুকার্য্য দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এই গ্রামের কর ও খাঁদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করগণ গন্ধবণিক জাতীয়,—তাঁহাদের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই।

তিলি জাতীয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কোন ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে মুদীর দোকান করিয়া ধন অর্জ্জন করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাদিগকে খাঁ উপাধি প্রদান করেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহাদের সুপারির কারবার ছিল ও বঙ্গের নানা স্থানে গদী ছিল।

১২৬৩ সালের (ইংরাজী ১৮৫৬ সালের) ভাদ্র মাসে হঠাৎ এক দিন কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল—গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে গোয়ালা পাড়ায় জ্বররূপী মহামারী জ্বর আসিয়া দেখা দিল। সুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর আসিত, ও কেহ ৩।৪ ঘণ্টা, কেহ বা ২।৪ দিন ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। প্রত্যহ শত শত লোক মরিতে লাগিল। ইহাকে তখন নূতন জ্বর কহিত। গৃহ মধ্যে শয্যার পার্শ্বে, খাল বিলের ধারে সৎকারাভাবে মৃতদেহ পড়িয়া পচিতে লাগিল ও শৃগাল, কুকুর, গৃধিনীর ভক্ষ্য হইল। অতি নিকট আত্মীয় স্বজন আপন রোগগ্রস্ত পরিজনকে বিজন গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইল, আর ফিরিল না। আনন্দ কোলাহল থামিল, বিদ্যাচর্চ্চা, শিল্প ও বাণিজ্য লুপ্ত হইল। দেবালয়ে পূজা বন্ধ হইল, দেবতা ধূলায় পড়িয়া রহিল। মন্দির-গাত্রে অশ্বত্থ বট জন্মিল, মন্দির মধ্যে চামচিকা বাদুড় ও মন্দির

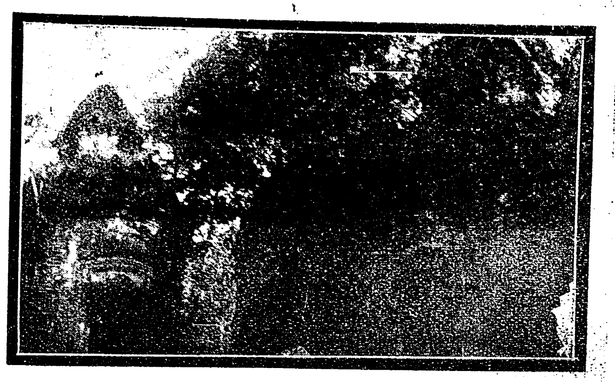

ঠাকুর বাড়ীর পশ্চিমের শিবমন্দির

চূড়ায় টিয়া পাখী বাসা বাঁধিল। গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল। যথায় সৌধশ্রেণী ছিল, তথায় দিবসে সর্প ও ব্যাঘ্র নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমাগত ৫।৬ বৎসর এই মহামারীর ধ্বংসলীলা প্রবল তেজে চলিয়া ক্রমে আপনা হইতে মন্দীভূত হইয়া আসিল ও অবশেষে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ভীষণ ঝড়ের পরে একেবারে লোপ পাইল। কিন্তু উলা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ও সেই হইতে যেন কোন যাদুমন্ত্রে সমস্ত প্রকৃতি নিদ্রিত ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মহামারী গেল বটে, কিন্তু সেই হইতে ম্যালেরিয়া গ্রামে বাসা বাঁধিল।

ডাক্তার এলিয়ট তাঁহার Epidemic Remittent and Intermittent fever নামক ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই মহামারী ১৮২৪।২৫ সালে বিখ্যাত সীতারাম রায়ের রাজধানী যশোর জেলার মহম্মদপুরে প্রথম দেখা দেয়। ক্রমে ঐ ব্যাধি নলডাঙ্গা ও ১৮৩১ সালে চাঁচড়া ও কসবা গ্রাম দুইটীকে ধ্বংস করে। তৎপরে এই ব্যাধি ১৮৩২ সালে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করে। এই মহামারী বৃহৎ জনপদ গদখালিতে একবার ১৮৩২ সালে, পুনরায় ১৮৪০ সালে দেখা দিয়া উহাকে ধ্বংস করে। ১৮৪৫।৪৬ সালে বনগ্রাম ও চাকদহের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহ ধ্বংস করিয়া ১৮৫০।৫১ সালে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া দেবগ্রাম মুড়াগাছা প্রভৃতি গ্রামকে উৎসন্ন দিয়া ১৮৫৬ সালের বর্ষাকালে উলায় আসিয়া দেখা দিল। তৎকালে উলা সেঁতসেঁতে স্থানে অবস্থিত ছিল। ছয় বৎসরের মহামারীতে অন্যূন ১০০০০ লোক মরিয়াছিল, ইহা এলিয়টের

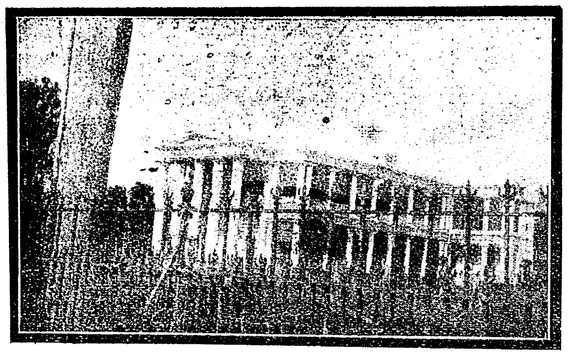

উলার ৺অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা

অভিমত। উলা হইতে এই ব্যাধি নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে ও হুগলী বারাসত জেলায় দেখা দেয়। পরবর্ত্তী তিন বৎসরে উলার উত্তরে বারাসত, বাদকুল্লা, শিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইয়া কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তের অদূরে দেখা দেয় ও ১৮৫৯-৬০ সালে গোবিন্দপুর, দিগনগর প্রভৃতি গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে ১৮৫৭ সালে চাকদহে দেখা দিয়া গঙ্গাতীরস্থ জনপদ সমূহ ধ্বংস করিতে করিতে ১৮৫৯ সালে কাঁচড়াপাড়ায় দেখা দেয়। তৎপরে এই ব্যাধি ১৮৬০ সালে বারাসত, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় ছড়াইয়া পড়ে। ই, বি, রেল লাইন মহামারীর জন্য কতটা দায়ী তাহা বলা কঠিন; কারণ, উহা ১৮৬২ সালে কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত প্রথম খোলা হয়।

মহামারী হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করিতে কেহই কিছু করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট তৎকালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। Report on Charitable Dispensaries পাঠে জানা যায় যে, মহামারী শান্তির পরে ১৮৬১ সালের অক্টোবর মাসে শুধু জ্বর চিকিৎসার জন্য উলার ডাক্তারখানা অস্থায়ী-ভাবে খোলা হয়। পরে ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী উহা স্থায়ী হয়। উলার মিউনিসিপালিটী ১৮৬৯ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু মহামারীর পর উলায় যে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়াছে, ডাক্তার-খানা বা মিউনিসিপালিটী কেহই তাহাকে উৎ-পাটিত করিতে পারে নাই। গ্রামের মধ্যে ২২ মাইল সরকারি রাস্তা আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাসে লোক সংখ্যা মাত্র ২৩০৫ জন দেখা যায়। ছেলে পিলে প্রায় বাঁচে না। গত ১১ বৎসরের জন্ম মৃত্যু তালিকা হইতে জানা যায় যে, গড়ে প্রতি বৎসর জন্মের সংখ্যা ৫২ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৭২। কেবল ম্যালেরিয়া নহে, পরন্তু ইনফ্লুএঞ্জা, নিউমোনিয়া ও কালাজ্বর গ্রামে বাসা বাঁধিতেছে। মিউনিসিপালিটী হইতে স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ কোন চেষ্টা নাই,—উহা শোভার ও বড়লোকের সখ মিটাইবার জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এরূপ ক্ষেত্রে গ্রামের অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা দেখিয়া, কতিপয় শিক্ষিত ও উৎসাহী গ্রামবাসী ভদ্রলোকের চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে গ্রামে একটী "পল্লীমণ্ডলী" সৃষ্টি হইয়াছে। এই মণ্ডলী ডাঃ রসের নির্দ্দেশ মত জলে কেরোসিন ঢালিয়া, গ্রামবাসীকে কুইনিনের উপকারিতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি বুঝাইয়া দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। বনজঙ্গল পরিষ্কার ও ডোবা প্রভৃতি বুজাইবার জন্য মণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন। মণ্ডলী গ্রামবাসী ও সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছেন। মণ্ডলীর কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উলা গ্রাম এত বৃহৎ যে, ইহা একবার পদব্রজে প্রদক্ষিণ করিতে ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

মুখোপাধ্যায় বাটীর সিংহদ্বার

গ্রামটী বন-জঙ্গল, অসংখ্য ডোবা-পুকুর ও ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপে পূর্ণ; কিন্তু লোক সংখ্যা অতি অল্প। ধনী নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সকল গ্রামবাসীর ও সরকারের সাহায্য ব্যতীত এই অভিশপ্ত গ্রামের উদ্ধার ...

থাকো

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের। তখন কলিকাতা হইতে গঙ্গার উভয় তীরস্থ দশ পনের মাইলের মধ্যে গ্রামগুলি ক্রমেই "কেরাণী-গ্রাম" হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ভদ্রলোকের, ছেলে হইলেই, সোণার দোত-কলমের আশীর্ব্বাদ পাইত, এবং হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই "হাত পাকাবার" উপদেশ ও তাগিদ্ চলিত। এই হাতের লেখাই "ভাতের" উপায়—এই কথাটাই যখন তখন শুনিতে হইত।

বাঙ্গলা পড়ায় কোন লাভই নাই, তাই তাড়াতাড়ি বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া আমিও ইংরাজী ইস্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছি।

ঠিক্ এই সময় বঙ্কিম বাবু তাঁহার নব-প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে" লিখিলেন—"বাঙ্গালীর বাহুবল"। (এ গৌরবের কথাটা আমাদের সময় পর্য্যন্ত সম্মান পাইয়া আসিয়াছে।) তাই বোধ হয় বাবার থর-দৃষ্টি (এখনকার রুজ অনুসারে angle of vision) ছিল, ছেলেদের মাথার দিকে নয়,—হাতের উপর! কাজেই নিত্য ছয়-তক্তা ইংরাজী মক্স করিতেই হইত; পড়ার কাজটা পশ্চাতেই পড়িয়া যাইত।

সেই সবে লেনি সাহেবের "গ্রামার" ধরিয়াছি, এবং পণ্ডিত মাষ্টার "মার" ধরিয়াছেন। এই দ্বিবিধ মারের চোটে আমার ঝোঁকটা পিতৃ-আজ্ঞা পালনের দিকেই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্বপক্ষেও পাইয়াছিলাম—"পিতরি প্রীতিমা-পন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"; এবং সাহেবরা যে দেবতা নহেন, এ ধারণা ইতরভদ্র স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তখন ছিল না বলিলেই হয়। প্রীত পিতার আশীর্ব্বাদে আমার হাতের অক্ষর ধরিতে বিলম্ব হয় নাই।

সস্তাগণ্ডা থাকায় বিশ পঁচিশ টাকা বেতনই তখন যথেষ্ট বলিয়া মেয়ে-পুরুষের সমর্থন পাইত, 'কারণ ও জিনিসটির বাড় "কেরমে কেরমে।"' তাই ছেলেকে প্রথম চাকরিতে পাঠাইবার দিন মা একাগ্র কামনায় "মা মঙ্গলচণ্ডীর" ঘট স্থাপনা করিতেন। ছেলে তাহা প্রণামান্তে, তুলসী তলায় প্রণাম সারিয়া, পিতামাতা ও গুরুজনের পদধূলি এবং দধির ফোঁটা লইয়া, গৃহ-দেবতা নারায়ণের তুলসী কাণে গুঁজিয়া শত দুর্গানামের মধ্যে রওনা হইত। মা তখন বাষ্পাকুল নেত্রে হরির-তলায় প্রণাম করিয়া সওয়া-পাঁচ পয়সার সিন্নি মানসিক করিতেন। ছেলেরও জন্ম সার্থক হইত, মা'ও রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিতা হইতেন। ছেলেকে চাকুরিতে এই দীক্ষা দেওয়াটা দশবিধ সংস্কারের কোনটা অপেক্ষাই ছোট ছিল না।

তখন এই সম্মানের কাজটিতে ঝুঁকিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। সম্মানের কাজ ভাবিবার কয়েকটি কারণ ছিল,—চাকুরী লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের নিকট 'বাবু' আখ্যাটি লাভ হইত; তাহারা বুঝিয়া লইত—বিদ্যার জাহাজ না হইলে আর ইংরাজী দপ্তরে কাজ হয় নাই। ধারে জিনিস যোগাইতে মুদীর আপত্তি অন্তর্হিত হইত। চাকুরির সহিত চাপকানের নিকট সম্বন্ধ ঘটায়, ধোপার সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত; আর এই দ্বিবিধ সংযোগে পরিধেয়টা সম্মানসূচক দাঁড়াইয়া মনটাকেও উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিত। অশিক্ষিতেরা আপদে-বিপদে বাবুর নিকটা সলা-পরামর্শ লইতেও আসিত।

আবার অসুবিধাও ছিল অনেক; তবে তাহার অধিকাংশই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভোগ করিতেন।

আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি গঙ্গার পূর্ব্বকূলে, কলিকাতা হইতে ছ' মাইল উত্তরে। কুটির পান্‌সি ছিল কুটিওলা বা কেরাণীবাবুদের আপিস যাতায়াতের একমাত্র যান। তাহা দুই ঘণ্টায় কলিকাতায় পৌঁছিত, জোয়ার কোটালে আরো অধিক সময় লইত। কাজেই কুটিওলাকে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, আটটার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া রওনা হইতে হইত।

এই প্রস্তুত হওয়াটির পশ্চাতে থাকিত বাটীর স্ত্রীলোক-দের রাত থাকিতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া এবং

গৃহদেবতা নারায়ণের "পূজার-জো" সারিয়া "কুটির-ভাত" চড়ানো। সেই গতিশীল অবস্থাতেই তাঁহাদের আহ্নিক, জপ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি, বিষ্ণুর সহস্রনাম, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিত। বৌ-ঝিরা ইতিমধ্যে গৃহাদি মার্জ্জন, বাসন মাজা, শয্যা-সঙ্কোচ সারিয়া, গা-ধুইয়া কুটিওলার জন্য পান সাজা, আহারের স্থান প্রস্তুত, কুটির কাপড় গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি কার্য্যে, ও কর্ত্রীঠাকুরাণীর ফাইফরমাজ খাটিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ফল কথা, রাত্রি চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে যেন একটা নিত্য নিয়মিত চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট ছিল; এবং তাহা শেষ হইত কুটিওলাকে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বিদায় দিবার পর।

এই উদ্‌যোগ পর্ব্বের মধ্যে কেরাণী বাবুর নিজের যে কোন কাজ ছিল না তাহা নহে। তাঁহাকেও পাঁচটায় উঠিয়া ছয়টার মধ্যে স্নানাদি ও পুষ্প সংগ্রহ শেষ করিয়া পরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ সারিয়া, আহারে বসিতে হইত।

যে সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাতা বা অন্য কেহ বর্ষিয়সী আত্মীয়া, আর বধূ, এবং বধূর কোলে কাচ্চাবাচ্চা, তাঁহাদের পক্ষে এই নিত্যকর্ম্মটি নিতান্ত সহজ-সাধ্য ছিল না। বোধ করি তাঁহাদের জন্যই আমাদের গ্রামে একটি 'থাকো'র আবির্ভাব হয়।

আমাদের কথাটা সেই 'থাকো'কে লইয়া।

২

থাকোর বয়স বা রূপের সহিত আমাদের এ প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কই নাই।

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ী ঘুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না যে, তাহা কাহারো লক্ষ্যের বস্তু হয়।

পিসি, মাসী, খুড়ি প্রভৃতি সম্বোধনেই স্ত্রীলোকেরা থাকোর সহিত কথা কহিতেন। কোন কোন বর্ষিয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা', কেহবা 'থাকো' বলিতেন। বধূরা মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সম্বোধন চির-প্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারো অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণকন্যা কৈবর্ত্ত-কন্যাকে মাসীমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণে মুসলমানে খুড়ো জ্যেঠা সম্বোধন, ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন; ইহাতেই ছিল পল্লীর শক্তি ও সুখ।

থাকো ছিল একটু ঢ্যাঙ্গা; রোগাও নয়, মোটা ত নয়ই। গৌরাঙ্গী, প্রশস্ত সুস্পষ্ট সিন্দুররেখা-সমুজ্জ্বল উন্নত ললাট। কপাল-ঢাকা অবগুণ্ঠন সর্ব্বদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্‌টকে সোণার নথ। কাণে বা গলায় কি ছিল-না-ছিল তাহা স্ত্রীলোকেরাই দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাখা, নো, আর দুগাছি মোটা বালা। থাকোকে কখনো ধোপদস্ত ধপ্‌ধপে কাপড় পরিতে দেখি নাই, মলিন বাসেও দেখি নাই। টক্‌টকে লালপেড়ে আড়-ময়লা সাড়ী পরিতেই দেখিতাম।

কখনো কোন দিন থাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছে,—বরাবর এই স্ত্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখচি,—মুখে কথা নাই, খাটুনিরও বিরাম নাই। বিরক্তিও দেখিনি, ব'সে গল্প করতেও শুনিনি; খুব সামর্থ্য বটে! একা বি বাড়ীর তোলা-পাট সাম্‌লে বেড়ায় অথচ ভদ্রঘরে মেয়েদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মেয়েদের গয়না পরার সাধ, ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ এর বোধ হয় খুব প্রবল, তাই এত খাট্‌তে পারে। বাড়ী-পিছু আট আনা করে পেলেও মাসে ১০।১২ টাকা হয়। ইত্যাদি।

থাকো এবাড়ী থেকে ওবাড়ী এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুখের একটা ঠিক্ ছাপ্ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম; শান্ত গাম্ভীর্য্যের উপর চক্ষু দুইটিতে যেন প্রসন্নতা ও করুণা মাখানো! কই—এত দ্রুত যাতায়াতের মধ্যে চাঞ্চল্য কোথায়!

আমাদের "অতশত ভাবিবার, বুঝিবার, বিশ্লেষণ করিবার বয়স তখন নয়। তরুণ চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিন্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়,—বিশেষ ছোটলোক সম্বন্ধে। তখনি সে কথা মন হইতে সরিয়া গেল। আমাদের তখন কাজ কত। লেখাপড়া ছাড়া আরো কত নূতন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে ও হইবার জন্য উঁকি মারিতেছে। জিমনাষ্টিকের আখড়া খোলা হইয়াছে। বামাচরণ কেয়া ভল্ট খায়, কার্ত্তিক ইয়া পিকক হয়। ট্রাপিজের top-boyকে বা বাচ্চা চূড়ামণিকে তালিম

চলিয়াছে—শ্যামবাবু শনিবার শনিবার কলিকাতা হইতে আসিয়া শিক্ষা দেন, আমাদের 'গুল' টিপিয়া দেখেন; উৎসাহ উন্মাদনার সীমা নাই। আবার মুকুয্যেদের নরসিং বাবু গ্রামে এলবার্ট ফ্যাসানের চুল ছাঁটা ও চুল ফেরানো আমদানী করিয়া যুবকদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন,—চিত্ত তাহাতেও পড়িয়া রহিয়াছে,—সময়ে অসময়ে নিজের নিজের মাথায় তাহার মক্স চলিতেছে। তাহার উপর খগেনবাবু রূপার পঁইচে পরা ক্লারিওনেট আনিয়া তরুণদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। বাঁশীর টান্ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, যমুনা তীরের নমুনা স্মরণীয়। ফল কথা—কেরাণীদের নিত্য কলিকাতায় যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামে নব নব ভাবের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়া,—অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সখ্য বন্ধন হইতে ক্রমেই আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছিল এবং তাহারা "ছোটলোক" আখ্যা পাইতেছিল। এ অবস্থায় ঝি-দাসীর কথা তরুণদের চিন্তা চর্চ্চার বিষয় হইতে পারে না, আর এত কাজের ভিড়ে আমাদের সময়ই বা কোথায়!

* * * *

বিন্দুবাসিনী-তলার "রাম বন্দ্যো" আমার চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের বড় ছিলেন। অমন অমায়িক, সহৃদয়, মিষ্টভাষী যুবক দেখা যায় না। ওই বয়সেই তাঁর প্রকৃত কবি-প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। বাগবাজারের নন্দবোসের বাড়ী "হাপ্ আখড়াই" হইবে, এই সংবাদ লইয়া তিনি এক দিন সকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শেষ বলিলেন—"তোমার এ বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাই জানাতে এলুম;—নিশ্চয়ই যাওয়া চাই।" এত বড় Compliment ও এমন দুর্ল্লভ জিনিস ছাড়া যায় না,—আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। তাহার পর পূর্ব্বেকার "কবি" ও হাফ-আখড়াই সম্বন্ধে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত আলোচনা চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় থাকো এক বাড়ীর কাজ সারিয়া অন্য বাড়ী দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। আমাদের অত বড় প্রিয় প্রসঙ্গটা সহসা থামিয়া গেল। রামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"দিনের আলেয়ার মত এ স্ত্রীলোকটি কে-হ্যা?"

হাসিয়া বলিলাম—"আলেয়া মানে কি? সকালে বাড়ী বাড়ী তোলাপাট করে বেড়ায়।"

রামবাবু আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন—"বিশ্বাস হয় না,—তুমি জান না।"

বলিলাম—"পাঁচ-সাত বচর প্রত্যহই দেখে আসছি—ওই এক ভাব, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিনি,—কারো না কারো কচি ছেলে কোলে আছে, আর ঐরূপ দ্রুত যাওয়া আসা;—অনেক বাড়ীর কাজ মাথায়—"

রামবাবু বাধা দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত ভাবে বলিলেন—"বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম—"কেন বলুন দিকি! আর আলেয়া বল্লেন কেন?"

রামবাবু যেন আপনা আপনি মুগ্ধভাবে বলিয়া গেলেন—"ঘোমটার আড়ালে—বর্ণে স্বর্ণে সিন্দুরে হঠাৎ যেন আঁচল ঢাকা প্রদীপ দেখলুম,—বাঃ।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"একজন সাধারণ প্রৌঢ়াকে দেখেও আপনাদের এত ভাব আসে!"

রামবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—"দেখ,—সোণার মূল্যটা তার মালিকের জাত বা কর্ম্ম ধরে কম বেশী হয় কি? যাক্—আমি ভাবচি ঐ অবগুণ্ঠনটুকুর কথা,—ওইটিই হিন্দুনারীর reflector! ঐ আবরণ ঢাকা প্রকাশেই মাধুর্য্য! ভগবান ব্রহ্মাণ্ডটা নিজের আবরণ দিয়ে ঢেকে না রাখলে, কবে শুকিয়ে চুঁয়ে পুড়ে বদরং আর কদাকার হয়ে যেত,—এমন তাজা, এমন সবুজ, এমন সরস থাকত না।"

শুনিয়া আমি ত' অবাক! কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কবি বা হাফ আখড়ায়ের কথা আর জমিল না। রামবাবু একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"তুমি একটু খোঁজ নিও,—আজ চল্লুম,—শনিবার এক সঙ্গেই যাব।"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"ওর আর খোঁজ নেবো কি,—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া—"আচ্ছা—সে আমিই নেবো; তোমার বড় কাছে—তুমি পারবে না—" বলিতে বলিতে রামবাবু চলিয়া গেলেন।

ভাবিতে লাগিলাম—কবি মানে পাগল না কি!

* * * * *

যাহা হউক,—মানুষের মন কোন একটা বিষয়

গ্রহণ না করতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না। প্রায়ই চোখে পড়িত—থাকো এক ঘটি দুধ লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ফিরিতেছে; কাহারো কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে; কারুর কোলের ছেলে থাকোর কোলে! কোন দিন প্রত্যুষে গামছায় তিন চারিটা ইলিস মাছ লইয়া তিন চার বাড়ী ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোথাও বাটনা বাটিতেছে। কোন বাড়ী এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দিল; কাহারো বাড়ী পান সাজিতেছে। এমন ত্বরিত কর্ম্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র কি ইতর কাহারো বাড়ী ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের দিকে এত বেশী নজর ছিল যে, মাথার কাপড় অসংযত হইতে, বা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কখন দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত—থাকোর এই তোলাপাট প্রধানতঃ গরীব বা পরিজন-বিরল মধ্যবিত্ত কুটিওলা বাবুদের বাড়ীতেই ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে তাহাকে এ কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই। বড় লোকের মধ্যে তাহাকে কেবল নিয়োগীদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি;—সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না—সুতরাং কাজের জন্য নিশ্চয়ই নয়।

৩

গ্রামের তিন চার ঘর বড়লোকদের মধ্যে নিয়োগীরা ছিলেন অন্যতম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক পুরুষে হালি বড়মানুষ। তাহার মূলে ছিল—রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফ্যালাও কারবার,—জাহাজী চালান। তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক সমাগম, কর্ম্মচাঞ্চল্য, বাজার, বসতি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে নবজীবনের সাড়া আনিয়া দিতেছিল।

নিয়োগী-কর্ত্তা লেখা পড়া সামান্যই জানিতেন; কর্ম্মবুদ্ধি শ্রম ও অধ্যবসায় বলেই তাঁহার বৈভব। সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ী-জুড়ি-দাস-দাসী দ্বারবান, বহু পরিজন, বারোমাসে তের পার্ব্বণ, দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কলাপ, দান-দক্ষিণা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ভোজ, গরীব দুখীকে সাহায্য করা সবই তাঁহার ছিল; আর ছিল—এক পুত্র ও একটি নাতী। তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম, সামাজিক বিদায়, বস্ত্র বিতরণ, কাঙ্গালী-ভোজন, দুর্গা-প্রতিমা, প্রতিমার সাজ, এ সবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল,—কোথাও কুণ্ঠার চিহ্ন মাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"বাগবাজারের পোলের এ'পারে ইদানীং আর এরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ছিল—নিয়োগী বাড়ীর শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মী পূজা। সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমা, সাজ, সমারোহ, আয়োজন, উপকরণ, ভোজ, আর কোথাও দেখি নাই। তাহার ব্যয় দুর্গোৎসবের ব্যয়ের তুল্য বা সমধিক ছিল! এই উপলক্ষে—রাত্রি-জাগরণ-চ্ছলে যে আনন্দোৎসবের অয়োজন হইত, তাহারও বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের লোকে যে বৎসর যাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভাগ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সখের কি পেশাদার অপেরা, থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি দেখিবার শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের সর্ব্বসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া—ধরণীঠাকুরের কথকতা, জগা স্যাকরার চণ্ডী, প্রভৃতি বিশেষ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগুলিও মধ্যে মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্ত-পুষ্টি সহজেই হইত।

এ সব ছিল নিয়োগী মহাশয়ের—"ছিলর" দিক;—ছিল না কেবল—বনিয়াদী বুদ্ধি ঢাকা ব্যয়-বর্জ্জনের পাকা হিসিবি-চাল, ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরূপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক না থাকুক—কুড়ে আর কুপোষ্যের অভাব থাকে না; তাঁরও কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল। তিনি এক দিন আহারের সময় একটি বিড়ালকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাছ খাওয়ায়, তাহাকে গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"আমার এ শুভাকাঙ্ক্ষী উপকারীটিকে? পেটের জ্বালায় ভদ্রলোকেও চুরী করে

খেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙতে যাবে কেন? সকলে জেনে রেখো—আমি মুখ্খু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি মুড়কি বেচেছি। এ ধন দৌলত 'মা'র, আমি মজুর;—কার ভাগ্যে এ সব আসে আর কাদের জন্যে তিনি দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়ীতে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই। যত দিন নেউকীর এক মুটো জুটবে—তাদেরও জুটবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমাকে একথা কউ শোনায়নি—"

গৃহিণীকে কথাটা সাঙ্গ করিতে না দিয়াই কর্ত্তা বলিলেন—"তোমাকে বাড়ীর কথা শুনিয়ে ফল নেই বলেই শোনায়নি!"

খোঁচাটার অর্থ বুঝিতে কর্ত্রীর বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন—"জগতে শুধু ত ঘর বলে জিনিসটিই নেই,—"ার" বলে তার চেয়ে ঢের বড় জিনিসটিও রয়েছে;—দু'জনকেই কি ঘর নিয়ে থাকতে হবে! এই যে কাল রাত্তিরে বুধুয়া সইসের বউ, আহা কি ব্যথাটা খেয়েই নিয়েলো; তোমাকে কেউ তা শুনিয়েছে কি, না তোমাকে তার সেবার ব্যবস্থার ভার নিতে হয়েছে। এখানে তার কে আছে বল' ত'?"

কর্ত্তা সাফাই হিসেবে একটা ভব্য ধরণের জবাব দিবেন ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন—"স্ত্রীলোকের খোঁজ—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোক হওয়াটা ত কারুর অপরাধ হতে পারে না, তারও ত আপদ বিপদ, দুখ কষ্ট আছে; তাকেও ত' কারুর দেখা চাই! আর তোমার শঙ্করাই (নির্ব্বাসিত বিড়ালটি) কি—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিলেন,—তাঁহার চক্ষে হাসির আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"এখন দু'টো পান পাব কি? আজ আর কলকেতা যাওয়া হ'ল না, শঙ্করীকে খুঁজে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গৃহিণী পানের ডিপে কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন—"বেলা তিনটের পর কিছু খেতে হবে কিন্তু। শঙ্করী ত' এখন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক,—তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না গয়লা-বউ সাত দেশ বেড়ায়—শঙ্করীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।"

কর্ত্তা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন—"কিন্তু আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন—"হাঁ—বুধুয়ার বৌয়ের আর কোন কষ্ট নেই ত? বুধুয়া বেটা কি পাজি গো,—আমি বরাবর জানতুম ভালমানুষ,—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ঈষৎ হাস্য ও কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে—"তুমি চুপ করো ত'" বলিয়াই দ্রুত সরিয়া গেলেন! কর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিলেন ও চাড়ুয্যে মশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাড়ুয্যে মশাই ছিলেন কর্ত্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিয়োগী-বাড়ীর সর্ব্বত্রই তাঁর অবাধ গতি ছিল; তাঁহার নিকট কর্ত্তার কিছুই গোপন ছিল না। উভয়ের মধ্যে একত্র বসা-দাঁড়ানো, হাস্যালাপ, সলা-পরামর্শ, নিত্যই ছিল। নিয়োগী-বাড়ী ও নিয়োগী-কর্ত্তা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই যথেষ্ট!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বড়লোকদের বাড়ীর মধ্যে কেবল এই নিয়োগী-বাড়ীতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিয়াছি। কর্ত্তা ও চাড়ুয্যে মশাই সদর বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কখনো কখনো এক আধ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইঙ্গিতের জবাব দিতেও শুনিয়াছি।

এক দিন থাকোকে নিয়োগী বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্ত্তা কথাচ্ছলে চাড়ুয্যেকে বলিলেন—"ছাখ চাড়ুয্যে—ভগবান সব সুখ দিলেও কপালে না থাকলে—ক'টা সুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে!" কথাটা শেষ না হইতেই থাকো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল;—"কারো সুখের হিসেব রাখবার মুহুরিগিরী না ক'রে নিজেরাই সেটা ভোগ করুন না।" বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল। চাড়ুয্যে হাসিয়া বলিলেন—"ওকে জিততে পারবে না।"

এক দিন কাণে আসিল,—নিয়োগী মশাই বলিতেছেন—আর ঠিক্ সেই সময় থাকো নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছে,—"লোকে বলে লিখে লিখে হাত পাকে, ওটা কথার কথা;

বরং বাটনা বেটে বেটে হাত পাকে, কি সুন্দর রং ধরে, কি সুশ্রীই দেখায়! নয়-কি চাড়ুয্যে!"

চাড়ুয্যেকে কিছু বলিতে হইল না!—"তা হোক্, আমার ত আর ঘটকির ভয় নেই" বলিতে বলিতে থাকো ভিতরে চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামে এরূপ রহস্যাদি গ্রাম সম্পর্ক বিশেষে দূষনীয় ত ছিলই না, বরং সহজ আনন্দ ও প্রীতির পরিচায়ক ছিল।

* * * * *

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছিল। সদরেই কর্ত্তা ও চাড়ুয্যে মশাইকে দেখিয়া, কর্ত্তার কোলে শঙ্করীকে দিয়া, তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অন্দরে গিয়া ঢুকিল। কর্ত্তা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অল্পই ছিল। সামলাইয়া বলিলেন—"এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই,—এরাই একাধারে জগতের সোণার কাটি রূপোর কাটি!"

চাড়ুয্যে বলিলেন—"ও আর আমাকে বোল্‌চ কি! ওঁরা ভানুমতীর সহোদরা—চক্ষু দুটির একটি অনুবীক্ষণ একটি দূরবীক্ষণ—ছাতে উঠলেই observatory (মান-মন্দির) ঘাটে গেলেই News paper (সংবাদ পত্র)—"

কথা শেষ না হইতেই বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়িল। সেথায় উভয়কেই জলযোগে বসিতে হইল। শঙ্করীও একবাটী দুধে মনোযোগ দিল।

৪

দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়োগী-বাড়ীর সাজসজ্জা তেমনি আছে, কারণ, চার দিন পরেই শ্রীশ্রী-কোজাগার লক্ষ্মীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যয়, আনন্দ, কোনটিই দুর্গোৎসব অপেক্ষা কম নহে। প্রকৃত কথা—নিয়োগী-বাড়ীর দুর্গোৎসব যেন কোজাগর পূর্ণিমান্তে প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ করায়, সে-বৎসর তাঁহার দ্বারা লক্ষ্মীপূজা আর সম্ভব নহে।

নিয়োগী মহাশয় এই ঘটনায় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতে ভয় পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরও নাই। পুরোহিত ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব,—সুপণ্ডিত—"

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই চিন্তাকুল কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এ মুখ্‌খুর বাড়ীর কাজে "টনি সাহেবকে" ত' (প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্‌সিপল) দরকার নেই—পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোহিত বলিলেন—"বেশ—তাই হবে; কালীঘাটের তন্ত্ররত্ন মশাইকে ঠিক করে আসছি। তিনি নিত্য জপ ক'রে সন্ধ্যার পর একটু দুধ খান।"

কর্ত্তা আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"থামুন, থামুন,—লক্ষ্মীপূজো ত "গেরোন্‌" নয় যে আমার পূর্ণাভিষেকের জন্যে তান্ত্রিক জাপক চাই। কারুর সার্টিফিকেট আমায় শোনাতে হবে না। দুধ খেয়ে শঙ্করীও থাকতে পারে।"

চাড়ুয্যে মশাই পুরোহিত ঠাকুরকে ইসারায় চুপ করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন,—"অত-শতয় কাজ নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে।"

কর্ত্তার মনটা আজ খুবই খারাপ ছিল, তিনি চিরসহচর চাড়ুয্যের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"তুমিও গোল্লায় গেছ দেখছি! না না, আমি ওসব ভালোটালো চাই না। ঐ 'ভাল' কথাটায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এক একজনের ভাল এক এক রকম,—'ভাল' আমার অনেক দেখা হয়েছে। ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে শুনেছিলুম—"খুব ভাল মেয়ে—ইংরিজিতে কথা কইতে পারে!" "খুব ভাল"র মানে বুঝলে! এখন "ভালর" কথা ছাড়, মা'র পূজাটি করতে পারেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হলেই হবে।"

পুরোহিত এবার বিশেষণ বাদ দিয়া বলিলেন—"তা' না ত' কি—আমি তাই আনবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চাড়ুয্যে হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নেই, উনি ত্রৈলিঙ্গ-স্বামীকে কি বিদ্যেসাগর মশাইকে আনচেন না"।

কর্ত্তা ব্যাজার ভাবে বলিলেন—"না হে, তুমি বোঝ না;—নেউকীর পয়সা হয়েছে,—ওখানে একটা পেল্লেয়ে কিছু না হ'লে ভাল দেখাবে না—মানাবে না,—তোমাদের এরকমের ভুল খুবই আছে, আর তা করাও হয়!"

চাড়ুয্যে মশাই হুঁকার অন্তরালে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"তবে এখন আমি চললুম।"

কর্ত্তা বলিলেন—"কিন্তু বৈকালে একবার আসা চাই,—বাড়ীতে কি বলেন—সেটা শোনা দরকার; কি বল চাড়ুয্যে!"

"তা চাই বই কি, আমি আসব অখন" বলিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

চাড়ুয্যে বলিলেন—"এইবার কাজের কথা কয়েছ,—আমিও তাই ভাবছিলুম ব্যাপারটা কি,—লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর ইচ্ছাটা বাদ পড়ে কেন! এমনটা ত' কখনও দেখিনি,—'ধাত বদলাল' না কি—"

এতক্ষণে কর্ত্তা সহজ অবস্থায় আসিয়া বলিলেন—"তা না তুম ভেব না—"

চাড়ুয্যে হাসিমুখে বলিলেন—"রামঃ, এমন কথা কে বলে!"

এইবার কর্ত্তাও সহাস্যে বলিলেন—"তবে চল; ও কাজ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল;—আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পূজার চাল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাড়ুয্যে মশাইকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাড়ুয্যে মশাই আরম্ভ করিলেন—"কর্ত্তা বড় বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন—"

মৃদুহাস্যে কর্ত্রী বলিলেন—"বিপদটা কি শুনি,—ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি!"

চাড়ুয্যে বলিলেন—"লক্ষ্মীর চিন্তাই ওই; কিন্তু আজ একটু রকমফের আছে। পুরুতঠাকুরের মা'র গঙ্গালাভ হয়েছে—শুনেই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজ ভাবেই বলিলেন—"আহা, ব্রাহ্মণের মেয়ে বেশ গেছেন!"

কর্ত্তা চাড়ুয্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলে চাড়ুয্যে, আমরা যেন আচার্য্যিবাড়ী জানতে এসেছি তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোন' দোষ পেয়েছেন [illegible]" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বেশ গেছেন আমার মাথা, তুমি আমার বিপদটি ত ভাবলে না; কেন—আর পাঁচটা দিন তাঁর সবুর সইল না!"

কর্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া সহাস্যে বলিলেন—"ওমা—একবার কথা শোনো! তিনি ঢের সবুর সয়েছেন; মেয়ে মানুষের অত বেশী বাঁচা ভাল নয়।"

কর্ত্তা স্ত্রীর মুখে ঐ বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল বোধ করিতেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তোমার কাছে ও কথা শুনতে ত কেউ আসেনি।"

গৃহিণী মৃদুহাস্যে বলিলেন—"না শুনলেই বুঝি এড়ানো যায়! আচ্ছা থাক্। তা পুরুতঠাকুরের মা মরায় তোমার এত দুর্ভাবনা কেন,—যা পারবে দিও।"

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমার সেই ভাবনায়' ত' ঘুম হচ্ছে না। বলি—পূজা করবেন কে—সেটা ভেবেছ!"

গৃহিণী গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিলেন—"তাই ত' মস্ত ভাবনার কথা বটে!" তাহার পর সহজভাবে বলিলেন—"আমরা যাঁর যজমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেবেন। সে কথা ত' তাঁকে বলেই দিয়েছি।"

কর্ত্তা বলিলেন—"বটে! কি রকম ব্রাহ্মণের কথা বললে শুনি?"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ যাচাই-বাচায়ের ভার সদ্‌গোপেরা আবার কবে থেকে নিলে! তুমি আগোড়পাড়ার ইংরিজি ইস্কুলে গিছলে না কি? পুরুত মশার হয়ে লক্ষ্মীপূজা করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল,—তাঁর আবার এরকম ওরকমটা কি?"

কর্ত্তা কেবল চাড়ুয্যের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন—"দেখ্‌লে—কেমন সহজে মিটে গেল।"

চাড়ুয্যে মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাইকোর্ট যে!"

৫

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মী পূজা। মা পদ্মাসনা,—কমলালয়া। গ্রামের মধ্যস্থলে নিয়োগীমহাশয়ের গোলাপী রঙ্গের বাড়ী আজ মা'র আবির্ভাবের অপেক্ষায়—সৌন্দর্য্যে সজ্জায়, শোভায়, সৌরভে, পদ্মের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে আবাহনের সুরে সানাই আকাশে বাতাসে

সুমধুর নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক বালিকারা ভ্রমরের মত আনন্দগুঞ্জন তুলিয়া দলে দলে যাতায়াত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। পুষ্পমাল্য বেষ্টিত ঝাড় লণ্ঠন, দেয়াল-গিরি, সেজ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দালানের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা দেবদ্যুতি বিকীর্ণ করিলেন। পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাট্য, পুষ্পপ্রাচুর্য্য ও বিবিধ সুগন্ধীর মধ্যে তৃপ্তি-প্রফুল্ল পবিত্র মনে নূতন পূজারী পূজারম্ভ করিলেন; —পূজা শেষ হইল। পূজারী শেষ-আরতী করিতে উঠিলেন,—তন্ময় যন্ত্রবৎ! গাঢ় সুগন্ধী ধূমাবরণে একএকবার জ্যোতির্ম্ময়ী মা'কে কি লোকাতীতই দেখাইতেছিল! মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠনিঃসৃত বালক সুলভ মা-মা রব কাণে আসিতেছিল, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়! সে যেন কোন্ সুদূরের; এ পৃথিবীর নয়! শেষ আরত্রী শেষ হইল। পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রণাম করিল;—সকলেই মুগ্ধ, আবিষ্ট ও স্তব্ধ!

একটু সামলাইয়া চাড়ুয্যে মশাই কর্ত্তাকে বলিলেন—"লোকটি খাঁটি লোক বটে!" কর্ত্তার দৃষ্টি অবনত ছিল, তিনি মুখ না তুলিয়াই ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন করিতে করিতে একটি ছোট্ট হুঁ দিলেন মাত্র। তাহার পর ধীরে ধীরে পূজার দালান হইতে নামিয়া গেলেন। চাড়ুয্যে অবাক হইয়া অনুসরণ করিলেন।

দালানের ভিড় দ্রুত ভাঙ্গিয়া গেল;—সকলে সদরে বাজি পোড়ান দেখিতে ছুটিল;—তাহারও একটা সমারোহ ছিল! কবি রাম বন্দ্যো আমার পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন—"মর্ত্তে সুরলোকের ছায়া-পরিচয় পেলে!" কবি হইবার মক্কো হিসাবে বা স্বভাবের বশে আমিও একটু তন্ময় ছিলাম, বলিলাম "সত্যই,—এমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই!" ইচ্ছা সত্ত্বেও একটা কবির মত কথা যোগাইল না।

রামবাবু বলিলেন—"চললুম"।

বলিলাম—"কোথায়,—বাড়ী?"

রামবাবু বলিলেন—"বোধ হয়—না, একটু নিরিবিলিতে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"সে কি? এই-বারই ত আনন্দ-পর্ব্ব আরম্ভ হবে;—বাজির পরেই ভোজ; ভোজের পরেই— বাগবাজারের বিখ্যাত সখের দল। তিনকড়ি বাবুর একটিং শুনবেননা?"

রামবাবু বলিলেন—"এ ভাবটাকে "দাগী" করতে চাই না,—ছাই-ভস্ম চাপা দিয়ে এর মর্য্যাদা নষ্ট করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া গেলেন।

সদরে তখন হাউই তারা কাটছে, চরকী সোঁ সোঁ ধুনছে। দেখিলাম তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের পথ ধরিলেন। দোটানায় পড়িয়া আমার মনটা দমিয়া গেল; বাজি দেখার উৎসাহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া পূজার দালানের পৈটায় বসিয়া পড়িলাম।

তখন বাজি পোড়ানর ধুম চলিয়াছে, মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই তাহা দেখিতে গিয়াছে।

পূজার দালানের দক্ষিণ গায়ে স্ত্রীলোকদের অন্দর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে; পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওগো মায়েরা—এ বাড়ীর গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি—সেই পূর্ব্ব-পরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—"আপনি কি আমাকে ডাক্‌চেন?"

পূজারী বলিলেন—"না, তোমাকে ডাকিনি, এ বাড়ীর গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বলচি।"

থাকো ধীরভাবে বলিল—"তার প্রতি কি আদেশ বলুন।"

পুরোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ।"

থাকোকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া ব্রাহ্মণ একটু শান্তভাবে বলিলেন—"বোলো, তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জ্জন করতে পারচি না, অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এখনি ভোজ আর নাচ গান নিয়ে দালান উঠোন একাকার হয়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই;—যেন বিলম্ব না করেন।"

থাকো বিনীত ভাবে বলিল—"আমি ত আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিতই রয়েছি, আপনি কি বলবেন বলুন না।"

পুরোহিত চকিতভাবে থাকো

ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল তাহার আধ ময়লা কস্তা পেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন। আবিষ্টের মত বলিলেন—"ওঃ—তা না ত' কি মা নিজে আসেন! কি ভুল-ই করেছি। আমি নূতন লোক—আজ মাত্র এসেছি, কিছু মনে ক'র না মা।"—

থাকো বাধা দিয়া বলিল—"ও-সব কি বলচেন বাবা,—আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

পূজারী নিজে যে বড় লজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেইটুকুই প্রকাশ পাইল; কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চট্‌কা-ভাঙ্গার মত বলিলেন—"হাঁ—তা তুমি মা বিশ্বাস করতে পারবে। তাখ মা,—কৃপাময়ী আজ এখানে স্বয়ং উপস্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর। আজ তোমার কোন কামনাই ব্যর্থ হবে না—আমার এই কথাটি মনে রেখ মা। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বদ্ধাঞ্জলি হইতেই, পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ও কি মা, তবে কি আমার কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না! খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির ক'রে অভীষ্টটি ভেবে-চিন্তে নাও;—মনে রেখ—এ শুধু প্রতিমা প্রণাম করা নয় মা,—একাগ্রে মার কাছে আজ যা চাইবে তাই পাবে। গরীব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস কোর না মা।"

বিনীত কণ্ঠে—"আমার যে ভাবা আছে বাবা" বলিয়াই থাকো প্রণতা হইল। পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাবলেও না!" এই কথাটাই তাঁর সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল,—একটু অভিমানও অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিনিট-দুই মধ্যে থাকো চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিতেই পূজারী আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"এত বড় গুরুতর অবস্থায় তোমার হঠ-কারিতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। যদি গোপন রাখবার মত কিছু না হয় ত' মার কাছে কি প্রার্থনা করলে—বলবে কি মা?"

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের—বিশেষ ক'রে মায়েদের যা সবার বড় কামনা,—মা'কে তাই জানিয়েছি।" এই বলিয়া থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন—"বুঝতে পারলুম না যে মা।"

থাকো নিম্ন-দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল—"বাবা,—মা আমাকে কৃপা করে সব সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতী, আর এই যা কিছু দেখছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ করচি; বড় সুখের সঙ্গে বড় ভয়ও থাকে বাবা! তাই মা'কে বললুম—"এই সুখের মাঝখানে—সব অটুট থাকতে থাকতে, তিনি দয়া করে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ—করলি কি মা! এ কি সর্ব্বনাশ করলি! আমি যে এত করে বললুম—খুব সাবধান—মা উপস্থিত—আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল—"তাই ত' চেয়েছি বাবা!"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন—"আমার মাথা চেয়েছ!—এত ঐশ্বর্য্যের, এত সুখের মধ্যে এ কি চাওয়া! এ কি ত্যাগ! আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম;—তোমাদের চিনতে পারলুম না!"

সুমধুর বিনম্র কণ্ঠে—"আপনি যে মেয়েলি শাস্তোর পড়েননি বাবা" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদধূলি লইয়া, বিজয়িনীর মত—হাসিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বৎ—অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৬

তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি গ্রামের ইতর-ভদ্র স্ত্রীলোকেরা—মায় বৌ-ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংযত,—গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্য একজন বয়িয়সীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"আর, বাবা সর্ব্বনাশ হ'ল, আমাদের থাকো চল্‌লো।"

গত কোজাগর লক্ষ্মীপূজার কথাটা যুগপৎ স্মরণ হইয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

গিয়া দেখি—ঘাটে লোকারণ্য! সকলেরি বদনে বিষাদ, নয়নে জল, মুখে 'হায়-হায়' ছাড়া ভাষা যেন

স্বয়ং মূক হইয়া গিয়াছে। থাকোকে শায়িত অবস্থায়—সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম,—সেই লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী,—সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠন,—সেই নথ,—সেই শাঁখা আর বালা!

ভাষা পাইলাম কেবল কর্ত্তা ও গৃহিণীর মুখে! থাকো বলিতেছে—"ছিঃ, পুরুষ মানুষের অমন হ'তে নেই,—পায়ের ধূলো দাও।" কর্ত্তা বলিলেন—"ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার দুঃখ।" থাকো যেন সিক্তকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তুমি জান না,—আমার এত সুখ যে তা সয়ে থাকতে আর সাহস হ'ল না; মেয়ে মানুষের অত সুখ বেশী দিন ভোগ করবার লোভ রাখতে নেই গো।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাত দু'খানি কণ্ঠে বক্ষের উপর তুলিয়া জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—"এঁদের—নিয়ে—থে—রু।" হাত আর মাথায় উঠিল না,—দুই ধারে পড়িয়া গেল।

চাড়ুয্যে মশাই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন; শতকণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল।

দর্পণ বিসর্জ্জন শেষ হইয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী বিদায় লইলেন।

শিল্পী—শ্রীরণদা উকিল

শ্যামভূমি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

২

এদেশের মতো শ্যামদেশে মানুষের মৃত্যু হওয়া মাত্র তার দেহ চিতানলে ভস্ম করা হয় না। মৃত্যুর পর শব-দেহকে মন্ত্রপূত জলে স্নান করিয়ে মহার্ঘ বেশভূষায় সুসজ্জিত করে একটি শবাধারে শয়ন করিয়ে ঘরের মধ্যে একটি বেদী নির্ম্মাণ ক'রে তার উপর রেখে দেওয়া হয়। শবাধারের চারিপার্শ্বে মৃত ব্যক্তির যা কিছু প্রিয় বস্তু সমস্ত সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয়। সাত দিন পরে সে ঘরে একটা ধর্ম্ম উপাসনার অনুষ্ঠান হয়, পনেরো দিন পরে, পঞ্চাশ দিন পরে এবং শত দিবসে সেই অনুষ্ঠানের আবার পুনরভিনয় হয়! তার পর বৎসর পূর্ণ হলে অথবা তার পরেও কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে শবদেহ সৎকার ক'রতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেখানে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। সেদিন অপর্য্যাপ্ত পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদের চূড়ান্ত আয়োজন হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিতে আসেন। তারা সকলেই ঘৃত পুষ্পমাল্য চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিয়ে এসে মৃতব্যক্তির চিতানলে জয়ধ্বনি ক'রতে ক'রতে নিক্ষেপ করেন। নাচ তামাসার সঙ্গে

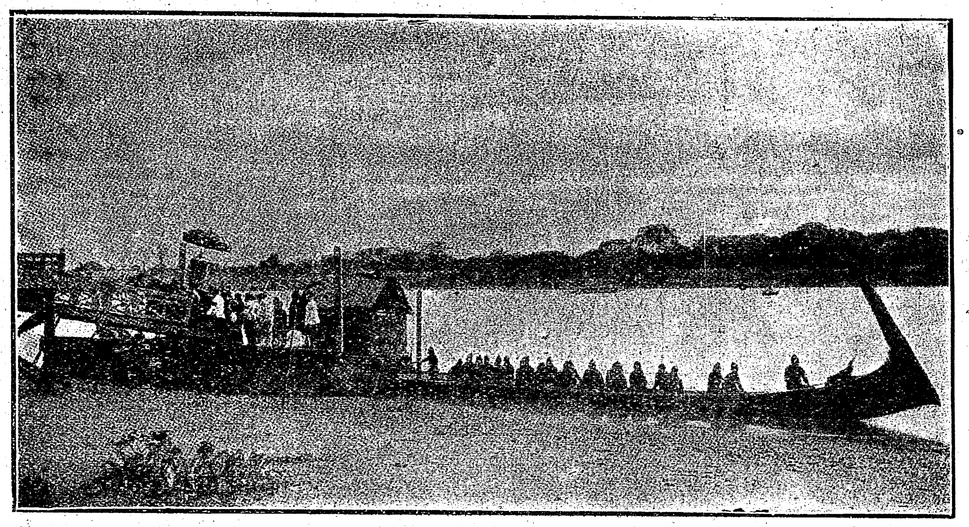

শববাহী রাজ-তরণী (নৃপতির শবদেহ এই রাজতরণীতে স্থাপন ক'রে—শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে।)

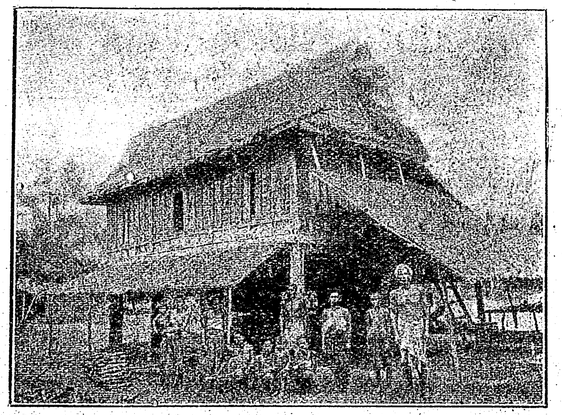

শ্যামের পল্লীভবন (এরা আমাদের দেশের মতো মাটির উপর কুটীর নির্ম্মাণ করেনা। জমির উপর একটা উচ্চ মঞ্চ তৈরি করে তার উপর কুটীর বাঁধে।)

সঙ্গে সেদিন সারারাত বাজী পোড়ানো হয় এবং পরদিন প্রভাতে সকলে দল বেঁধে এসে মৃত ব্যক্তির চিতাভস্ম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যায়। রাজা বা রাজ-পরিবারের কাহারও মৃত্যু হলে এই সব উৎসব অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল ধ'রে চলে, এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। দরিদ্র গৃহের ব্যবস্থা অন্যরূপ, তারা ঐ সাত দিন কিম্বা পনেরো দিন পরেই মৃত দেহটিকে গ্রামের বৌদ্ধমঠে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে এবং যথেষ্ট

মহারাজের শবাধার (রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণ সমাধি স্তূপের মধ্যে মহারাজাদের

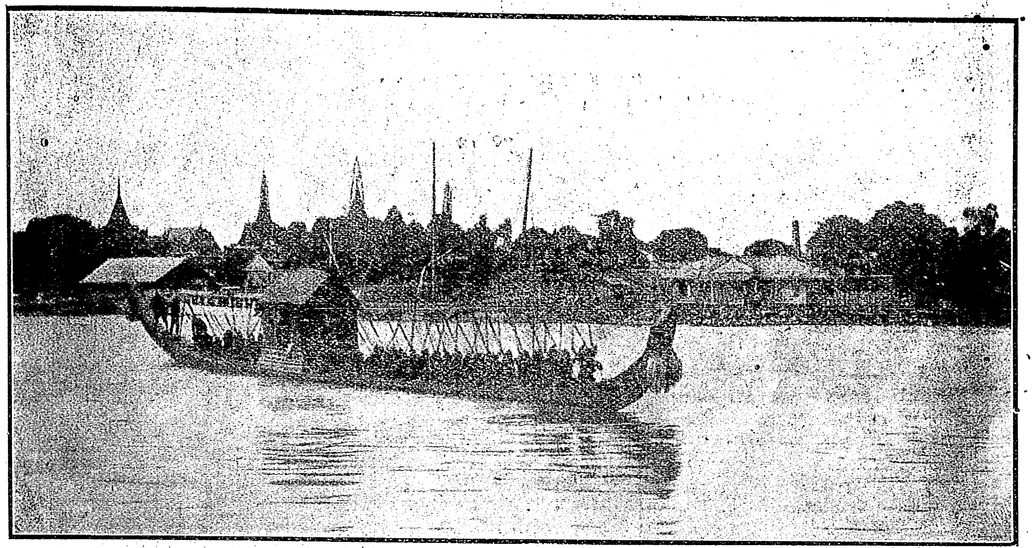

রাজ-তরণী (পঞ্চাশদাঁড়ীর এই সুদৃশ্য সুন্দর তরণী খানি কেবল মাত্র রাজা স্বয়ং কোনও উৎসব বা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ব্যবহার করেন।)

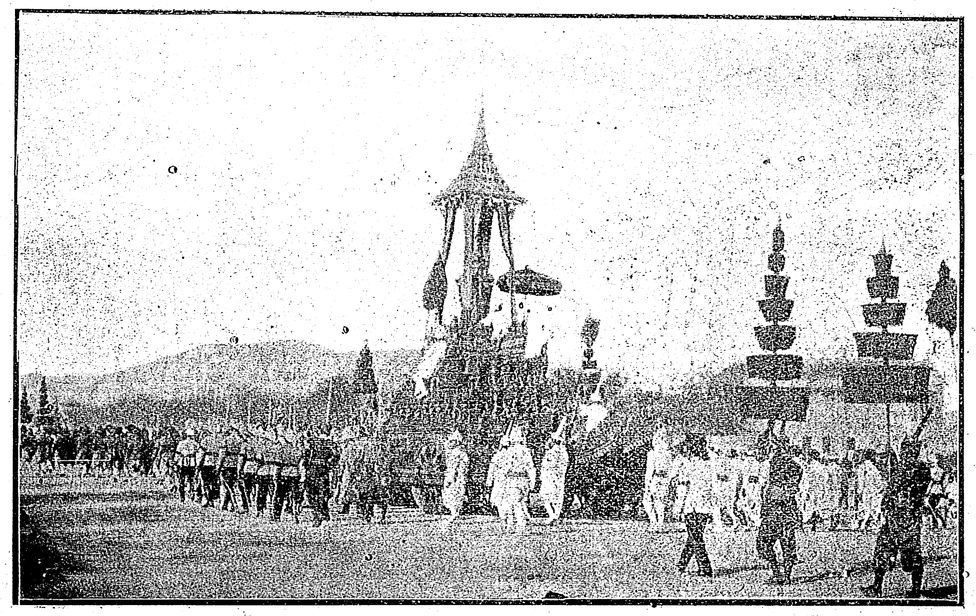

(শোভাযাত্রার সর্ব্ব পশ্চাতে মহারাজের এই শববাহী স্বর্ণ রথখানি থাকে)

যুবরাজের প্রব্রজ্যা (বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসন মতে প্রত্যেককে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয়। রাজপুত্রেরাও এ নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন না।)

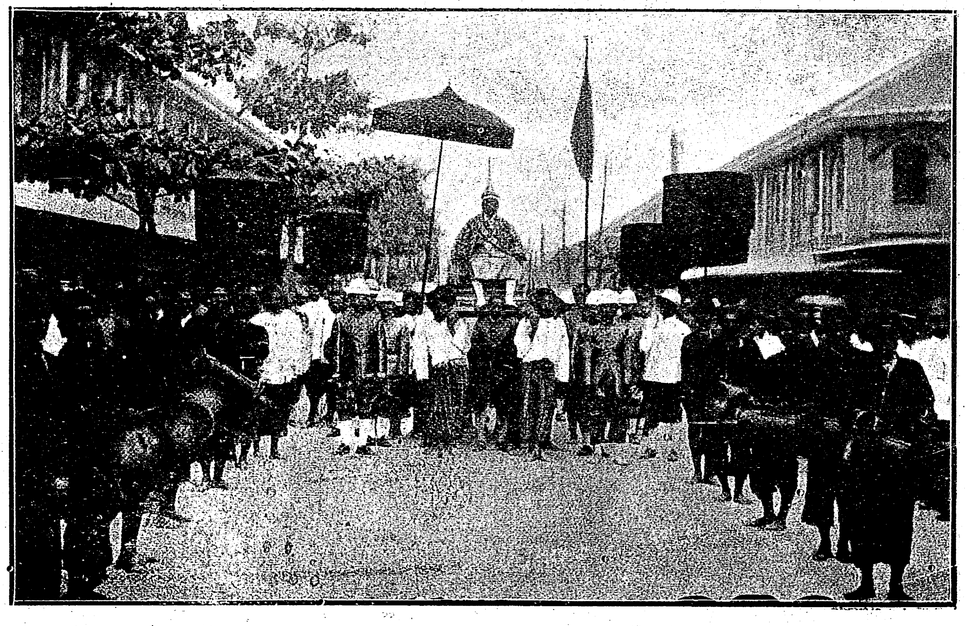

রেক্না উপলক্ষে রাজার শোভাযাত্রা ! (ভূমিকর্ষণ উৎসবকে এরা বলে 'রেক্না'। চাষাদের উৎসব হ'লেও রাজা স্বয়ং এ উৎসবে

অর্থাদি সংগ্রহ হলে পর তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করে।

শ্যামবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বটে কিন্তু ভারত বা তিব্বতের পরিবর্ত্তে তারা ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নীতির অনুসরণ ক'রে চলে। রাজা তাদের রাষ্ট্রপতিও বটেন, আবার ধর্ম্মগুরুও তিনি। শ্যামদেশে প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধ মঠ ও বিহার আছে এবং দু'লক্ষের উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বাস সেখানে। এই সমস্ত মঠ বৌদ্ধ মঠ ও বিহারের সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; কাজে কাজেই তাদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাবটাই সব চেয়ে বেশী স্থান অধিকার করে বসেছে। তবে আশার কথা এই যে, আজকাল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের উদ্ভব মঠ ও বিহারের বাইরেও দেখা দিচ্ছে ! শ্যামদেশের প্রধান শিল্প হ'চ্ছে কাঠের কাজ, রূপার কাজ, ব্রোঞ্জের কাজ, গালার কাজ, চিকনের কাজ এবং রঞ্জন ও চিত্রবিদ্যা।

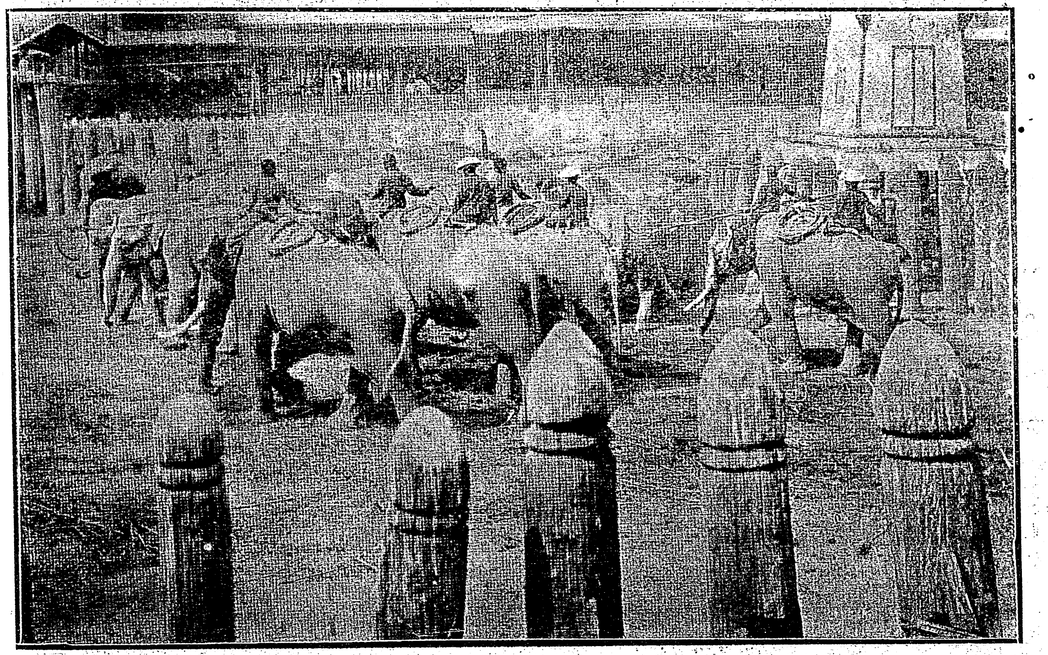

বন্যহস্তী শিকার (প্রতি বৎসর রাজ-আদেশে ও রাজকীয় ব্যয়ে রাজ-অনুচরেরা বন্য হস্তী ধ'রে নিয়ে আসে। শ্যামরাজের এক বিরাট হস্তীচমূ আছে। বন্য হস্তীর দলকে দল এই রাজার করী-চমূ চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে সহরের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে এসে একেবারে রাজার হাতীশালায় পুরে ফেলে।)

রাজার তত্ত্বাবধানে থাকে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সকলেই রাজার অধীন প্রজা। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সহরের লোকেরা আর বড়একটা বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত খুঁটি নাটি মেনে চল্‌ছেনা ; কিন্তু সহরের বাইরে পল্লীবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সমস্ত আচার এমন কি কুসংস্কারগুলি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলে।

যে দেশের শিল্প ও সাহিত্য এতকাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র

নৃত্যগীত তাদের মধ্যে এত বেশী প্রচলিত যে, অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেকেই গান গাইতে শেখে। গান গাইতে না জানাটা তাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা ! বাদ্যযন্ত্রও তাদের অনেক রকম আছে। সেগুলি সমস্তই তারা পৃথক ভাবেও বাজায়, আবার একসঙ্গে ঐক্যতান বাদনও ক'রে। শ্যামের সৈনিকেরা যুদ্ধযাত্রার সময় সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে চমৎকার

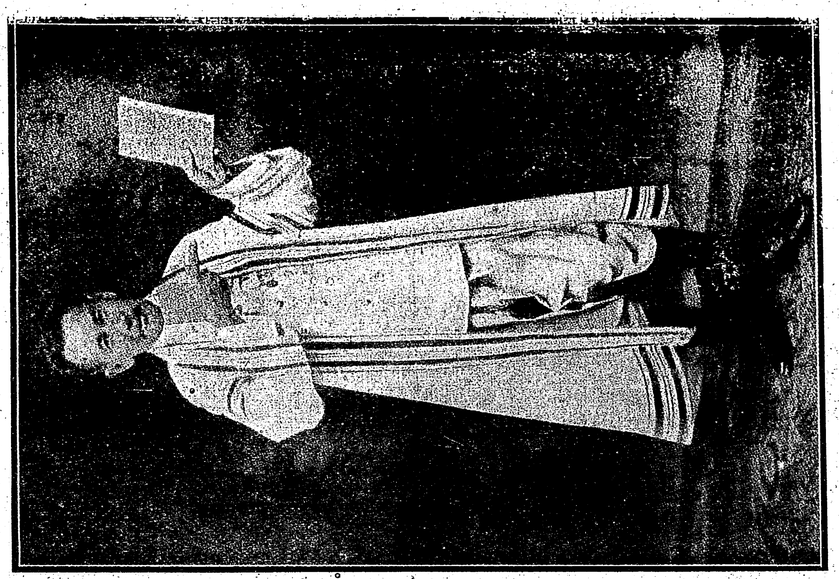

শ্যামরাজ্যের শিক্ষাসচিব ("সুলালনকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের" বার্ষিক সভায় তিনি শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন।)

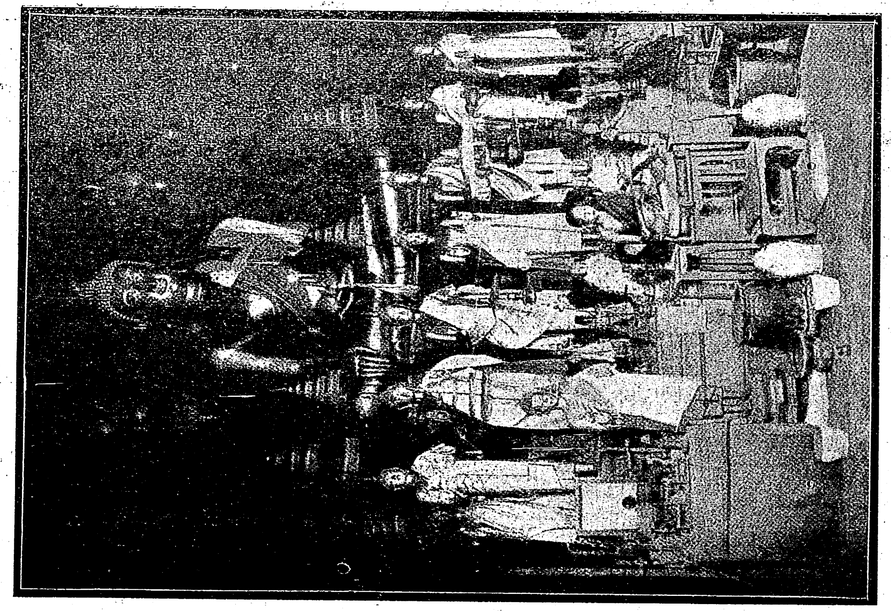

বৌদ্ধ মঠে উপাসনা (শ্রীভগবান তথাগতের মূর্তি মণ্ডলের পাদপীঠে একটি উচ্চ বেদীর উপর বসে মহাস্থবির প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দু'বার ক'রে সাধারণের জন্য উপাসনায় বসেন।)

পথ চলার সুরে (marching Tune) গান গাইতে গাইতে চলে।

শ্যামভূমির অধিবাসীরা তাদের দেশকে বলে "মুয়াঙ্-তাই"! "মুয়াঙ্" শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাধীন বা মুক্ত আর 'তাই' কিম্বা "থাই" অর্থে 'স্থান' বুঝায়। "মুয়াঙ্-তাই" কি না "স্বাধীন স্থান!" এই "স্বাধীন স্থানের" খুব সংক্ষেপে একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনা করে আমরা এ প্রবন্ধ শেষ ক'রবো।

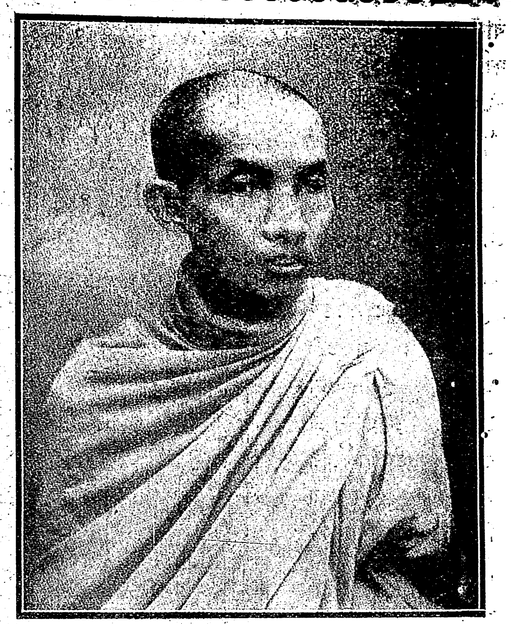

বহু পুরাকালে এদেশে প্রাচ্যের সেই আদিম বংশধর কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য জাতিরা বাস ক'রতো। তাদের চিহ্নাবশেষ এখনও দক্ষিণ শ্যামভূমির অরণ্যে ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় তারা ক্রমেই ক'মে আসছে। মোঙ্গ জাতীয় মোনানরা দু'হাজার বৎসরের কিছু পূর্ব্বে এদেশ অধিকার করেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ থেকেও ঔপনিবেশিকরা গিয়ে এই অঞ্চলে আড্ডা গেড়েছিল। ক্রমে এই দুই বড় সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের পূর্ব্বভাগে সমগ্র অনার্য্যভূমি সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল! অল্প দিনের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এ দেশে সমধিক আধিপত্য বিস্তার করায় এরা সকলেই ভারতীয় ধর্ম্ম রীতি নীতি আচার পদ্ধতি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে চলতে আরম্ভ করলে। এই ভাবে কয়েক শতাব্দী চলবার পর—ভারতের অতি পূর্ব্ব সীমান্তের এই প্রদেশটি তিনটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেল। পূর্ব্বে রইল কাম্বোজ, পশ্চিমে পেগু আর মধ্যে হ'ল স্বজনালয়। এই স্বজনালয়ে এসে প'ড়ল আবার আর একদল মোঙ্গলীয় পরিবার। তারা হ'চ্ছে লায়োতাই এই 'লায়ো-তাইরা' স্বজনালয়ে ঢুকে কয়েক শতাব্দী ধ'রে ক্রমাগত সতর্ক থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর কালের প্রভাবে পড়ে যখন তারা স্বজনালয়-

শ্যামভূমির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক (এই মহাস্থবির বৌদ্ধশ্রমণ শ্যামের বর্ত্তমান নৃপতির পিতৃব্য।)

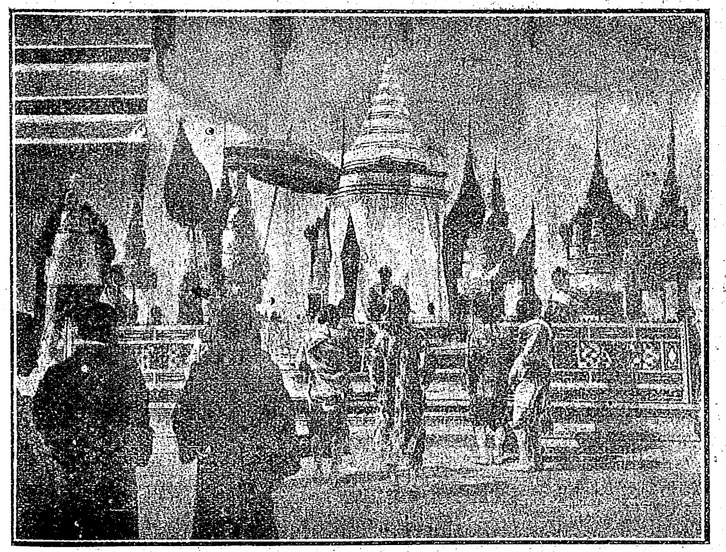

রাজ্যাভিষেক সভা (রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তারা অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত রাজসভা নির্ম্মাণ [illegible] এই সভায় মহাসমারোহে ষোড়শোপচারে এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।)

বাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য হ'ল, তখন সংমিশ্রণের ফলে ধীরে ধীরে আর একটা জাত এই স্বজনালয়ে গড়ে উঠ্‌তে লাগল। সেই নূতন জাতই আজ শ্যামবাসী 'থায়' নামে পরিচিত হ'য়েছে!

১৩৫০ থেকে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্যামের ইতিহাস ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সমষ্টি মাত্র। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজরা শ্যামে প্রবেশ করে, এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ইংরাজদের রণতরী শ্যামের উপকূলে এসে দেখা দেয়; এই সময় ডাচ্ বা ওলন্দাজদের জাহাজও ইংরাজের পিছু-পিছু এসে ঢুকেছিল। ওলন্দাজরা এসে শ্যামে পোর্ত্তুগীজ আধিপত্য নষ্ট করে তাদের বিদায় করে দিলে বটে, কিন্তু ইংরাজের চক্রান্তে ওলন্দাজদেরও শীঘ্রই শ্যামভূমি পরিত্যাগ ক'রে যেতে হ'য়েছিল।

চোর ও পুলিশ (শ্যামের পুলিশ, চোর যাতে পালাতে না পারে এজন্য তার ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড জোয়াল এঁটে দেয়।)

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে জনকতক ফরাসী খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক কনষ্টাণ্টাইন্ নামক জনৈক গ্রীক ভাগ্যান্বেষীর অধিনায়কতায় শ্যামে পদার্পণ করেছিলেন। এই কনষ্ট্যাণ্টাইন্ নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে শীঘ্রই শ্যামরাজের প্রিয়পাত্র হয়ে ক্রমে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করেছিলেন। এই মন্ত্রীকে সহায় ক'রে ফরাসী প্রচারকরা সমগ্র শ্যামকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী করে ফরাসীর অধীন এক করপ্রদ দেশে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিল। ওই প্রচারকদের প্ররোচনায় উৎসাহিত হ'য়ে এই উদ্দেশ্যে ফরাসী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুই শ্যামদেশে যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেন। এত সৈন্য-সামন্ত ও নৌবহর নিয়ে সেজে-গুজে ফরাসীদের আস্‌তে দেখে, শ্যামবাসীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হয়ে উঠে, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রলে এবং রাজা ও তাঁর গ্রীক মন্ত্রীকে হত্যা করে পূর্ব্বোক্ত মিশনারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ থেকে প্রত্যেক য়ুরোপী শ্বেতাঙ্গকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে শ্যামভূমিকে একেবারে শ্বেতাঙ্গ-শূন্য করে ফেল্‌লে।

শ্যামদেশের বর্ত্তমান উন্নতির বীজবপন করে গেছলেন মহারাজ পরমইন্দ্রমহামঙ্কুট। ইনি নৃপতি ভয়চক্রীর পুত্র। এঁরা কেউ স্বজনালয়ের প্রাচীন রাজবংশের লোক নন। ভূপতি মহালক্ষণ ছিলেন স্বজনালয়ের প্রাচীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর রাজধানীর নাম রেখেছিলেন "শ্রীঅযোধ্যা"। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহালক্ষণের বংশধরেরা রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। মাঝে কেবল দিনকতকের জন্য একজন নীচকুলোদ্ভব সৈনিক, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছিল। তার পর ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত শ্যামভূমি আভারাজ আলাউঙ্‌ফ্রার অধিকারে এসেছিল।

ফায়াতাক নামক একজন চীনে রাজকর্ম্মচারী সৈন্যবল সংগ্রহ করে শ্যামভূমিকে ব্রহ্মের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত ক'রে স্বয়ং রাজা হয়ে শ্যামের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীঅযোধ্যা পরিত্যাগ করে 'ব্যাঙ্কক্' নামক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু দশ বছর পরেই উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় ব্রহ্মদেশ থেকে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা ক'রে জনসাধারণ সেনাপতি ভয়চক্রীকে তাদের রাজা ব'লে স্বীকার করে সিংহাসনে বসবার অধিকার দেয়। ভয়চক্রীও তাঁর অদ্ভুত সংগ্রাম কৌশলে ব্রহ্মের আক্রমণ শুধু ব্যর্থ নয়, তাদের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস ও বিধ্বস্ত ক'রে

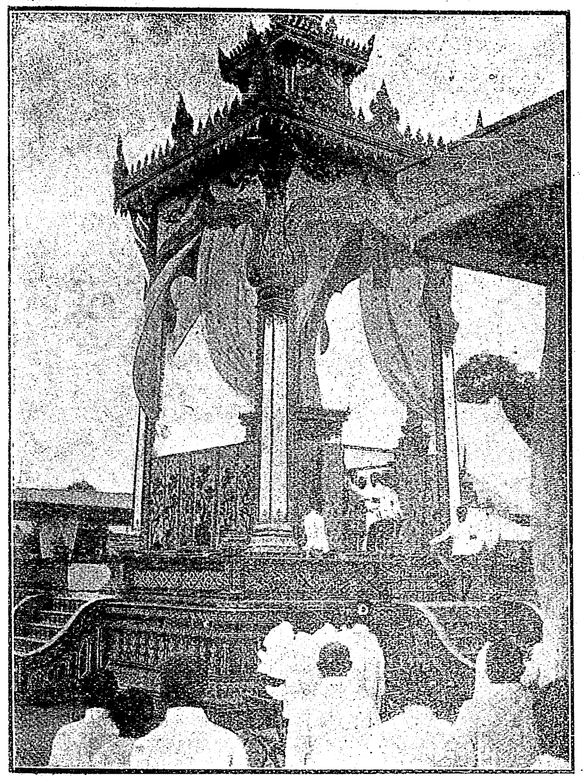

সুসজ্জিত চিতামঞ্চ (রাজার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য সিংহাসনের মতো অতি সুন্দর একটী চিতামঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয় এবং দেবমন্দির হ'তে আনীত অগ্নি সংযোগে শবদেহের সহিত এই সুন্দর মঞ্চটিও ভস্মীভূত করা হয়)।

সুশাসিত করেছিলেন, রাজকার্য্যের এমন সব সুব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে পিতার সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর অকালমৃত্যু হওয়ায়, তাঁর পুত্রকে বঞ্চিত করে রাজবংশের অপর একজন লোক রাজনৈতিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বলে সিংহাসন দখল করে নিয়েছিল। ইংরাজ ও আমেরিকার সঙ্গে পুনর্ব্বার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রেছিল সেই। সাতাশ বৎসর মাত্র রাজত্ব ক'রে তিনি রাজ্যের পরিসর আরও বৃদ্ধি করে গেছলেন, আনাম ও কাম্বোজকে তিনি শ্যামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় সিংহাসনের যিনি ন্যায্য অধিকারী, তিনি আবার তাঁর হৃত-রাজ্য পুনরধিকার করেন। পরমইন্দ্রমহামঙ্কুট নাম গ্রহণ ক'রে তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হ'য়েও এত দিন মনের দুঃখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। এইবার রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি রাজ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে মনযোগী হ'য়েছিলেন। য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে যান। জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি ও সংস্কারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৮৬৮ সালে মহামঙ্কুটের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলালনকর্ণ রাজা হ'ন। সন্ন্যাসী মহামঙ্কুট সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজ্যলাভ করেছিলেন এবং সেই বয়সে তিনি একাধিক বিবাহ করে শত পুত্রের জনক হ'য়েছিলেন। সুলালনকর্ণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে বিধিমত চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ফরাসীর সহিত নিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'য়েছিল বলে, তিনি আশানুরূপ কাজ ক'রতে পারেন নি। ১৮৯৩ সালে ফরাসীর সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ বেধেছিল। তার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের মধ্যস্থতায় ফরাসীর সঙ্গে শ্যামের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং ১৯০৭ সালে মালয় উপদ্বীপ ও বাতাম্বাঙ্ প্রদেশ ইংরাজ ও ফরাসীকে

দান করে দিয়ে তিনি রাজ্যে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ন। ইতিপূর্ব্বে মহামঙ্কুটের রাজত্বকালেই ফরাসীরা আনাম থেকে কাম্বোজ পর্য্যন্ত তাদের সাম্রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত করে নিয়ে ছল।

সুলালনকর্ণ বারদুই-তিন য়ুরোপ পরিভ্রমণ ক'রে এসেছিলেন। তিনি একাধিক য়ুরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্যামরাজ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা, রেল, ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রথম প্রচলন করে-ছিলেন। রাজস্ব, বিচারালয়, পুলিশ ও সামাজিক অবস্থার তিনি প্রভূত উন্নতিসাধন করে যান। ১৯১০ সালে সুলালনকর্ণের মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান নরপতি ষষ্ঠ রাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর স্বর্গগত মহান্ পিতার পন্থানুসরণ করে শ্যামভূমিকে আজ উন্নতির আরও অগ্র পথে পরিচালিত ক'রছেন। বিগত জার্ম্মাণ-যুদ্ধে তিনিই মিত্রশক্তির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন।

দুঃখের সুখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

দুঃখ তোমায় করবে এসে গৌরব দান,
হায় রে অবোধ, তবু কেন রও ম্রিয়মাণ।
দেশ বিদেশে ঘুরতে যাবে,
শ্রীবৎসকে সঙ্গী পাবে ;
হরিশ্চন্দ্র করবে তোমায়
উৎসাহবান।

পরতে পাবে বল্কল এবং জীর্ণ-ধটী
ডাক্‌বে তোমায় দণ্ডক এবং পঞ্চবটী।
যে কটা দিন ভাগ্যে আছে,
ফিরবে মায়ামৃগের পাছে—
পদ্ম ভরা পম্পা হ্রদে
করবে সিনান।

কাঠুরিয়ার সঙ্গেতে কাঠ কাট্‌তে যাবি ;
মন্দ কি ভাই, চন্দনেরি গন্ধ পাবি।
মা সুরভির দুগ্ধধারা
করবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হারা
ইন্দ্র কি ভাই এমন সুধার
আস্বাদই পান।

পাত্‌বি নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ দ্বৈতবনে
দ্যূত ক্রীড়ার দুঃখ কি আর রইবে মনে।
চিত্ররথে আন্‌বি ধরে,
রথের পরে বন্দী করে ;
সপরিবার দুর্য্যোধনে
করবি রে ত্রাণ।

ধনের ভীতি যাক্ না, পাবি বনের প্রীতি।
বনবিহগই চারণ হয়ে গাইবে গীতি।
আস্‌বে আঁধার বন্ধু হয়ে,
ফুলের সাজি হস্তে লয়ে ;
মুক্ত প্রাণে ডাকবি—এসো,
হে ভগবান!

শ্মশানবাসী শিব ডাকিবেন আপন জেনে,
অন্নপূর্ণা অন্নথালি দেবেন এনে।
লক্ষ্মী দেবেন কমল আনি,
বীণা দেবেন বীণাপাণি ;
বুঝবে তুমি— দেবদেবীদের
কত যে টান।

হয় ত রে ভাই, একটী দিবস শুভক্ষণে,
হস্তে-বীণা নারদ ঋষি আস্‌বে বনে।
পারিজাতের পরশ দিয়া
জুড়াবে তোর তাপিত হিয়া,
স্বর্গে এবং মর্ত্তে হবে
আদান-প্রদান।

এমনি দারুণ দুর্য্যোগেরি গভীর রাতে
হয় ত হঠাৎ মিলবে দেখা হরির সাথে
দুঃখে ক'দিন রইবি একা ;
দুঃখহারীর মিলবে দেখা,
দরশনেই তোর দীনতার
সব অবসান।

নুরন্নেহার

শ্রীমতী আবেদা খাতুন্

শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহ। যদিও বর্ষাকাল শেষ হয়-হয়, কিন্তু বৃষ্টির প্রকোপ কমে নাই। দীর্ঘ-বিচ্ছেদ-কাতর প্রিয়ার সঘন অশ্রুধারার মত বর্ষা-বিদায়ের এই অবিরল বর্ষণ অতিরিক্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রকৃতির বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতেছে।

ইন্‌ছান্ আলীর এই রবিবারেই বাড়া আসার কথা ছিল ; কিন্তু রবিবার পার হইয়া আরও দুই তিন দিন চলিয়া গেল, তথাপি ত তাহার দেখা নাই। এত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী নুরন্নেহার ও বৃদ্ধা পিতামহী উভয়েই অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন।

আপন বলিতে এক্ষণে ইন্‌ছান্ আলীর এক বৃদ্ধা পিতা-মহী, একমাত্র ভগিনী নুরন্নেহার ও এক মাসী ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। মাসীর বাড়ী অনেক দূর বলিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ইন্‌ছানের আর যে দুইটী বড় ভাই ছিল, তাহাদের যে তাহারা অনেক দিনই হারাইয়াছে। তাহার জন্মের পর বহু দিন সূতিকা রোগে ভুগিয়া তাহার মাতাও যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান, তখন নুরের বয়স সবে দেড় বৎসর। ইহার পর বৎসর পূরিতে না পূরিতেই হতভাগ্য ইন্‌ছান্ পিতৃহীন হইয়া পড়ে। পিতার মৃত্যুর সময়ে ইন্‌ছানের বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। সে আজ এগার বৎসরের কথা। এখন নুরন্নেহার সবে বার বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ইন্‌ছান্ গ্রামের স্কুলে এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া দুই বৎসর হইল কলিকাতায় যাইয়া কলেজে পড়িতেছে। নুরন্নেহারও গ্রামের এক বালিকা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

অন্যান্য দিনের মত সে দিনও সকালে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; কিন্তু সেদিন বৃষ্টির বেগ যেন আরও প্রবল ; যেন বদ্ধ অশ্ব মুক্তি পাইয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ বৃষ্টির অজস্র বর্ষণ শান্ত হইয়া আসিল।

নুর ও তাহার পিতামহী ঘরের মধ্যেই বসিয়া ছিলেন। বৃষ্টি কমিয়া আসিল দেখিয়া পিতামহী বলিলেন—"ইস্, এমন বৃষ্টি যে বেরোবার যো ছিল না ; যাক বাবা, বাঁচা গেল। নুর, দেখ্ তো সলিম কি করছে। কাজ করুক, বেলা যে আর নেই। আচ্ছা, ইন্‌ছান্ কি ঠিক রবিবারেই আস্‌বে ব'লে লিখেছিল? ভাল ক'রে আর একবার চিঠিখানা দেখ্ তো!"

নুর চিঠি লইয়া আসিয়া মলিন মুখে বলিল, "ভাল ক'রে আর কি দেখব দাদি! এই তো দাদা লিখেছেন রবিবারেই রওনা হব।" নুরের পিতামহী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন, "তবে এলো না কেন?"

নুর কিছু বলিল না, মলিন মুখেই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নুরের পিতামহী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হয় তো বৃষ্টির জন্যই আস্‌তে পারে নি।"

এবারেও নুর কিছু বলিল না ; তাহার পিতামহীও চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ বহির্ব্বাটীতে জুতার শব্দ হইল ; উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। নুরের পিতামহী বলিয়া উঠিলেন "দেখ্ তো নুর, কে এল।"

নুর দ্রুতপদে বাহিরে আসিতেই সম্মুখে তাহার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইল। এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল যে, সে তাহার দাদার সহিত সহজে কথা বলিবে না ; কিন্তু বহু দিন অদর্শনের পর ভাইকে দেখিতে পাইয়া সমস্তই ভুলিয়া গেল এবং উৎফুল্ল স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "দাদা—" কিন্তু ইন্‌ছানের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল, তাহার সঙ্গে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক। যুবকটী বিস্মিত দৃষ্টিতে নুরের দিকে তাকাইয়া আছে। নুর লজ্জায় আরক্তিম হইয়া ছুটিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বয়সের মহিমায় নুরের অঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছে—মৃণাল-তুল্য সুগোল হস্ত, দাড়িম্ব-পুষ্পাভ সুঠাম দেহ, আরক্তিম গণ্ডদ্বয়, আনত দৃষ্টি, নিতম্ব-লম্বিত ভ্রমরকান্তি কেশদাম। আগন্তুককে দেখিয়া

নুর লজ্জিতা হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই আগন্তুক আরও মুগ্ধ হইল।

গাড়ীতে আসা সত্ত্বেও প্রচুর বৃষ্টির জন্য ইন্‌ছানের পরিধেয় বস্ত্রের কোন কোন অংশ ভিজিয়া গিয়াছিল। ইন্‌ছান্ আলী বহির্ব্বাটীর বারান্দায় উঠিয়া সেই কাপড় পরিবর্ত্তন করিতেছিল। নুরের আহ্বানে মুখ তুলিতেই দেখিল, সে চলিয়া যাইতেছে, সে আর কিছু বলিল না। কাপড় পরা শেষ হইলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গী তখনও ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া আছে। সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি নুরুদ্দিন, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে যে! ভিজে কাপড়ে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ ক'রবে না কি?" নুরুদ্দিন ইন্‌ছান্ আলীর বন্ধু, কলিকাতায় পড়ে. এই বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিবে। ইন্‌ছানের পিতার সঙ্গে ইহার পিতার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। ইহারা বেশ অবস্থাপন্ন লোক। জমি-জমা অনেক আছে। ইহার পিতা ওকালতী করিয়াও কিছু টাকা জমাইয়া গিয়াছেন। গত বৎসর হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণে সংসারে ইহারা তিন ভ্রাতা, দুই ভগিনী এবং মা। বড় ভগিনীর বয়স ৯ বৎসর এবং ছোটটীর ৭ বৎসর।

ইন্‌ছানের বাক্যে চকিত হইয়া নুরুদ্দিন কাপড় বদলাইতে লাগিল। আজ নুরকে দেখিয়া তাহার যেন দিব্য-চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই নুরই যে এই, তাহা সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। নুর দাদা বলিয়া ডাকিলে সে তাহাকে চিনিতে পারিল। পূর্ব্বে যখন সে নুরকে দেখিয়াছিল, তখন নুরের বয়স ছিল তিন বৎসর। তাহার রং তখনও গৌরবর্ণ ছিল, কিন্তু শরীরটা ছিল বড়ই রোগা। সেই নুরেরই এখন এ কি পরিবর্ত্তন! আজকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সত্যই চক্ষু ফিরান কঠিন।

নুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দাদি আম্মা বলিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে নুর?" নুর বিস্মিতের সুরে বলিল "কোথায় আবার কি হ'য়েছে!"

"তবে অমন মুখ চোখ লাল হ'য়েছে যে?" দাদির কথায় নুরের লজ্জা যেন আরও বেশী হইল। কিন্তু এই ভাবটা গোপন করিবার জন্য সে বলিল, "কি যে বল দাদি!" এই কথা বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

ইন্‌ছান্ আলী নুরুদ্দিন সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া দাদিকে সালাম করিল। দাদি-আম্মা এখন বুঝিলেন, নুরের ভাবান্তরের কারণ কি। নুরুদ্দিনকে চিনিতে না পারিয়া ইন্‌ছান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্‌ছান্ বলিল, "তোমার মনে নাই মা। (ইন্‌ছান্ দাদিকে মা বলিত) এর নাম নুরুদ্দিন।" দাদি-আম্মা বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, মনে হয়েছে। বুড়ো মানুষ, ভুলে যাই বাবা। আর একবার যখন ও এসেছিল—সে কি আর আজকার কথা। নুরের বয়স তখন তিন বৎসর। তার পর থেকে ত খোঁজ খবর কিছুই জানি নে।"

নুরুদ্দিন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি ক'রে আস্‌ব বলুন। বাবা তো সহরে থাক্‌তেন, বাড়ীতে মাকে ও ছোট বোন দুটীকে দেখ্‌তে হ'ত। তার পর আবার স্কুলের পড়া। গত বৎসর বাবা বলেছিলেন, একবার এদিকে আস্‌বেন, কিন্তু তাঁর সে আশা আর পূর্ণ হল না। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তিনি মারা গেলেন।"

দাদি-আম্মা সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিলেন, "কি ক'রবে ভাই, দুনিয়াই এই। দেখ্‌ছ না ইন্‌ছান্‌দের অদৃষ্ট?" মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিবার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ইন্‌ছান্‌কে বলিলেন, "তা থাক্, তোর আস্‌তে দেরি হ'ল কেন? চিঠি লিখে দিয়ে আর দেখা নাই,—আমরা এদিকে ভেবে মরছি।"

ইন্‌ছান্ আলী বলিল, "এই ইনিই নাছোড়বান্দা হ'য়ে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে কি সহজে আসবার যো ছিল। কত ক'রে তবে এসেছি। তবুও চার দিন দেরি হ'ল। নুর আমার উপর খুব রাগ করেছে, না মা?"

দাদি-আম্মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "রাগ্‌বে না! এই কয়েক দিন কি কম ভাবিয়েছিস্, বল্ তো?"

ইন্‌ছান্ আলীও হাসিয়া ভগিনীর উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। নুর তাহার পিতামহীর ঘর হইতে রন্ধনশালায় আশ্রয় লইয়া পুনর্ব্বার সেই ঘরের দিকেই আসিতেছিল। ইন্‌ছান্ আলীও সেই সময়ে তাহার উদ্দেশে বাহির হইতেছিল; দেখিয়াই বলিল, "এই যে নুর! মা বললেন, আমার উপরে খুব রেগেছিস্! সত্যি?"

ইন্‌ছানের মুখে রাগ করার কথা শুনিয়া তাহার অভিমান পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিল। সে মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। [illegible]

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহার অভিমান চাপা পড়িয়াছিল; এক্ষণে একটু আল্‌গা হইতেই পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইন্‌ছান্ আলী ভগিনীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া বলিল, "আর রাগ করে না পাগলী!"

ইন্‌ছান্ উঠিয়া আসিলে, দুই একটা কথা বলিয়া নুরুদ্দিন বাহিরে আসিল। ইন্‌ছানের পিতামহীও নুরের উদ্দেশে কিয়দ্দূর যাইতেই নুরকে তদবস্থ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

দেড় বৎসর পরের কথা। তখন গ্রীষ্মের ছুটী। ইন্‌ছান্ আলী ছুটীতে বাড়ী আসিয়া তাহার মাসীর অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। মাসী অজীর্ণরোগে কয়েক মাস হইতে ভুগিতেছিলেন। প্রায় ৪।৫ বৎসর গত হইল, ইন্‌ছানের সেখানে যাওয়া হয় নাই। মাসী ইন্‌ছান্‌কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এত দিন পরে কি মনে পড়ল বাছা! ম'রে গেলে ত তোদের সঙ্গে দেখা হবে না—শরীরের যা অবস্থা হয়েছে।"

ইন্‌ছান্ লজ্জিত মুখে বলিল, "কি ক'রব মাসীমা, একলা মানুষ, অবসরও খুব কম, সেইজন্য আসা হয় না।"

ইন্‌ছান্ সেইখানে সপ্তাহখানেক রহিল। আসার সময়ে তাহার মাসী কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার সঙ্গে এই বুঝি শেষ দেখা।" কথাটা তাঁহার মুখ দিয়া যে সত্যই বাহির হইয়াছিল, কিছুদিন পরেই তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

গ্রীষ্মের আধিক্য জন্য ইন্‌ছান্ আলী কয়েক রাত্রি হইতে বাহিরে শয়ন করিত; সেদিনও তেমনি ভাবে শুইয়া ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তাহার জ্বর আসিল। অনেক রকমের চিকিৎসা-সত্ত্বেও জ্বর কমিল না, বরং বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। অবশেষে ৭ দিনের দিন সে তাহার প্রাণ-প্রতিম ভগিনী নুরন্নেহারের অকৃত্রিম ভালবাসা,—দাদির স্নেহ,—পাড়া-প্রতিবেশীর আগ্রহ সমস্তই ঠেলিয়া ফেলিয়া, কোন্ অজানা দেশের আহ্বানে যে চলিয়া গেল, তাহা কে জানে!

ইন্‌ছান্ আলীর বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভগিনীকে যেমন শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছে, তেমনিই উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ [illegible] কে খণ্ডাইতে পারে? তাহার আশা তাহার অন্তরে রহিয়া গেল। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই, সে যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই নুরের কথা বলিতে লাগিল। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুধু নুরেরই চিন্তা। শুধু নুরেরই জন্য যেন তাহার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা, যেন শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সে মৃত্যুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করিয়া জিতিতে চাহিয়াছিল। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের এক মিনিটমাত্র বিলম্ব হইয়াছে দেখিয়া, নুরকে কত তিরস্কার করিল। হায়রে মানুষের আকাঙ্ক্ষা! যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিই হউক না কেন, মৃত্যু যাহাকে টানিতেছে, এমন কাহার সাধ্য আছে যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে। নুর ঔষধ সেবন করাইয়া গেলাস রাখিতে না রাখিতেই সব শেষ!!

নুরের প্রতি ইন্‌ছানের স্নেহ এতটা বেশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। পিতৃমাতৃহীনা দুই বৎসরের ছোট ভগিনীটীকে সে একাধারে পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, ভাইয়ের আদর দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। মাতার মৃত্যুর তিন মাস পরে নুরের যখন অসুখ হইয়াছিল, তখন ১০ বৎসরের বালক ইন্‌ছান্ কতই না কষ্ট সহ্য করিয়া, সমস্ত রাত্রি বোন্‌কে বুকে করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে। দাদিরও সেই সময়ে হাঁপানি রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

নুরের পিতামহী কিছু দিনের মধ্যেই শোক সামলাইয়া উঠিলেন। কিন্তু নুরের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠি। সে যেন একটা জীবন্ত ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফলে তাহার শরীরও দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

নুরের অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া উঠিল যে, সকলেই স্থির-নিশ্চয় করিল যে, ভাইয়ের স্মৃতি বুঝি বা তাহাকেও ইহসংসার হইতে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু দাদি আম্মার যত্নে ও স্নেহ সান্ত্বনায় নুর ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল।

নুর সুস্থ হইলে দাদি নুরের বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইল। আর কতদিনই বা রাখা যায়? নানা কারণে এত দিন ঘটিয়া উঠে নাই। যখন বিবাহ দিতেই হইবে, তখন আর দেরি করিয়া লাভ কি? নুরের মাসীরাই

বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; যাহাতে শীঘ্র সমাধা হয় এই কথা তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন।

বসন্তকাল আসিলেও প্রকৃতির জড়তা তখনও দূরীভূত হয় নাই; কিন্তু না করিলেই নয় বলিয়াই যেন বাধ্য হইয়া প্রকৃতি অঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিতে সুরু করিল।

সেই সময়ে এক দিন অপরাহ্ণে নুর প্রতিবেশী এক বালিকাকে পড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; এমন সময়ে নুরুদ্দিনকে আসিতে দেখিয়া লজ্জায়, বিস্ময়ে ও আনন্দে অধোবদন হইয়া রহিল। নুরুদ্দিন নুরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে নুর! অমন শুকিয়ে গিয়েছ কেন? অসুখ ক'রেছিল না কি? তোমার ভাই সাহেব এখন কোথায়?" হায় ভাই সাহেব! ভাই সাহেব কোথায়? তাহার প্রশ্নে নুরের রুদ্ধ অশ্রু প্রবলবেগে বাহির হইতে লাগিল। সে শোকাশ্রু-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল "ভাই সাহেব তো আর নাই!!" নুরকে কাঁদিতে দেখিয়া এবং বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তাহার পরে ঘরে যাইয়া নুরের পিতামহীকে সালাম করিতেই বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ভাই! ভাই তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। বোন আর এই বৃদ্ধা—এই দুই অবলা নারীকে রেখে সে ৭ দিনের জ্বরে চলে গেল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার মুখে কেবল নুর—কেবল নুর।"

নুরুদ্দিনও অশ্রু মুছিতে মুছিতে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করতে খোদা এমন করলেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন।"

নুরের পিতামহী কিছুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিও সেই চলে গেলে ভাই, আর তোমারও দেখা নাই।"

নুরুদ্দিন বলিল, "আমি যে এতদিন ছিলাম না দাদি। এখান থেকে গিয়ে মাস ছয়েক পরে পুলিশের অত্যাচারে জেলে যেতে হয়েছিল।" দাদি-আম্মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "জেলে! কেন?"

"জানেন না, সত্যাগ্রহ-ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্যে পুলিশ কত শত নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে জেলে দিয়েছিল? আমিও বাদ পড়ি নি। মাস চারেক হলো জেল থেকে ফিরেছি। এমনই হঠাৎ পুলিশ ধরে নিয়ে গেল যে, সংবাদ পর্য্যন্ত কাউকে দিতে পারি নি।"

নুর এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল—নুরুদ্দিনের জেলে যাওয়ার কথা শুনিয়া অতর্কিতে তাহার একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিল, "এতদিন বৃথাই আমি দোষ দিয়েছি। জেলে না জানি ইঁহার কত কষ্টই হয়েছে।" দাদি-আম্মা নুরুদ্দিনের সঙ্গে বসিয়া সাংসারিক আরও অনেক রকম আলোচনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়া নুরুদ্দিন দাদি-আম্মাকে সেলাম করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

নুরের পিতামহী রাত্রে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! এই অল্প বয়সেই জেল খেটে একটা নিন্দার ছাপ নুরুদ্দিনের অদৃষ্টে চিরদিনের জন্য রয়ে গেল।" নুর বলিল, "নিন্দার ছাপ কি রকম? এ কি চুরি করে জেল খাটা! এ যে গৌরবের কথা—দেশের জন্য জেল খাটতে কটা লোক পারে?" পিতামহী বুঝিতে না পারিলেও শুধু বলিলেন, "হবে হয় তো।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়ার পর নুরুদ্দিন বলিল, "আমি বিকেলে বাড়ী যাব, দাদি-আম্মা।"

"আজই যাবে ভাই!" "হাঁ" বলিয়া নুরুদ্দিন সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বৈকালে নুরুদ্দিন আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল। নুরের পিতামহী বলিলেন, "সংবাদ-আদি নিও ভাই, একেবারে যেন ভুলে থেকো না।"

"হাঁ, নেব বৈ কি?" তার পর একটু থামিয়া বলিল, "নুরের বিয়ের সময় খবর দিতে যেন ভুলবেন না, দাদি-আম্মা।"

"তা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না ভাই; তোমাকে না ব'লে কি আর হবে! তোমরাই ধ'রে দেখে শুনে দেবে না তো আমার আর কে আছে যে করবে?"

বিবাহের কথা উঠিতেই নুর ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাদির উপর রাগ করিতে লাগিল; মনে মনে বলিতে লাগিল, ওর সামনে বিয়ের কথাটা না বললে কি হ'ত না? ভারি একটা সুখবর কি না, সকলের কাছে বল্‌তেই হবে।

নুরুদ্দিন দাদির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে অদূরে নুরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নুর তখনও বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাদির উপরে অহেতুক রাগিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া চাহিতেই নুরুদ্দিনের চক্ষুর সঙ্গে তাহার চক্ষু মিলিত হইল; কি এক মহা লজ্জায় তাহার চক্ষু অবনত হইয়া আসিল। নুরুদ্দিন দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "নুর চল্লাম; আর হয় তো ইহ জন্মে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। যাক্, খোদার কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।" এই বলিয়া সে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

নুরুদ্দিন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে ছিল, নুর ততক্ষণ পর্য্যন্ত একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় ও কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; সে একটী কথাও বলিতে পারিল না।

নুরের পিতামহী পাড়া প্রতিবেশী স্ত্রীলোক দিগকে ডাকিয়া আনিয়া পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু কাজ গুছাইতে লাগিলেন। সেদিন কাজের ঝঞ্ঝাট চুকাইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল; বৃদ্ধা খাওয়া দাওয়া সমাধা করিয়া যাইয়া শয়ন করিলেন। নুর সেই মেয়েটিকে বারান্দায় পড়াইতে বসিল। হঠাৎ ঘরের মধ্য হইতে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া নুর দৌড়িয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শরীরের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া আসিল। দাদির হাত পা সমস্ত কাঁপিতেছে, এবং মুখ হইতে অজস্র লালা নির্গত হইতেছে। সে মেয়েটীকে ইঙ্গিতে কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে বলিয়া, দাদির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা নাই, কিন্তু যতদিন জীবিত রহিবে, এক অঙ্গ অবশ হইয়াই রহিবে।" অনেকে আসিল গেল, কিন্তু নুর ঠিক একই ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের ব্যথা শুধু সেই অন্তর্যামীই জানিলেন।

সকলে একে একে চলিয়া গেলে, প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া নুরের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মা নুরা!" তাঁহার স্নেহ-বাক্যে নুর সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল, এবং ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আর্দ্র-কণ্ঠে বলিল, এমনি ক'রে তপ্ত লোহার শিক দিয়ে আমার হৃদয়কে শতধা বিদ্ধ করছেন! সে এমন কি গুরু অপরাধ!"

নুর বহুক্ষণ কাঁদিয়া শ্রান্তদেহে সেই রমণীটীর কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল। রমণীটি ঘুমন্ত নুরের দৈন্য-প্রপীড়িত করুণ মুখখানির প্রতি স্নেহমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জন্ম-দুঃখিনী হয়েই কি জন্মেছিলি মা! খোদার কাছে শুধু কি তোর জন্য অভিসম্পাতই জমা ছিল!"

রমণীটী বন্ধ্যা হইলেও আজ এই অসহায়া বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে বাৎসল্যের মহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা জননীর অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। রাত্রে তিনি নুরের কাছেই শয়ন করিলেন।

সংবাদ পাইয়া কয়েক দিন পরে নুরের মাসী আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। নুরের মাসীরা বেশ অবস্থাপন্ন লোক। ৩।৪টা চাকর চাকরাণী অনবরত বাড়ীতে খাটে। শুধু দাদির তত্ত্বাবধান ব্যতীত নুরকে আর কিছুই করিতে হয় না।

নুরের বিবাহ আর সেখানে হইল না; বিবাহের কথাবার্ত্তা সুরু হওয়ার পর হইতেই এমন অশুভ ঘটনা ঘটিতে লাগিল দেখিয়া, সেখানে বিবাহ দিতে আর কাহারও ইচ্ছা হইল না। কয়েক দিন হইল নুরের মাসতুত ভগিনী স্বামী-গৃহ হইতে আসিয়াছে। নুর ইহাকে শৈশবে একবার মাত্র দেখিয়াছিল; তাহার পর এই দেখা। ইহার নাম খদিজা।

খদিজা ছিল যেন ভোরের নববিকশিত স্নিগ্ধ সুন্দর একটি ফুল। তাহাতে মলিনতা নাই; যেন রূপ, রস, গন্ধে সর্ব্বদা পূর্ণ। সতত হাস্যময়ী। সে নুরকে টানিয়া এখানে সেখানে লইয়া যাইয়া তাহার বিমর্ষতা দূর করিবার চেষ্টা করিত। নুরের মলিন ভাব তাহার সরল প্রাণে বড়ই ব্যথা দিত। এক দিন দুঃখ করিয়া সে বলিল, "ভাই! নামের সঙ্গে চেহারার তো মিল আছেই, একবার মনটীকেও নুরের ন্যায় আলোকিত কর।"

নুর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা কি আর হবে বুবু! নুরের আলোটি ভাল রকম বিস্তার হ'তে না হ'তেই ভীষণ ঝঞ্ঝায় যে সে নিভ-নিভ হ'য়ে গিয়েছে।"

"যা হবার তা হ'য়েছে বোন, এইবার তোমাকে জ্বালিয়ে উঠাতেই হবে।"

নুর মুখে কিছু বলিল না ; মনে মনে বলিল, "জ্বালাব কি দিয়ে, জ্বালাবার যে একটী উপকরণও নেই !"

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে নুর দাদিকে খাওয়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া খদিজার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অন্য দিন খদিজা এতক্ষণ প্রায় ৩।৪ বার আসিয়া তাহার সন্ধান লইত। আজ না আসিবার কারণ কি ? সে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া পার্শ্বস্থ বাড়ীতে দেখিতে গেল। সে বাড়ীর সাজেদা নাম্নী একটী বউয়ের সঙ্গে খদিজার ছোট বেলা হইতে অত্যন্ত মিল। অনেক সময়ে খদিজা সেখানে যায় ভাবিয়া নুর সেখানে দেখিতে গেল ; কিন্তু খদিজা সেখানেও নাই। বউটী তখন ঘরের মধ্যে ছিল। বাড়ীতে আসিয়া তাহার খানা-আম্মার ঘরে দেখা হয় নাই মনে করিয়া সেই ঘরে গেল ; যাইয়া দেখিল, খদিজা বিছানার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে।

নুর বলিল, "কি ভাবছ বুবু, কি হ'য়েছে ?" খদিজা বলিল, "মনটা আজ বড় ভাল নাই বোন !" "কেন ?"

"কি শুন্‌বি ; যা শুনে প্রতীকার কর্‌তে পারা যায় না, শুধু দুঃখই হয়, তা শুনে মন খারাপ করার দরকার কি ?"

"তবুও বল না শুনি।"

"বৈকালে সাজেদাদের ওখানে গিয়েছিলাম ; গিয়ে শুনি তাকে তার স্বামী মেরেছে।"

এই সাজেদাকে খদিজা কেমন ভালবাসে, তাহা সে জানিত। খদিজার মনে যে দুঃখ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"কেন মেরেছিল ?"

"টাকা পয়সা নিয়ে কি গণ্ডগোল হ'য়েছিল তাই। সে কি ভীষণ মার ! মেয়েটী স্বামীর কোন কাজে এত দিন প্রতিবাদ করে নি ; করলে বোধ হয় রোজই মার খেত। বড় দুঃখ হয় বোন, যে, শিক্ষিত লোক হ'য়ে, এমন ক'রে স্ত্রীকে মারে। অশিক্ষিত হ'লে কথা ছিল, কিন্তু শিক্ষিত লোক হয়েও——"

নুর তেজব্যঞ্জক স্বরে বাধা দিয়া বলিল, "শিক্ষিত ! ঐ ত তোমাদের ভুল ; তোমরা ভাব বি-এ, এম-এ পাশ করেছে আর শিক্ষার চূড়ান্ত হয়েছে। সে যে শুধু বই মুখস্থ করে পাশই করেছে ; শিক্ষার ধার দিয়াও যায় নাই, মানুষ হওয়ারও চেষ্টা করে নাই। মান্‌লাম, স্ত্রী ওর অপরাধ করেছিল, কিন্তু পশুর মত ঠেঙ্গাইয়া কি সে শায়েস্তা করিতে চায় ? লাভের মধ্যে তাতে এই হয় যে, মারের ভয়ে সে কিছুদিন ঠিক মত চলে, পুনরায় যেমনকার তেমনিই। যদি ভালও চলে, সেটা জোর করে বই তো নয় ? যথার্থ ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা যে জিনিষটা পাওয়া যায়, তাহা জোর করে কিছুতেই পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত পুরুষ মনে করে, তারা শক্তির জোরে সব জয় করবে ; জয়ও হয় তো কখন-কখনও করে, কিন্তু আপনা হতে যা পাওয়া যায়, তা ভোগ করে যা তৃপ্তি হয়, জোর করে যা পাওয়া যায়, তাতে তেমন তৃপ্তি কিছুতেই হয় না ; কেন না মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তি থেকে যায়। পশুকে ইঙ্গিতের দ্বারা চালিয়ে কত দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ করা যায়, আর মানুষকে লাঠির সাহায্য ব্যতীত বশীভূত করা যায় না, তা তো বুঝা যায় না।"

খদিজা মন দিয়া নুরের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল এবং নুরকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "নুর, এই তো আজ আলো একটু ফুটে বেরিয়েছে বোন্ ; তবে যে তখন বলেছিলি—আচ্ছা, চল যাই" বলিয়া, নুরের হাত ধরিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল, "সবাই যদি বুঝে চল্‌তে পার্‌তো, তবে কোন কথাই ছিল না।"

নুরও তাহার কথায় সায় দিয়া বলিল, "কথাই হ'চ্ছে তাই কি না ; বুঝে চলবার জন্যই তো শিক্ষার দরকার হয়। যথার্থ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হ'লে, ভালমন্দ বুঝ্‌তে পারলে, নারী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা পায় না ব'লে এক একটা গর্হিত কাজ ক'রে ফেলে। কি কর্ত্তব্য অনেক সময়ে বুঝে উঠ্‌তে পারে না। না বুঝ্‌তে পেরে উল্টো কাজ ক'রে অনেক অশান্তি ভোগ করে।"

খদিজা তিন মাস পিতৃগৃহে থাকিয়া স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছে। খদিজা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নুরের মনটা পুনরায় খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে থাকিলে নানারূপে নুরকে অন্যমনস্ক রাখিত। তাহার খানা-আম্মা

বসন্ত সমাগমে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চগ্‌তাই B. H. P. Works.

দুই একটী কথা ছাড়া কোন কালেই বেশী কথা বলে না।

নুরুদ্দিন ঘণ্টাদুয়েক পরে বাড়ীতে আসিয়া, মাকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার ভগিনীদ্বয় যেখানে পড়িতেছিল, সেই স্থানে যাইয়া হাসেনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাসেনা, মা কোথায় ?”

“মা ! ঐ যে ঘরে নামাজ প’ড়ে তসবী তেলাওত করছেন !”

“এখনও হয় নাই ?”

“কি জানি, বল্‌তে পারি না” বলিয়া হাসেনা উঠিতে চাহিল। নুরুদ্দিন বলিল, “তোমার উঠে দরকার নাই। তোমরা পড়” বলিয়া হাসেনা ও সালেহাকে পড়া বলিয়া দিয়া সে মার ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিল। মা তাহার কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া, পুত্রের নিকট একটা টুলের উপরে বসিয়া বলিলেন, “কোথায় গিয়েছিলে নুর, এই দুই তিন দিন ধরে। বলা নাই, কহা নাই। আমি যে এখনও মরি নাই, সেটা তো মনে রাখা চাই !” নুরুদ্দিন তাহার কথা শুনিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, “বল্‌ছি মা শোন, তার পর যা ইচ্ছা হয় বলো। আমি সেদিন জমিরুদ্দিনের মার কান্না শুনে বাড়ীর মধ্যে গেলাম ; গিয়ে শুনি, জমিরুদ্দিনের বোনের ভয়ানক অসুখ ; বাঁচবার আশা খুব কম। এই শুনে তার মা কাঁদছে। একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে সে যেতে চায় ; কিন্তু যাবে কার সঙ্গে। জমিরুদ্দিন তার মার সঙ্গে ঝগড়া ক’রে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। বৃদ্ধার করুণ কান্না শুনে বড় দুঃখ হ’লো। তাই ওর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে জমিরুদ্দিনকে খবর দিয়ে ওকে সঙ্গে ক’রে আন্‌তে দেরি হ’য়ে গেল। ও-পাড়ার কাউকে যদি বল্‌তাম, তা হ’লে হয় তো যেতো—কিন্তু বৃদ্ধার কাউকেও বিশ্বাস হয় না—আর জমিরুদ্দিনও তাদের কথা শুন্‌বে না ; ভাব্‌বে বুঝি তাহার মা একটা কৌশল ক’রে তাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আমার কথা যে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে, এই বৃদ্ধার ধারণা। আমার দ্বারা যদি কারুর একটু উপকার হয়, তো কর্‌তে বাধা কি, এই ভেবে গিয়েছিলাম ; এ কি কোন খারাপ কাজ ক’রেছি মা ?”

মাতা পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, “[illegible] কাজই ক’রেছিলি বাছা ; আমি তো তা জান্‌তাম না। আমার ছেলের তো এ উপযুক্ত কাজ ; কিন্তু দুঃখ হয় এই—পরের দুঃখ যে এত বোঝে, সে আপন মায়ের দুঃখ কেন বোঝে না, তাই ভাবি।” নুরুদ্দিন অনুসন্ধিৎসু-নেত্রে মাতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি দুঃখ তোমার বুঝি না মা ?”

“কি দুঃখ ! কোন্ দিন কখন হঠাৎ মরে যাই তার ঠিক নাই। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হ’লো না ; তার পর এই বুড়ো হাড় নিয়ে তোর পিছনে পিছনে ঘুরতে হয়। আমি পার্‌ব না বাপু আর !”

নুরুদ্দিন বুঝিল মার দুঃখ কি। এত দিন বলিয়া কহিয়াও যখন দেখিলেন, ছেলেকে সম্মত করান কঠিন, তাই আজ তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন। না তো ছেলেকে খাওয়ানর ভার অন্যের হস্তে দিয়া তিনি কিছুতেই তৃপ্তি পান না এবং পাইবেনও না, সে হাজার তাঁহার বিশ্বাসী লোক হউক না কেন !

মৃদু হাসিয়া নুরুদ্দিন বলিল, “ওঃ, সেই পুরানো কথা !”

নুরুদ্দিনের মা অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কেন তুই এ কথাকে এমন ক’রে উড়িয়ে দিতে চাস্ বল্ দেখি। না, আজ তোকে বলতেই হবে।”

নুরুদ্দিন মস্তক নত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল ; কোন জবাব দিল না।

তাহার মা পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, “এবার আমি এক স্থানে ঠিক ক’রেছি, ওখানে তোকে বিয়ে কর্‌তেই হবে ; এমন মেয়ে আর পাওয়া যাবে না।” নুরুদ্দিন হাসিয়া বলিল, “তোমার প্রত্যেক বারেই শুনি ‘এমন মেয়ে পাওয়া যাবে না’, আবার পাওয়াও যায়।”

তাহার মা গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, “সত্যি, এবারকার মেয়ে বড় সুন্দর।”

নুরুদ্দিন বলিল, “আচ্ছা সে সব পরে হবে, এখন আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।”

নুরুদ্দিনের মা ভাত দিবার জন্য উঠিলেন এবং যাইতে যাইতে আর একবার বলিলেন, “এবার আর নড়চড় করতে দেব না, তা আগে থেকেই বল্‌ছি তোকে।”

মাস দুই পরে নুরুদ্দিন রাত্রে আহারে বসিয়াছে ; নুরুদ্দিনের মা বলিলেন, “আমি ওদের পাকা কথা দিয়ে দিয়েছি, এই মাঘ ফাল্গুনেই—” নুরুদ্দিন এতক্ষণ অন্যমনস্ক

ছিল, এক্ষণে তাহার মাতার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বলেছ কাকে মা ?"

তাহার মা বলিলেন, "তোর বিয়ের কথা আর কি।"

নুরুদ্দিন অভিযোগ করিল, "কেন আমাকে না ব'লে জওয়াব দিলে মা !"

তাহার মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'য়েছে, আমায় খুলে বল দেখি, বাবা !"

"আচ্ছা, কাল বল্‌ব" বলিয়া যে কোন রকমে খাওয়া সারিয়া আপনার ঘরে আসিয়া শয়ন করিল।

নুরের দাদি ৮মাস কষ্টভোগ করিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নুর তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আপন মনে বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "থাক্, একে একে সব বন্ধনই তো ছুটে গেল ; আর কি ! এখন নিজের মরবার পালা। তারও বোধ হয় দেরি নাই, রোজ রাত্রেই তো জ্বর হচ্ছে ! এমন সুখের অদৃষ্ট আর কার হয়। শুনি, তুমি দয়ার সাগর খোদা ! আমার উপরে কি এই সমস্তই দয়া ! বাপ মা কি রকম তা তো জানলাম না ! তবুও দুঃখ ছিল না ; অমন ভাইকে পেয়েছিলাম, তাকেও নিলে। অন্ধের যষ্টির মত বৃদ্ধা দাদি—তিনিও গেলেন। ভবিষ্যৎ ! তাও তো সুখের হবে না ! ওগো আর কত দুঃখ দিবে !"

নুরুদ্দিন সকালবেলা উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ছোট ভগিনী হাসেনা আসিয়া বলিল, "ভাই, সামসুদ্দিন ভাইয়ের বাড়ীর ভাবী (ভ্রাতৃজায়া) এসে তোমাকে ডাকছে।"

নুরুদ্দিন বলিল, "কেন, বল দেখি।"

"কি জানি, আমি জানি না।"

নুরুদ্দিন ভ্রাতৃজায়ার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ ভাবী, ঝগড়াঝাটি মীমাংসা করতে হবে না কি ?" রমণীটি বলিল, "তা নয় তো কি ? নিজের মনের দ্বন্দ্ব যে ঘুচাতে পারে না, সে যাবে পরের ঘরের ঝগড়া মিটাতে।"

নুরুদ্দিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "তার মানে ?" রমণীটি হাসিয়া বলিল, "তার মানে হচ্ছে এই, শুনলাম না কি, বাপু আম্মার কাছে তুমি বিয়ে না করবার কি এক কৈফিয়ৎ দেখাতে চেয়েছ, কিন্তু মাসাবধি ধরে সে জওয়াব আর তোমার দেওয়া হ'ল না। ফুপু আম্মা বল্লেন, 'বাছা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।' তাই বল্‌ছি, কি নিয়ে তুমি মায়ের সঙ্গে এমন করে যুঝছ ? আমাকে কিন্তু বল্‌তেই হবে। আমি নাছোড়বান্দা, না শুনে আর এখান থেকে উঠব না কিন্তু। কিন্তু তার আগে আমার একটী কথা—সত্যি বল্‌ছি তোমায় এমন একটী রত্ন দিব, অমন তুমি সারাজীবন ধরে খুঁজলেও পাবে না।"

নুরুদ্দিন হাসিয়া বলিল, "তার পর ?"

রমণী বলিল, "হাস্‌ছ তুমি ! কিন্তু সত্যই অত্যন্ত গুণবতী সে ; অনেক শিখেছে, আর অনেক জানে। বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরবী, উর্দ্দু—এই কয়েকটী ভাষাই সে জানে। 'ক্লাশ এইট্' পর্য্যন্ত পড়েছে ; আরবী, উর্দ্দু মৌলবীর কাছে পড়ত। তার পর সাংসারিক অনেক সদ্‌যুক্তি সদ্‌বিষয় তার কাছে পাবে—"

নুরুদ্দিন বলিয়া উঠিল, "তাই না কি ? আজকাল পাশ-করা স্কুল কলেজের মেয়েদের যা রকম হ'য়েছে, আর তাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের হাওয়া যে রকম জোর ব'চ্ছে, তা শুনেই আক্কেল গুড়ুম। অমন মেয়েকে নিয়ে এসে নিজেকেই রান্নাঘরে ঢুকতে হোক্ ! কেমন ? ইনি আবার সদ্‌যুক্তি দেবেন, কথায় কথায় কর্ত্তব্য শেখাবেন ! দরকার নেই অমন মেয়ের কথা শুনে—"

ভাবী সাহেবা আহতনেত্রে নুরুদ্দিনের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তোমার কথা কতকটা সত্যি হ'লেও, সে তেমন নয়, একেবারে ভিন্ন রকমের। সে দিন তো আমার এই নিয়েই ওর সঙ্গে কথা হলো। শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বে, ও কেমন মেয়ে। কথায় কথায় আমি তাকে বল্লাম, আধুনিক শিক্ষার ফলেই এমন হচ্ছে ! শিক্ষার তো দেখ্‌ছি অনেক রকম নূতন নূতন প্রণালী হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা যেন ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। আজকাল শিক্ষিতা হ'য়ে যা হচ্ছে তা না হওয়াই ভাল।"

সে বল্লে, "তা সত্যি, শিক্ষার নামে যে কুশিক্ষাগুলি শেখা যাচ্ছে, তারই জন্য এম্‌নি হচ্ছে ! আজকাল শিক্ষয়িত্রীদের লেখাপড়ার দিকে যত দৃষ্টি নাই, তত দৃষ্টি পোষাকে

হচ্চে। কি কাপড় পর্‌লে তাকে ভাল দেখাবে, কেমন-ভাবে পর্‌লে ভাল হবে—এই সবেই তাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। যা'ও একটু লেখাপড়া করে, তা শুধু পাশ করার জন্যই ; ভবিষ্যতে যে তা কোন কাজে আস্‌বে, তা ভাবে না। লেখাপড়ার চেয়ে বিলাসিতা চতুর্গুণ শেখে ; আর অল্প শিক্ষার দরুণ তার মনে যে গর্ব্ব হয়, তাই নিয়ে স্কুল কলেজ থেকে বেরোয়। চরিত্র ঠিক ভাবে গঠিত না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের সাধারণ কমনীয় ভাব সকল আর তাদের মধ্যে থাকে না ; ফলে কারো কারো চরিত্র কলুষিত হয়। অনেকে লজ্জার ধার ধারে না ; কেউ কেউ উদ্ধত-স্বভাব হয় ; অনেকে সংযম-শক্তি হারিয়ে ফেলে। আপনাকে সংসারে ঠিক ভাবে চালা'তে পার্‌বে—এই উদ্দেশ্যেই পিতামাতারা ছেলে-মেয়েকে স্কুল কলেজে পড়্‌তে দেন। কিন্তু স্কুল-কলেজে এরূপ ধরণের কোনই শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া, মেয়েরা শ্বশুর-ঘরে এসে, অনেকে রাঁধাবাড়া না জানার জন্য কত যে কষ্ট ভোগ করে, তার ঠিক নেই। অনেকে হয় তো অসচ্ছল সংসারে এসে পড়ে। তার ভোগ-বিলাস পূর্ণ না হওয়ার জন্য তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয় ; তাতে নিজেও অশান্তি পায়, স্বামী বেচারীও কষ্ট পায়। অশিক্ষায় যেমন হয়, কুশিক্ষায়ও তেম্‌নিই হচ্চে। উপযুক্ত শিক্ষা হ'লে তো কোনই গণ্ডগোল নাই। আমরা চাই সুশিক্ষায় চরিত্রকে দৃঢ় করাতে, আর নারীত্বের আসন স্থির-প্রতিষ্ঠ করতে। কিন্তু এ সব কর্‌তে গেলে বিলাস-ব্যসন আমাদের ত্যাগ কর্‌তে হবে। ঘরকন্নার কাজও ছাড়া হবে না, পুস্তকের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকা'লেও চল্‌বে না। নিজেকে উন্নত কর্‌তেই হবে। তুমি স্বাধীন হওয়ার কথাটা যেমন ভাবে বল্লে, তা শুনে দুঃখ হলো। এটা মনে রেখো, নিজেকে ঠিক রেখে যে বিদ্যাই শিক্ষা কর না কেন, মানুষ বিগড়ায় না ; স্কুল কলেজেও আমাদের খারাপ কর্‌বে না ; আর মেম সাহেবদের হাওয়াও তা হ'লে আমাদের গায়ে লাগ্‌বে না। আমাদের কথা হচ্চে এই—যদি কাজ কর্‌বার বুদ্ধি আর ক্ষমতা আমাদের থাকে, তবে নিজের নিজত্ব বজায় রেখে কেন আমরা সে কাজ কর্‌ব না ? স্ত্রীলোকেরা যদি বাইরের কাজের উপযুক্ত হয়, তবে কেন তারা তা কর্‌বে না ! আমরা যে মানুষ, এ কথা পুরুষেরা একেবারে ভুলে গিয়েছে ; আমাদের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ ক'রে অবরোধ ক'রে রেখে দিয়েছে !! যাক্, কি কথাতে কি কথা উঠ্‌ল।" এই বলিয়া সে নীরব হইল।

নুরুদ্দিন তাহার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই ভাবীকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করিত ; আজ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভাবী পুনরায় বলিল, "সে চেয়ারেই শুধু বসে থাকে না,—খুব সুন্দর রান্না কর্‌তে জানে, হিসাবেও পাকা। সংসার-অভিজ্ঞ বৃদ্ধকেও সে হার মানায়।"

নুরুদ্দিন বলিয়া উঠিল, "গুণের তা হ'লে তার তুলনা নাই। রূপ কি রকম ?"

"সেও অতুলনীয়।"

"বটে !"

"হাঁ।"

নুরুদ্দিন পরিহাস-সহকারে বলিল, "ও, তা হ'লে সূর্য্যের কিরণ, না চাঁদের আলো, না আঁধার ঘরের নুর ? কি বল ?" ভাবীসাহেবা বলিল, "পরিহাস কর্‌লেও রূপ এমনিই বটে। আর নামেও যেমন নুর কাজেও তেমনি। চম্‌কে উঠ্‌লে যে !"

নুরুদ্দিন ওকথা কাণে না তুলিয়া বলিল, "নাম নুর না কি ?"

হাঁ ; কেন ?"

"না, তাই বল্‌ছি।"

এমন সময়ে হাসেনা আসিয়া বলিল, "ভাবী, বাড়ীতে তোমাকে শীগ্‌গির ডাকছে। বড় ভাই এসেছেন।"

ভ্রাতৃজায়া চলিয়া যাইবার পর নুরুদ্দিন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সেই নুরই কি এই ? তাই বা কেমন ক'রে হবে ! আমি তো ওখান হইতে ঘুরে আস্‌বার পর ৩ মাস পরে পুনরায় সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু পাতি পাতি ক'রে খুঁজেও তাদের তো কোনও সন্ধান পাই নাই ! নুরের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে ; বৃদ্ধা দাদিকে সঙ্গে ল'য়ে সে শ্বশুরালয়ে গিয়েছে ; সেই জন্যই তো তারা ওখানে নাই ! ইহাই তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস ! সেই জন্যই তো আমি আর কাহাকেও

কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া চলিয়া আসিয়াছি এদিকে এঁরা বিয়ের জন্য জেদ ধরে পড়েছেন ; কিন্তু নুরুদ্দিন বিয়ে কর্‌বে কি ক'রে ? নুরের স্মৃতি যে তার হৃদয় ভ'রে রয়েছে ; কিছুতেই যে সে তাকে ভুল্‌তে পার্‌ছে না। না, না, সে বিয়ে কর্‌বে না ; বিয়ে ক'রে কি একটা নিরপরাধ বালিকাকে চিরজ বন কষ্ট দিতে নিয়ে আস্‌বে !"

সামসুদ্দিন নুরুদ্দিনের মামাতো ভাই ; নুরুদ্দিন প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে যাইত। সে দিনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কই ভাবী, সেদিন বিয়ের কথা বলে এসে আর তোমার দেখা নাই ; আমি ওদিকে চাতক পাখীর মত কখন একবিন্দু পানি পড়ে এই আশায় বসে আছি—" বলিয়াই ঘরের চৌকাটে পা দিতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবী সাহেবা অন্য ঘরে কি কাজে ব্যস্ত ছিল ; নুরুদ্দিনের গলার স্বর শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঃ, একেবারে দিনে ডাকাতি যে !"

নুরুদ্দিনের মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না ; তাহার মনে হইল, এ কি সত্যি, না স্বপ্ন !

ভাবী বলিল, "কথা বেরুচ্ছে না যে !"

নুরুদ্দিন কথা কহিবে কি ! তাহার হৃদয়ে যে প্রবল আনন্দের ঝড় প্রবাহিত হইতেছিল, তখনও তাহা থামে নাই। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "কথা বেরোবে কি, অসম্ভবও যে সম্ভব হলো !"

ভাবী সাহেবা ভাবিল, নুরুদ্দিন পরিহাস করিতেছে ; তাই রুষ্ট হইয়া বলিল, "তামাসা করলে আর কি হবে ! এখন বুঝ্‌ছ না, পরে কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌বে। যে এমন সৌন্দর্য্যের কদর জানে না, তাকে আর কি বল্‌ব—সে হচ্ছে অন্ধ।"

নুরুদ্দিন বলিল, "আমিও তো তাই বল্‌ছি।"

"তবে তোমার মত আছে ?"

"নিঃসন্দেহে !"

ভাবী হাসিয়া বলিল, "তা আর হবে না ! এ সৌন্দর্য্য দেখ্‌লে মুনি ঋষিরও মন টলে, আর তুমি তো সাধারণ মানুষ !" নুরুদ্দিন বলিল, "শুধু তাই নয় ভাবী, আরও কারণ আছে।"

"আরও কারণ ?"

"হাঁ ; আমাদের বাড়ীতে যেও, সব বল্‌ব। এখন আমি যাচ্ছি।"

নুরের দাদির মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, নুরের সঙ্গহীন ও নিরাশ্রয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া, খদিজার মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল ; তাই সে নুরকে কিছু দিনের জন্য তাহার নিকট লইয়া আসিয়াছে।

এই খদিজাই যে নুরুদ্দিনের ভ্রাতৃ-জায়া, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ হওয়ার কয়েক দিন পরে এক দিন বৈকালে নুরুদ্দিন একখানা বই হাতে লইয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল ; কিন্তু তাহার দৃষ্টি দরজার দিকে নিবদ্ধ ছিল। খদিজা কি একটা জিনিষ সহ নুরকে টানিয়া আনিল ; খদিজাকে দেখা সত্ত্বেও নুরুদ্দিন পুস্তকের দিকে এমন ভাবে ঝুঁকিয়া রহিল যে, সে যেন কিছুই জানে না। খদিজা অনুচ্চস্বরে নুরুদ্দিনকে শুনাইয়া বলিল "ইস্‌, কি গভীর মনোযোগ ! দৃষ্টি যদি না এতক্ষণ দরজার দিকে প'ড়ে থাক্‌তো তা হ'লেও হ'তো ! ত মহাশয়ের এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে আজ্ঞা হোক্ একটা মজার জিনিষ এনেছি—" বলিয়া নুরকে লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাগজে মোড়া কি একটা বাহির করিতেই, নুর লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বুবু, তুমি ভারি দুষ্ট ! দাও ওটা আমাকে—" বলিয়া লইতে গেল, কিন্তু লইবার পূর্ব্বেই নুরুদ্দিন ক্ষিপ্র-হস্তে খদিজার হাত হইতে তুলিয়া লইল।

কাগজ খুলিতেই নুরুদ্দিন বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ তো তাহারই রুমাল ! যখন ইন্‌ছানের সঙ্গে সে নুরদের বাড়ীতে গিয়াছিল, তখন ঐ রুমালখানা তাহার পকেটে ছিল। আসার সময়ে ছেঁড়া রুমালখানা সে আবর্জ্জনার কাছে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। ধোপ পড়িয়া পড়িয়া কাপড় পচিয়া গিয়াছিল ; সামান্য টান দিলেই ছিঁড়িয়া যাইত। সেই সামান্য জিনিষটীকে বাঁচাইয়া রাখিবার কত যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও তালি, কোথাও যোড়া, কোথাও রিপু দিয়াও তাহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া হয় নাই।

তাহার ভগিনী কালো সূতা দিয়া তাহার নামের প্রথম অক্ষর দুটী ঐ রুমালের এক কোণে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার নামমাত্র চিহ্ন আছে ; কিন্তু আর এক স্থানে ঐ অক্ষর দুটী অতি সুন্দরভাবে তোলা হইয়াছে।

নুরুদ্দিন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রিয়তমা-রক্ষিত তাহারই তুচ্ছ, পরিত্যক্ত জিনিসটি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। উহাতে অঙ্কিত কত যে গোপন প্রেমের বাণী নুরুদ্দিনের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেলায়ের সময়ে নুরের ভয়-চকিত লজ্জাপূর্ণ দৃষ্টির কথা মনে মনে কল্পনা করিতে সে মধুর প্রেমের আস্বাদ অনুভব করিতে লাগিল। সে যে জিনিসটাকে ব্যবহারের অনুপযোগী এবং তুচ্ছ মনে করিয়া নিকটে স্থান দিতেও সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল, আর একজনের নিকটে সেই জিনিসই কি সমাদর লাভ করিয়াছে ! যেন অমূল্য রত্ন ! প্রেমের কি মহিমা !

খদিজা নুরুদ্দিনের বিস্মিত ও গৌরবান্বিত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অদূরে দণ্ডায়মানা লজ্জিত নুরের প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আরও জানো—নুর যে চুপ ক'রে ঐ রুমালখানা দেখত, তা আমি জান্‌তাম না—আমি কয়েকদিন দেখেছি, কিন্তু আমাকে যেতে দেখেই ঐ কাগজ লুকাতো। আমি অত লক্ষ্য করি নাই—কি ওটা ! বিয়ে হওয়ার কয়েক দিন আগে কি কাজের জন্য আমি ডাক্‌তে, বোধ হয় ব্যস্ত হ'য়ে রাখ্‌তে যেতে নীচে প'ড়ে গিয়েছে ; পরক্ষণে আমার ঘরে যাওয়ার দরকার হওয়ায়, গিয়ে, কাগজ বলে ফেল্‌তে গিয়ে দেখি, ঐ জিনিস !" এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খদিজা চলিয়া গেলে নুরুদ্দিন দুই হাত দিয়া নুরের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "নুর, এত প্রেম ঐ হৃদয়টুকুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলে ! কেন আমায় এত ভালবেসেছিলে নুর ?"

নুর কিছুই বলিল না ; শুধু তাহার মুখখানি আরও রক্তিম হইয়া উঠিল।

নুরুদ্দিন অতৃপ্ত লোচনে সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দাম্পত্য-প্রেমের পবিত্র প্রমাণ তাহার ওষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া দিল !

কে তুমি ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

কে তুমি প্রবুদ্ধ অঙ্গে ? সঙ্গীতের চলন্ত নর্ত্তনে
উদ্বেলিছ চিত্ত মোর নিত্য নিত্য নব-আবর্ত্তনে ?
উল্লাসে বসন্ত যেন স্ফুরন্ত আনন্দ-শৃঙ্খল
দোলাইয়া দোল তুমি পুষ্প-মঞ্চে রহিয়া বিহ্বল।

অগণ্য যুগের আগে জড়ের জঠর-চ্যুত তুমি
জাগিলে কি চেতনায় বেদনার জাগরণ চুমি ?
অঙ্গে লিপ্ত হে চঞ্চল ! কে জীবন, কে জড়-কঙ্কর ?
তুমি আমি এক দেহে অবিরহে পার্ব্বতী-শঙ্কর !

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব, বি-এস্‌সি

সূর্য্যের চেয়েও তেজস্কর গ্রহ

কিছুদিন হ'ল তারাপ্রকোষ্ঠের (constellation whale) মধ্যে মিরা সেটি (mira ceti) নামে একটি উজ্জ্বল গ্রহ দেখা যাচ্ছে। তা'র রং রক্তবর্ণ ; তাপ প্রায় ১,০০০ ডিঃ ফারহেনহিট্। আমাদের চ'খে পড়বার কয়েকশত বছর আগে থেকেই তা'র তাপ ও উজ্জ্বলতা অনেক কমে গেছে বটে, তথাপি পৃথিবী থেকে সূর্য্য যত দূর, তত দূরেও যদি মিরা সেটি থাক্‌ত, তবে আমাদের পৃথিবী একটি জলবায়ু-হীন উত্তপ্ত মরুভূমি হয়ে দাঁড়াত। শুধু তাই নয়, মিরা সেটি থেকে অনেক নতুন রকমের বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হয়ে পৃথিবীকে একেবারে জনমানবহীন ক'রে ফেলত।

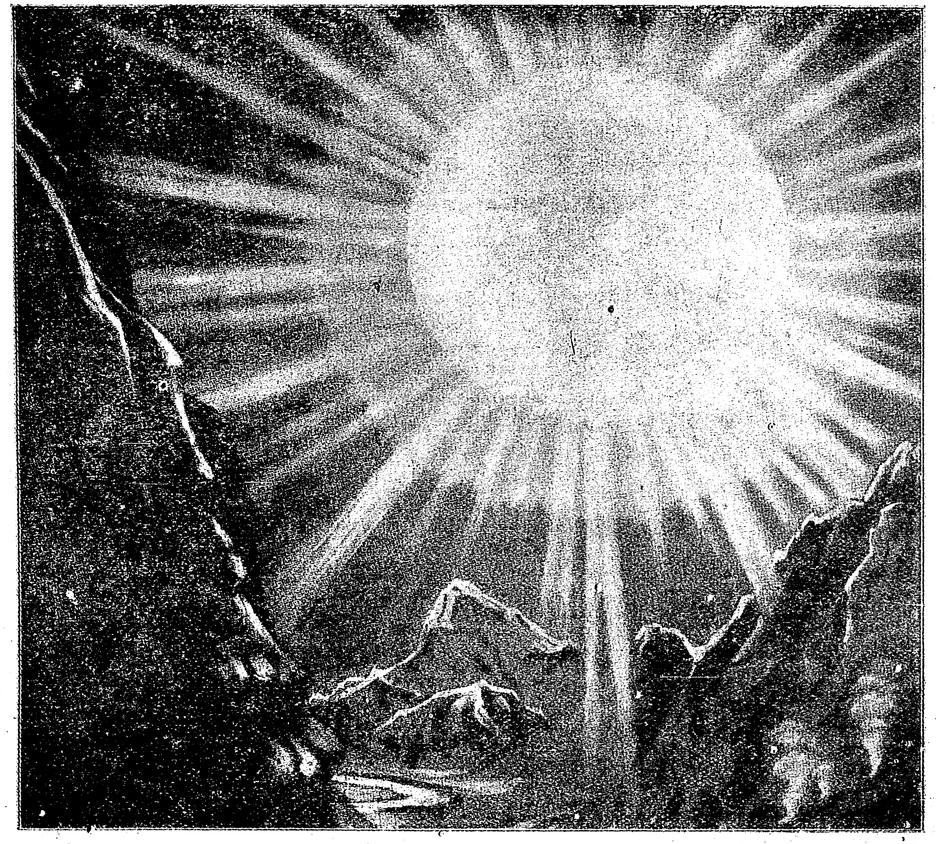

মিরা সেটি। (মিরা সেটির তেজ এখন কমে গেলেও, দেখ্‌লে তাকে সূর্য্যের চেয়েও তেজস্কর বলে মনে হয়)

সর্দ্দির মহৌষধ

ক্লোরিণ বাষ্প (chlorine gas) য়ুরোপের মহাযুদ্ধে সৈন্যদের দমবন্ধ ক'রে মেরে ফেলবার জন্য ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই—এই মারণাস্ত্রকে ওয়াসিংটন (Washington) সৈন্য বিভাগের দু'জন বৈজ্ঞানিক এ ফ্রাইস্ (A. Fries) ও লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল গিল্‌ক্রাইষ্ট্, এল, গিলক্রাইষ্ট (Lt. Col. H. L. Gilcrist) সর্দ্দির ঔষধ হিসাবে ব্যবহার ক'রেছেন। এই চিকিৎসায় বিশেষ আড়ম্বর নেই। গুটিকয়েক ছোট ছোট নল দিয়ে ক্লোরিণ বাষ্প একটি ঘরের ভেতর ছেড়ে দেওয়া হয়, আর রোগীরা সেই ঘরের ভেতর বসে হাসি-গল্প ক'রতে ক'রতে আরোগ্য হ'তে থাকে। এক ঘণ্টা পরে প্রায় সব রোগীকেই নিরাময় হতে দেখা যায়।

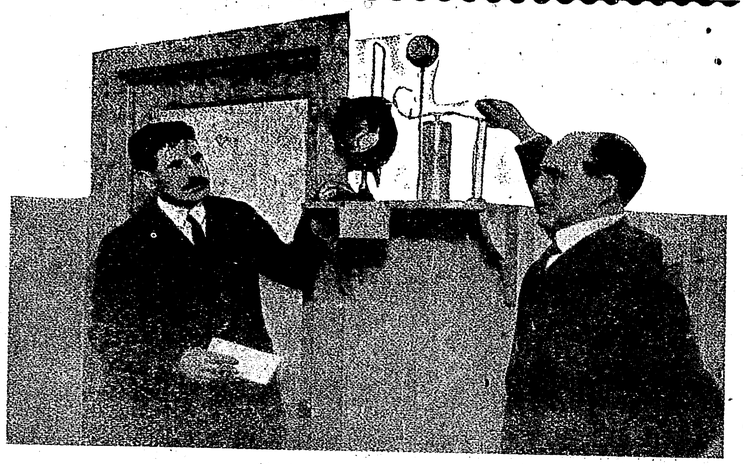

ক্লোরিণ চিকিৎসা ক'রবার অন্দর ঘর। (এই ঘরে ফ্রাইস্ ও গিল্‌ক্রাইষ্ট দুজনে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রে ব্যবহারের উপযোগী ক'রছেন)

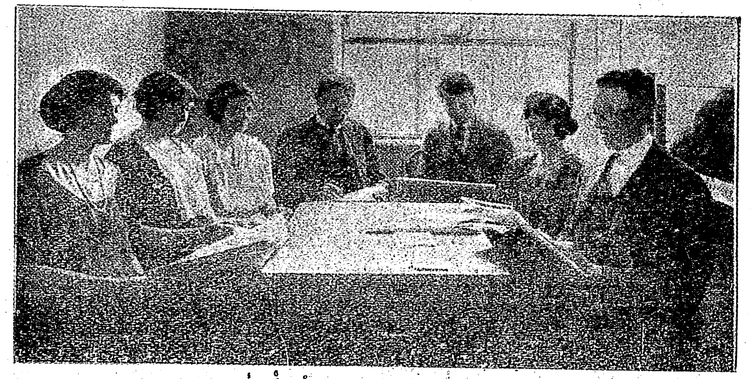

রোগী থাকবার ঘর। (এই ঘরে রোগীরা বসে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। ডান দিকের খোলা জানালা দিয়ে ডাক্তার রোগীদের অবস্থা দেখেন)

বিদ্যা ও স্বাস্থ্য

মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিপুষ্টির সামঞ্জস্য রাখবার জন্য এদেশের কোনও বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার আছে কি? পাশ্চাত্য দেশে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই ব্যায়ামাগার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোনও ব্যায়ামাগার নেই। এতে শিক্ষার্থী বালকদের মস্তিষ্ক-পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেহের পরিপুষ্টির সামঞ্জস্য না থাকায়, ছাত্র যখন সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসে, তখন দেখা যায়, তার স্বাস্থ্য ভগ্ন। সে সংসারের কোনও কাজ করবার একেবারেই অযোগ্য। এর জন্য শুধু বিদ্যার্থী নয়, তার পিতা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনেরাই প্রধানতঃ দায়ী।

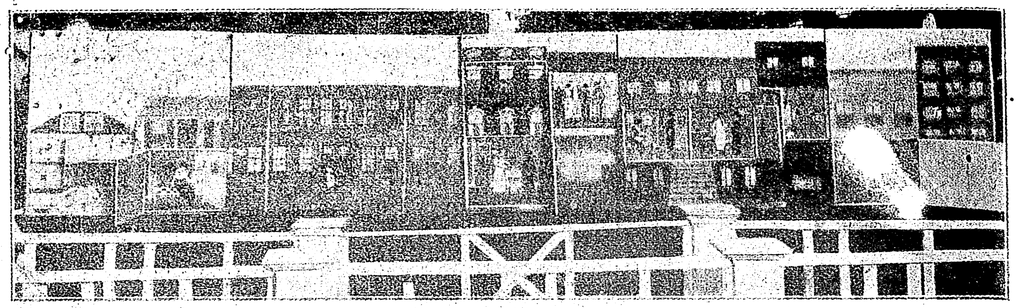

আদর্শ বিদ্যালয় (আমেরিকায় ছেলেদের শরীরের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য রাখবার জন্য এইরূপ একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করবার কথা হচ্ছে

যা'তে স্বাস্থ্যের সঙ্গে মস্তিষ্কের পরিপূর্ণতার সামঞ্জস্য থাকে, সেজন্য সকলের সমবেত চেষ্টায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার স্থাপিত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যায়াম করিতে বাধ্য করা আবশ্যক।

বত্রিশ হাজার ফুট উপরে

কয়েক সপ্তাহ আগে লেফ্‌টেন্যাণ্টস ম্যাকরেডি ও ষ্টিভেন্‌স্ (Lts. Macready and Stevens) নামক দুজন বিমানচারী ৩২,০০০ ফিট উপরে একেবারে মানুষের চ'খের আড়ালে উঠেছিলেন। তাঁরা বলেন যে, ৮,০০০ থেকে, ১০,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উপর থেকে নীচে নীলাকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁরা যতই উপরে উঠ্‌তে লাগলেন, ততই

আট হাজার ফিট উপরে। (ষ্টিভেন্‌স্ সাহেবের গৃহীত ৮,০০০

বত্রিশ হাজার ফিট উপরে। (ষ্টিভেন্‌স সাহেবের গৃহীত ৩২,০০০

শুধু মানুষ নয়, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট জানোয়ারগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা ৮,০০০ ফিট থেকে আরম্ভ ক'রে ৩২,২০০ ফিট পর্য্যন্ত উপর থেকে নীচেকার ওহিও (Ohio, America) সহরের নানা রকমের আলোকচিত্র নিয়ে নেমে এসেছেন।

হৃৎপিণ্ডে বেতার

খুব মোটা লোকদের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ অনেক সময় ডাক্তারদের শোনবার যন্ত্র দিয়ে শোনা যায় না। তা'র কারণ হচ্ছে যে, রোগীর হৃৎপিণ্ডের ওপর এত চর্ব্বি জমে থাকে, যা'তে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বাইরে সুপরিস্ফুট হ'তে পারে না। চিকিৎসকেরা আজকাল এই ব্যাপারে বেতারের শরণাপন্ন হ'চ্ছেন। চিকাগোর (Chicago) একটি হাঁসপাতালে এর পরীক্ষা শেষ হয়ে ব্যবহারের প্রণালী পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

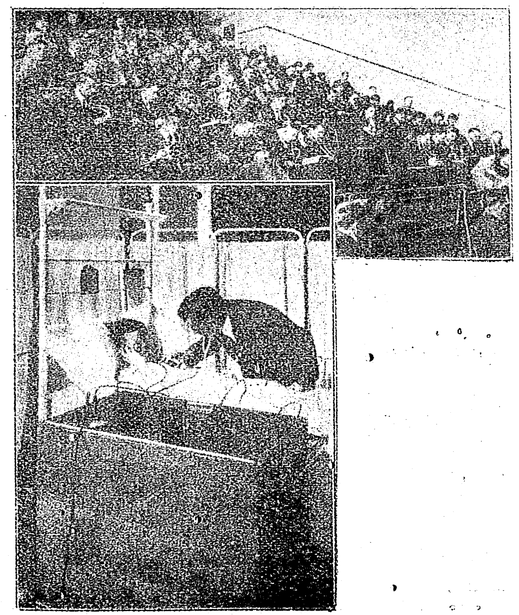

হাঁসপাতাল। (হাঁসপাতালের এক টিঘরে ডাক্তার বেতার

রাসায়নিক রসদ

সম্প্রতি আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটস রসায়ন-সমিতি (U. S. Bureau of chemistry) নামে একটি কারখানা খোলা হয়েছে। সেখানে অব্যবহার্য্য ও

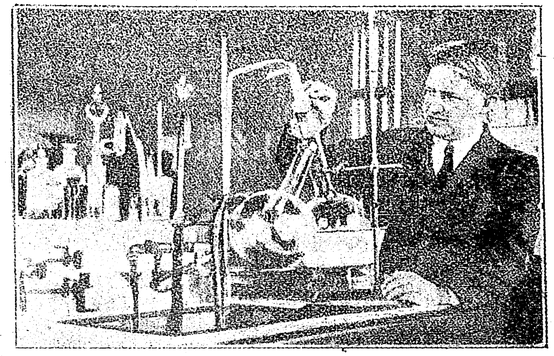

রসায়ন পরীক্ষা সমিতি। (রসায়ন পরীক্ষা সমিতির একটি ঘরে বসে একজন বৈজ্ঞানিক ধানের তুঁষ থেকে সুমিষ্ট চিনি তৈরী ক'রছেন)

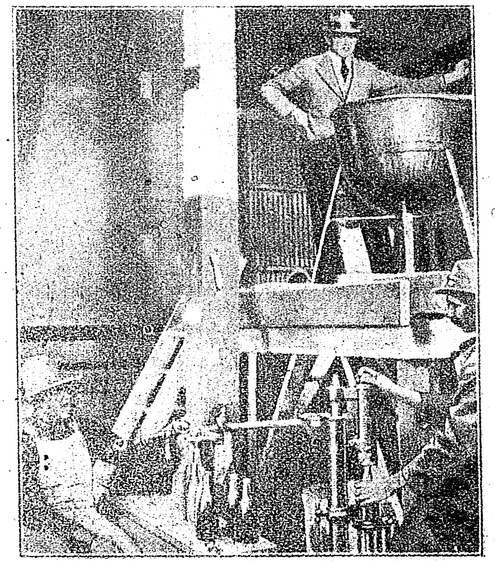

রসায়ন-পরীক্ষা সমিতি। (রসায়ন পরীক্ষা সমিতির একটি ঘরে বসে একজন বৈজ্ঞানিক পচা রাঙা আলু থেকে সুমিষ্ট সিরাপ তৈরী ক'রছেন)

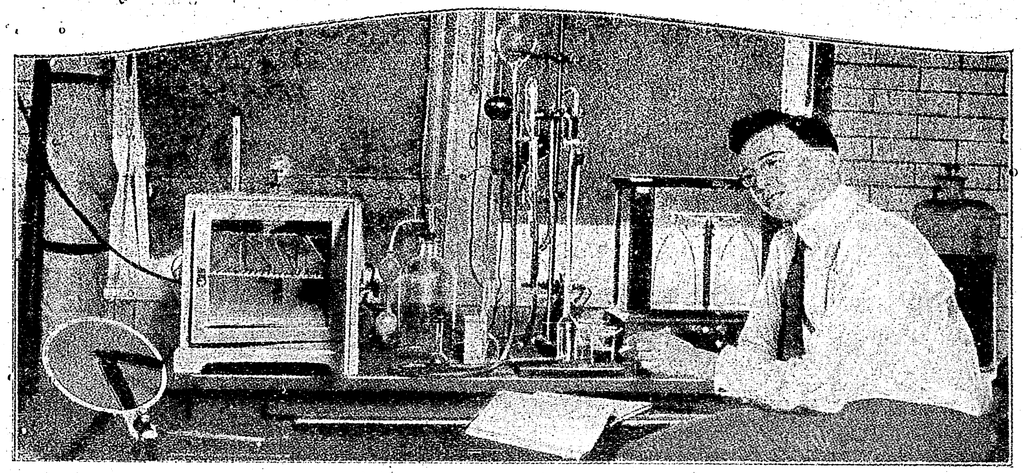

রসায়ন পরীক্ষা সমিতি। (রসায়ন পরীক্ষা সমিতির একটি ঘরে একজন বৈজ্ঞানিক কাসিনা পাতা থেকে চা তৈরী ক'রতে নিযুক্ত আছেন)

আবর্জ্জনার জিনিস থেকে সহজেই দামী বা অল্প মূল্যের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হ'চ্ছে। বনজাত কাসিনা (cassina) পাতা থেকে চা, ধানের তুঁষ থেকে সুমিষ্ট চিনি, পচা রাঙা আলু থেকে সুমিষ্ট সিরাপ ইত্যাদি এর মধ্যেই তাঁরা বার করেছেন।

পঞ্জিকায় যুগান্তর

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এখনও বছরে বার মাস আছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদের আর বছরে বার মাসে মন উঠ্‌ছে না, তাঁরা বছরে তের মাস করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, এমন কি লিগ্ অব নেশনের (League of Nation) একটা বৈঠকে এর একটা মীমাংসা হয়ে গেছে। এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী হচ্ছেন, আমেরিকার আবহাওয়া বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সি, এফ্ মারভিন (Dr. C. F. Marvin)। তিনি বলেন, ১৯২৮ সালই হচ্ছে নতুন পঞ্জিকা চালাবার উৎকৃষ্ট বছর। সুতরাং ঐ বছর থেকে তের মাসের নতুন পঞ্জিকা সব দেশেই চালান উচিত।

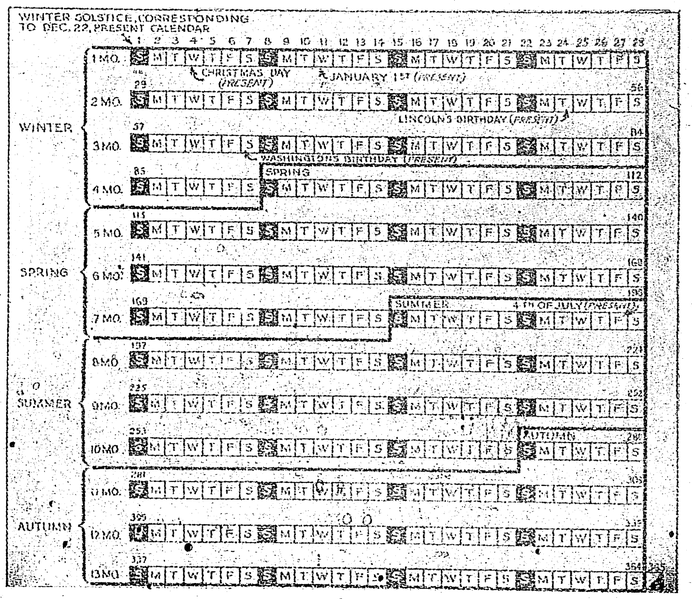

তেরমেসে পঞ্জিকা। (১৯২৮সাল থেকে পাশ্চাত্যদেশে তেরমেসে পঞ্জিকার ব্যবহার প্রচলিত হবে)

তপন-তাপে রন্ধন

আমরা কাঠ, কয়লা, স্পিরিট, তৈল ইত্যাদি নানা-রকম দেশী

ও বিদেশী তাপদায়ী উপকরণের সাহায্যে রন্ধন করি। কিন্তু ডাঃ চার্লস্ জি, এব্‌ট (Dr. Charles Abbot) নামক একজন বৈজ্ঞানিকের পাল্লায় পড়ে সূর্য্য তা'র রন্ধনশালায় ইন্ধনের জন্য নিজেকে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন। এবট্ সাহেব নানারকম তাপবর্দ্ধক কাচ ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূর্য্যের কিরণ ঘনীভূত ক'রে তা'র দহনক্ষম তাপে রন্ধন ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন। তাঁর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে সম্প্রতি তিনি ঐ তাপে রন্ধন ক'রে খাইয়ে দিয়েছেন।

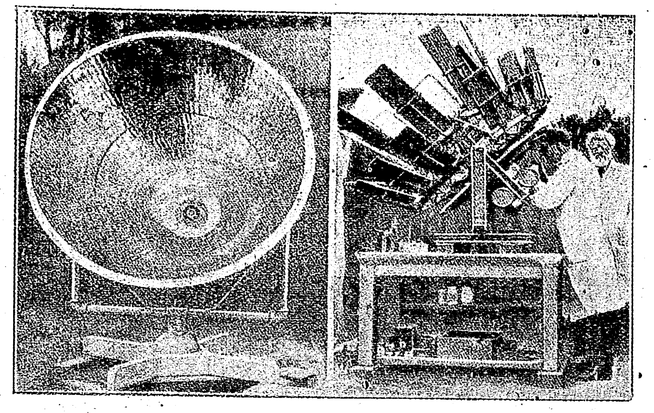

নবাবিষ্কৃত উনান (মোরে সাহেবের নানা রকম কাচ দিয়ে সূর্য্যের তাপ ঘনীভূত করবার যন্ত্র)

নবাবিষ্কৃত উনান (মোরে সাহেবের নবাবিষ্কৃত উনানের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি)

মারণ-রশ্মি।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল যে সব মানুষ-মারা কল উদ্ভাবিত হ'চ্ছে, তা' দেখে জগতের লোক স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছে। হার্ উলি (Herr Wulle) নামক একজন বৈজ্ঞানিক নিজের বিশ্রাম কক্ষে বসে বৈদ্যুতিক আকর্ষণে শূন্য থেকে বিমান টেনে আন্‌ছেন; একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক দূরে চলন্ত মোটর গাড়ী থামিয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ ক'রেছেন; এইচ্, গ্রিণডেল্ মাথুস্ (H. Grindell Mathews) নামক একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আবার রশ্মি (Diabolic rays) দিয়ে চলন্ত মোটরের এঞ্জিন থামিয়ে, তার আরোহীকে পর্য্যন্ত মেরে ফেলে, তিনি তাঁর আবিষ্কারের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

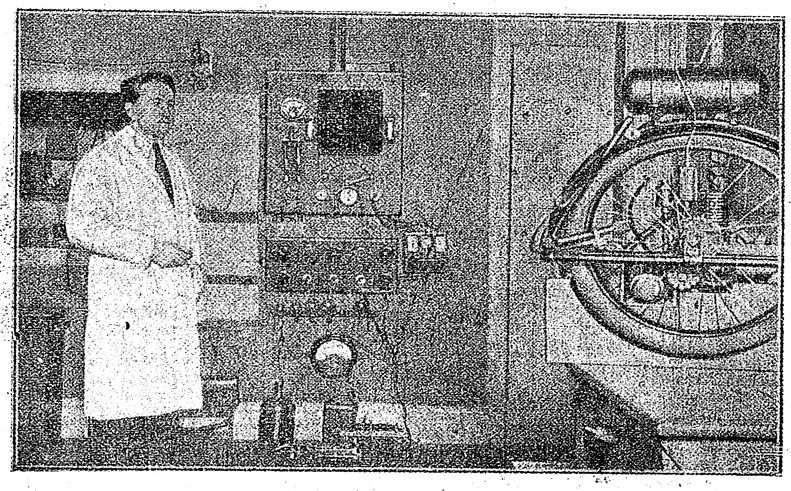

মারণ রশ্মি পরীক্ষাগারে মাথু সাহেব তাঁর নবাবিষ্কৃত মারণ-রশ্মি মোটর গাড়ীর একখানি চাকার ওপর পরীক্ষা ক'রছেন)

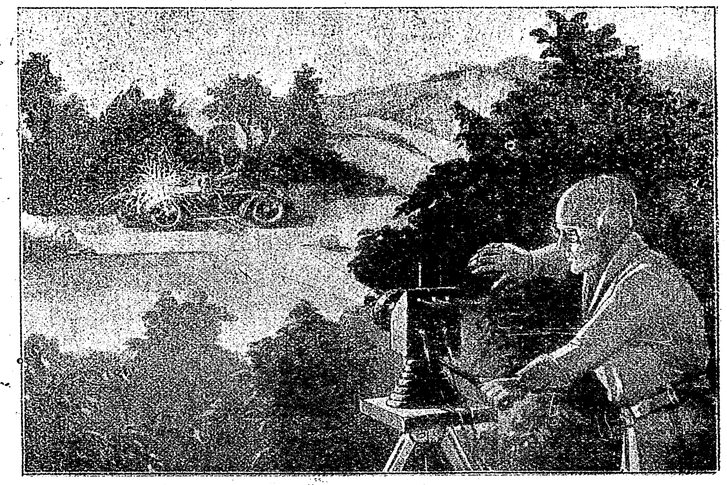

পরীক্ষা। (দূরস্থিত একখানি মোটর গাড়ীর ওপর মারণ-রশ্মির পরীক্ষা হচ্ছে ; গাড়ীর এঞ্জিন চাকা সবই গাড়ীর আরোহীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)

জঞ্জালের দাম

পরিত্যক্ত জিনিস থেকে নিত্য-প্রয়োজনীয় কত জিনিস যে তৈরী হতে পারে, তা' রসায়ন-বিদ্যা ছাড়া অন্য কোনও বিদ্যায় সুপরিস্ফুট ভাবে জানা যায় না। নিউ ইয়র্ক সহরের ষ্টিফেন, এম্, হোয়ি, (Stephen Mr. Hoye) নামক একজন আইন-ব্যবসায়ী বারো বছর ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা করবার পর সাবানের পরিত্যক্ত ময়লা অংশ থেকে

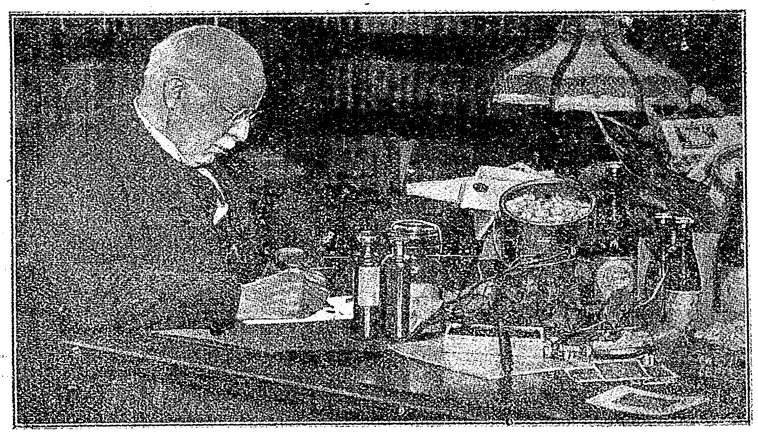

পরীক্ষাগারে হোরী সাহেব (হোরি সাহেব পরীক্ষাগারে নকল তামাক তৈরী ক'রে তা'র পরীক্ষা ক'রছেন)

অতি সুন্দর ও সুগন্ধ তামাকের আবিষ্কার ক'রেছেন। শীঘ্রই তাঁর প্রণালী মতে তামাক তৈরী হয়ে সুলভ দামে দেশ-বিদেশে সরবরাহ হবে। এটা ধূমপায়ীদের পক্ষে কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক নয়!

রোগের বীজাণুপালন

বৈজ্ঞানিকরা রোগের প্রকোপ দূর ক'রবার জন্য রোগগ্রস্ত মানুষ ও পশুর রক্ত থেকে আজকাল নানা রকম বীজাণু সংগ্রহ ক'রে রাখছেন। এর প্রধান উদ্যোগী হচ্ছেন, এল, জে, বেনডার (L. J. Bender) সাহেব। তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে ছয় হাজার কাচের শিশির মধ্যে ছয় হাজার বিভিন্ন রকম রোগের বীজাণু রেখে দিয়েছেন।

বীজাণু আছে। তিনি রোজ সকালে নিয়মিত ভাবে তাদের আহার্য্য দেন। পরে তাদের পরীক্ষা ক'রে বিশেষ বীজাণু বিশেষ রোগে সূচী সাহায্যে রোগীর শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে রোগীর রোগ দূর ক'রে থাকেন।

বীজাণু পোষা (পরীক্ষাগারে বেণ্ডার সাহেব বীজাণু পরীক্ষা ক'রে তাদের খাবার দিচ্ছেন)

রেডিওফোণ

রেডিও এখনও এদেশে টেলিফোণের মত ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে না। যেটুকু হয়েছে সে কেবল একতরফা! এখনও ভারতবাসীকে ভারত-শাসনতন্ত্র যথেচ্ছা রেডিও ব্যবহার ক'রতে দিচ্ছেন না। কিন্তু য়ুরোপ বিশেষতঃ আমেরিকায় ঘরে ঘরেই রেডিয়োর ব্যবহার। কাজের বেকাজের সব রকম খবরই রেডিওফোণে প্রচারিত হচ্ছে। হাজার হাজার মাইল তফাতে থেকেও রেডিওফোণে কথা বলা চলে। দূর থেকে রেডিওফোণে কথা কওয়াটা প্রথমে আমেরিকায়রকি পয়েণ্ট্ (Rocky Point L. I.) থেকে একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে লণ্ডনে একজন বৈজ্ঞানিকের সামান্য

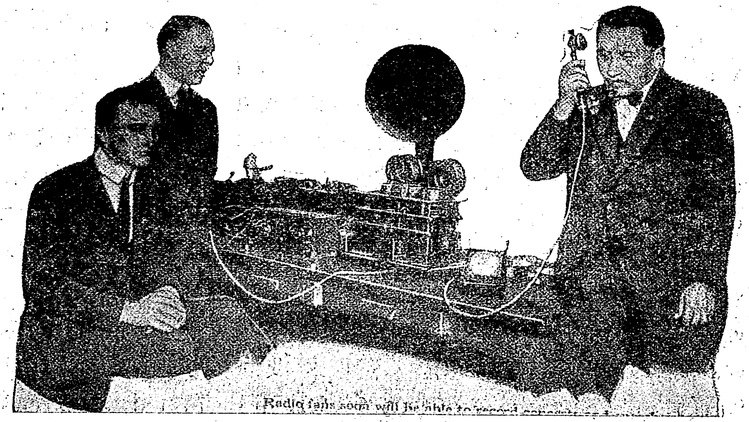

রেডিও ফোণ (Rocky Point L. I. থেকে মার্কিন বৈজ্ঞানিক লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ ক'রছেন)

ভাবেই চল্‌ছিল। কিন্তু এখন তাদের আলাপ না কি বেশ পূর্ণ উদ্যমে চল্‌ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

"বধিরের যষ্টি" সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান দেবার জন্য আমি অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। কিন্তু সবগুলি চিঠির পৃথক-ভাবে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলে, এই পত্রিকা মারফৎ সকলকে জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লে অনুসন্ধানকারীরা সমস্ত খবর পাবেন।' ইতি—

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব।

ঠিকানা— Sumner N. Blossom Esq
Editor, Popular Science (monthly)
225 West 39th. Street. New York. U. S. A.

হুমায়ূন্-নামা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাঁহারা মোগল-রাজবংশের কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই বাদশাহ্ হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভগিনী, গুলবদনের 'হুমায়ূন্-নামা'র সহিত পরিচিত ছিলেন না। সুপণ্ডিত ব্লকমানের পক্ষে ফার্সী পুঁথির সহিত্ পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল; কিন্তু গুলবদন বেগমের হুমায়ূন্-নামার কথা তাঁহারও জানা ছিল না; থাকিলে গুলবদনকে তিনি 'আকবরের বেগম' বলিয়া অনুমান করিতেন না! (Ain-i-Akbari, i. 48)

হুমায়ূন-নামার ফার্সী পুঁথিখানি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়াম্ হ্যামিল্টনের বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। সেই অবধি ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে। বাখরগঞ্জের ইতিহাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বেভারিজ সাহেবের বিদুষী পত্নী ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।*

'আকবর-নামা' আবুল-ফজলের রচিত বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালের সুবৃহৎ সরকারী ইতিহাস। এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য বাদশাহ্ এক হুকুম জারি করেন। ইহার ফলে, হুমায়ূনের 'আফ্তাব্চী' (পানপাত্রবাহক) জৌহর, এবং আকবরের 'বকাওলবেগী' (রাজরন্ধনশালার পরিদর্শক) বায়াজীদ্ বীয়াতের স্মৃতিকথা রচিত হয়। বাদশাহ্ আক্বরের এই আদেশ-প্রচারের কথা আবুল-ফজল তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। (Akbarnama, tr. & ed. by H. Beveridge, i. pp. 29, 30, 33). খুব সম্ভব, এই রাজাদেশের ফলেই গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন-নামা' রচনা করেন; কারণ তিনিও লিখিয়াছেন,—"বাদশাহ্ আকবর আদেশ প্রচার করেন—বাবর ও হুমায়ূনের সম্বন্ধে যাহা জান, লিপিবদ্ধ কর।" এ অনুমান সত্য হইলে দেখা যাইতেছে, 'হুমায়ূন-নামা' রচনার তারিখ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের (৯৯৫ হিঃ) কাছাকাছি। আবুল-ফজল কিন্তু 'হুমায়ূন-নামা' সম্বন্ধে নীরব। তবে তিনি যে 'আকবর-নামা' রচনাকালে গুলবদনের পুঁথির সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। (See Humayun Nama p. 78n).

হুমায়ূন্-নামা সাহিত্য হিসাবে রচিত হয় নাই;—আবুল-ফজলের 'আকবর-নামার' উপকরণ হিসাবে লিখিত। সাম্রাজ্য বা রাজদরবারের যে-সব ঘটনা গুলবদন জানিতেন, বা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হন, তাহাই অকপটে চলিত কথায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা স্বাভাবিক—লেখায় একটা স্বচ্ছন্দ গতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তুর্কী শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ, গুলবদন ও তাঁহার স্বামীর মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। তাঁহার ফার্সী-জ্ঞান একটা অধ্যয়নলব্ধ গুণ মাত্র।

হুমায়ূন-নামার প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই বাবর বাদশাহ্‌র আত্মকথা হইতে গৃহীত। পিতা বাবরের মৃত্যুকালে গুলবদনের বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বাবরের রাজত্বকালের চাক্ষুষ বিবরণ জানিবার আশা করা যায় না।

ইতিহাসের দিক্ হইতে হুমায়ূন্-নামার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহা আবিষ্কৃত না হইলে বোধ হয় বাবরের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন ও সে যুগের কয়েকটি পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। বাবর ও হুমায়ূনের জীবনী-লেখক আরস্কিন্ (Erskine) সাহেবেরও হুমায়ূন-নামা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহার সাহায্য পাইলে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বাবর ও হুমায়ুনের পরিবারবর্গের কাহিনী অধিকতর সম্পূর্ণতা

* *Humayun Nama* by Gulbadan Begam, trans. by A. S. Beveridge, (Oriental Trans. Fund), 1902.

লাভ করিত। হুমায়ূন্-নামা আকবরের বাল্যজীবনের উপরও বিশেষ আলোকপাত করে।

নিজের বা আত্মীয়-স্বজনগণের অযশস্কর বিষয় বা জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা গোপন করিবার প্রয়াস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। জহাঙ্গীর বাদশাহ্ কি উপায়ে মিহ্‌র-উন্নিসাকে (নূরজহান্) লাভ করেন, সে কথা আত্মকাহিনীতে লিখিয়া যান নাই। শুধু জহাঙ্গীর কেন, বাবরও শাহ্ ইস্‌মাইলের নিকট অধীনতা-স্বীকার, ঘাজ্‌দওয়ানের পরাজয়-ব্যাপার ও আলাম লোদীর প্রতি তাঁহার আচরণের কথা 'তুজুক-ই-বাবুরীতে' একেবারে গোপন করিয়াছেন। এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার হাত হইতে স্নেহময়ী গুলবদনও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনিও হুমায়ূন্-নামায় সহোদর হিন্দাল, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুমায়ূনের ত্রুটিবিচ্যুতি ঢাকিতে যত্নবতী হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের তারিখগুলিও সাবধানে গ্রহণ করা উচিত।

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হুমায়ূন্-নামার এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে। হুমায়ূনের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বাবধি (মীর্জ্জা কামরান্‌কে অন্ধ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত) এই খণ্ডিত পুঁথির শেষ সীমা। বায়াজীদ্ বীয়াতের স্মৃতিকথা—'তারিখ্-ই-হুমায়ূন্'—সম্পূর্ণ হইলে তাহার নয়খানি পুঁথি নকল করা হয়; একখানি বাদশার পাঠাগারে, সলীম্ মুরাদ ও দানিয়াল্—তিন কুমারকে তিনখানি, গুলবদনের পাঠাগারে একখানি, এবং দুইখানি আবুল-ফজলকে দেওয়া হয়; বাকি দুইখানি সম্ভবতঃ গ্রন্থকার নিজে রাখিয়াছিলেন। গুলবদনের 'হুমায়ূন্-নামা'ও একই উদ্দেশ্যে রাজাদেশে রচিত হয়, এবং বায়াজীদের পুঁথির মত, ইহারও যে একাধিক পুঁথি নকল হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুঁথিখানি ছাড়া গুলবদনের গ্রন্থের দ্বিতীয় পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

নির্ভর

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

আপন হাতে সাজিয়ে যখন দিলাম্ বাঁধন-ডোর খুলে,
ছুটলো তরী নৃত্য করি' ভরা গাঙে পাল তুলে।
ওগো—সাগর-পারের কাণ্ডারি!
মাঝ-দরিয়ায় তুফান দেখে
মনে যে হয় ভয় ভারি;
এপার ওপার সমান আঁধার ভিড়ি এখন কোন্ কূলে?

যাত্রা সুরু করেছিলাম জন্ম নেবার ক্ষণ থেকে,
চল্‌তেছিলাম সরল পথে তোমার পায়ে মন রেখে।
তখন—ছিলাম তোমার মন্দিরে,
বাপ-মায়েরই স্নেহের পাশে ছিলাম যখন বন্দী রে!
—এখনও সে সুখের স্মৃতি
যায়নি মুছে মন থেকে।

সিন্ধু-সলিল উঠ্‌লো ফেঁপে কোন্ জোয়ারে কে জানে!
জীবন-তরী ছুট্‌লো কেঁপে—ছয় দাঁড়ীতে দাঁড় টানে,
নৌকা চলে খুব জোরে,—
ভরা-পালে স্রোতের মুখে
আমি সুখে হাল ধোরে।
শুধু—চলার নেশায় মত্ত তখন
সুপথ কুপথ কে মানে।

এখন যে, হায়! শুধাই তোমায় লাঞ্ছনা পাই কার দোষে?
সাগর-বুকে বাসা তবু দারুণ তৃষায় প্রাণ শোষে!
লবণ-মাখা এই বারি,
নক্র-মকর হিংস্র প্রাণীর শত্রুতারও ভয় ভারি।
হারিয়ে হেলায় ক্ষীরোদ-সাগর মরি যে, হায়, আফ্‌শোষে!

এখন আমার ফুরিয়েছে সাধ থাক্‌বো না আর হাল ধোরে;
তোমার 'পরেই দিলাম যে ভার, দিও আমায় পার কোরে।
তুমি—পারের মূল্য যা চা'বে,
কোর না ভয়, দীন-দয়াময়!
দীনের কাছে তা'ই পাবে।
তোমার—পায়ের ধূলো ক'রেছি সার—
পার হব গো তা'র জোরে।

মোরা—নিজের বিপদ আনি ডেকে নিজের হাতে ভার নিয়ে,
মাকড়সা যে জড়িয়ে পড়ে নিজের জালেই পাক দিয়ে।
মোরা—ক্ষুদ্র মানুষ কি বুঝি,
কর্ম্ম-ফলের বোঝার ভারে
শেষে পড়ি ঘাড় গুঁজি'!
তাই—হাল্কা হ'য়ে চল্‌বো এবার শুধু তোমার নাম নিয়ে।

আনাতোল ফ্রান্স

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল

ফরাসী-সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল আদিত্য মনীষী আনাতোল ফ্রান্স গত ১২ই অক্টোবর তারিখে চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন। ভাষা-জননীর বরবপুকে নূতন রচনা-পদ্ধতির লীলায়িত গতির সাহায্যে নবভাবে তিনি সজ্জিত করিয়াছেন। নূতন ভাবের তিনি সন্ধান দিয়া বাস্তবপন্থানুসারী ফ্রান্স দেশে নব-আদর্শ-বাদের প্রচলন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। এই আদর্শ-বাদে বাস্তবতা ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়—এ যেন ঠিক আমাদের অর্দ্ধ-নারীশ্বর দেবতার মূর্ত্তি। ভাব-প্রবণ ফরাসীর নিকট বিমল হাস্যরস-ধারার ভিতর দিয়া ও অন্তর্দাহী বিদ্রূপ-বাণের সাহায্যে তিনি ফরাসীর দোষগুলিকে বিদ্ধ করিয়া নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় চিত্রসমুদায় অঙ্কিত করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের অনুভূতি-সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া কলাকুশলী মনস্তত্ত্ববিদ্ আনাতোল আজ জগদ্বরেণ্য। তাঁহার চিত্রিত চরিত্র-গুলি দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—তাঁহার ভাবধারা কেবল মাত্র ফ্রান্স দেশের সাহিত্য-রস-পিপাসুকে আনন্দ দান করে না, জগতের সর্ব্বদেশের লোকের মনে সমভাবে আনন্দ দান করিয়া থাকে। ভাব-রাজ্যের এই বিরাট্ দান-বীরের নিকট জগৎ যে কতদূর ঋণী, তাহা দেখাইবার সময় ইহা নয়। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দন দিয়া পূজা করিয়া আমার অন্তরের দুএকটা কথা জানাইবার জন্য আজ লেখনী ধারণ করিয়াছি।

আনাতোল ফ্রান্স

অনন্তপথযাত্রী আনাতোল মৃত্যুর পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্ট অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। মধ্যে মধ্যে মাতৃভক্ত কেবল মাতার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন ও বলিতে থাকেন, 'চলিলাম' 'চলিলাম'। তাঁহার জীবনের কাহিনী সংক্ষেপে আমরা এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

তাঁহার প্রকৃত নাম Jacques Anatole Thibault. তাঁহার পিতা যখন Quin malaquais প্রমাণপঞ্জী প্রকাশ করেন, তখন তিনি ফ্রান্স এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন; পুত্রও পিতার ছদ্মনামই সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালের ১৬ই এপ্রেল তারিখে ফ্রান্স দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার দোকানে ক্রেতারা আসিয়া কেবল মাত্র পুস্তক ক্রয় করিয়া বা পুস্তক আনয়ন করিয়া দিবার আদেশ দিয়া চলিয়া যাইত না। আধুনিক সাধারণ পাঠাগারে যে কার্য্য হয়, সেখানেও সেই কার্য্য চলিত। এখানে পাঠকেরা আসিয়া পুস্তক পাঠ করিত ও অধীত পুস্তক সম্বন্ধে

আলোচনা করিত। বালক আনাতোল প্রতি রাত্রিতেই এই সব আলোচনা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। এই আলোচনা উত্তর কালে যে আনাতোলের হৃদয়ে সাহিত্য-আলোচনা-লিপ্সার উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ও সার ওয়ালটার স্কট্ ভিন্ন তাঁহার মত এত অধিক চরিত্র আর কেহ অঙ্কিত করেন নাই বলিয়া আমাদের ধারণা; তিনি ৪১খানি বই লিখিয়াছেন।

আনাতোল Stanislans কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। এখানে পাঠ করিবার পূর্ব্বে Faubourg St Germain বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠশেষে অল্পকালের জন্য তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যাপৃত হন। এ সময়ে সংবাদ-পত্রের তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৭৩ সালে কিছুকালের জন্য সেনেট গ্রন্থাগারে (la bibliotheque de Senat) কার্য্য গ্রহণ করেন; কিন্তু শীঘ্রই ঐ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন।

ফরাসী কথা-সাহিত্যের উপন্যাস-বিভাগে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ভাবুক ফরাসী দেশে কেন, জগতেই বিরল। ফরাসী ভাষাকে তিনি সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন। তীক্ষ্ণধী আনাতোলের বিচার-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অদ্ভুত ছিল। সমালোচনার রীতিও তাঁহার সুন্দর ছিল। মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে তিনি সমালোচনা করিতেন। লেখারই তিনি সমালোচক ছিলেন—লেখকের চরিত্রের সমালোচনা তিনি করিতে ভালবাসিতেন না। কৌতূহল-বৃত্তি তাঁহার অত্যধিক ছিল বলিয়া ও সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল বলিয়া তিনি সহজে আপনি যাহা না বুঝিতেন তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিতেন না। লেখকের লেখনী-মূলে সত্য আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া পড়িত, সত্য কোন্‌টা—আমার মত না লেখকের মত! এই সংশয় দূর করা সংশয়-বাদী আনাতোলের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িত। তিনি সমালোচনার কোন নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুনের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। ফরাসী দেশের Le Temps পত্রিকায় তাঁহার যে সকল সাহিত্যিক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা La Vie litteraire (১৮৮৮-১৮৯২) নামক পুস্তকের চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা কতদূর ছিল, তর্কশক্তি তাঁহার কত সূক্ষ্ম ছিল, ঐতিহাসিক গবেষণা ও দার্শনিক চিন্তাধারা কত প্রবল ছিল। আর এগুলি পাঠ করিলে আর একটা সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি যে জগতের ভিতর একজন বড় সমালোচক ছিলেন তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ফ্রান্স দেশের বড় বড় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে মনীষী Lessps যখন French Academyর সভ্যপদ ত্যাগ করেন, তখন আনাতোল ঐ পদে মনোনীত হন। তদবধি মরণ কাল পর্য্যন্ত ঐ পদে তিনি আসীন ছিলেন।

আনাতোল সারা জীবন ছাত্রভাবে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সদা সর্ব্বদাই তাঁহাকে পাঠে রত থাকিতে দেখা যাইত। এই অধ্যয়ন-স্পৃহা বাল্যকাল হইতে তাঁহার ছিল। জীবনের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এমন কিছুই করেন নাই, যাহাতে তাঁহার পিতামাতার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে পারিয়াছিল যে, উত্তর কালে তাঁহাদের সন্তান আপনার পদে ভর করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কিংবা ফ্রান্স দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইবে। নির্জ্জনতাপ্রিয় আনাতোল কর্ম্ম করিতে ভালবাসিতেন না—জীবন ধারণ করিতে হইলে যে কর্ম্ম করা চাই, আপনার অভাব অভিযোগ দূর করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, সে কথা আনাতোল কিছুতেই বুঝিতেন না। তিনি কেবল ভালবাসিতেন লিখিতে ও পড়িতে। ২৪ বৎসর বয়সে ভাষা-জননীর নিকট প্রথম অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইলে ফরাসী সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; সমালোচনার কষ্টি-পাথরে Alfred de Vigny (১৮৬৮) টিকে নাই। প্রথম বয়সে তিনি কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন। কবিতা যে মন্দ হইত তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের ভিতর প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইত না—প্রাণকে আলোড়ন করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। তার

পর তিনি কবিতা ছাড়িয়া গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এ ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চিন্তাশীল ভাবুক লেখক বলিয়া পরিচিত হন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার যশ সমগ্র ফ্রান্স দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—ক্রমে ফ্রান্সদেশ ছাড়িয়া বিশ্বসাহিত্য তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ তিনি শাশ্বত যশের অধিকারী হইয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয়, তাঁহার পিতৃদেব জীবিতাবস্থায় পুত্রের এই যশোলাভ দেখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান তাঁহার অপরিসীম ছিল ; আপন দেশবাসীর হৃদয়কে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। সাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য লোক-সাহিত্যের প্রচলনে তিনি অগ্রণী ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোমতের মতকে আদর্শ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিতে, বার্ত্তায় তিনি এই মত পোষণ করিতেন। কাহারও কাহারও মতে, চারিত্র্যেও তিনি সংশয়বাদী ছিলেন। সময় সময় আপনার অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। Le Jardin d'Epicure (১৮৯৫) ও Le Livre de mon Ami (১৮৮৫) হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু সংশয়বাদী আনাতোল মানবকে কখনও ঘৃণা করেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন। মানবের তিনি মঙ্গলকামী ছিলেন। মানবতার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে ও জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। দুর্ব্বল মানবের দুর্ব্বলতার চিত্র তিনি অনেক চিত্রিত করিয়াছেন ; কিন্তু অযথা মানব-চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নাই, মানবের পশুভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য মানবকে শিক্ষা দান করা। জগতের মধ্যে তিনি একজন বড় শিক্ষক। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি 'সোসিয়ালিজম'এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯২০ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে Mlle Emma Lepreostteএর সহিত আনাতোল পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৮৭৯ সালে তিনি প্রথমে কথা-সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস রচনায় মনোযোগ দেন ও দুইখানি ছোট বাস্তব উপন্যাস "Jocaste" ও "Le Chat Maigre" লেখেন ; ফ্রান্সের নিজস্ব যাহা, তাহা এ দুখানিতে ফুটিয়া উঠে নাই। ১৮৮১ সালে Crime of Sylvestre Bonnard প্রকাশিত হইয়া তাঁহার যশ ফরাসী দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এখানে সম্যক্ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পের ধারা অপ্রতিহত ভাবে এখানে চলে নাই। আখ্যান-বস্তুর সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন ; ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের সমাবেশ ইহাতে আছে। ইহা একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথের "গোরা"য় যেমন তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক চিন্তা-ধারার সহিত আমরা পরিচিত হই, এখানে ঠিক তদ্রূপ আমরা আনাতোলের অনেকগুলি ভাবের সহিত পরিচিত হই। এখানিতে কয়েকটি সুন্দর সন্দর্ভের সমাবেশ আছে। বড় বড় সমালোচকদের মতে এই উপন্যাসখানির স্থান বিশ্বসাহিত্যের রোমান্সের ভিতর অতি উচ্চে। ইহার চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসে গঠিত মানব। এগুলি যেমন নিখুঁৎ, তেমনি চিত্তোন্মাদকারী ; হাস্য-কৌতুক, রস-রচনার ভিতর অবাধগতিতে ছুটিয়াছে —সহজ, সরল অনুভূতির লীলা চিত্তকে অভিভূত করে। চিরকুমার বৃদ্ধ Sylvestreএর ভুল-ভ্রান্তি ও সুন্দরী রমণীদিগের প্রতি দুঃসাহসিক ব্যবহার সত্ত্বেও আমরা তাহার প্রতি সমবেদনা দেখাইয়া থাকি। দুশ্চরিত্রা মাদাম প্রেফেয়ারের নিকট হইতে Sylvestre যখন যুবাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন ঐ কার্য্য ফরাসী আইন-সঙ্গত না হইলেও আমরা তাহাকে ক্ষমা করি ; কারণ তাহার উদ্দেশ্য ছিল সৎ। পাপের পিচ্ছিল পথ হইতে ও দুষ্ট মোহিনীর মায়াপাশ হইতে যুবককে রক্ষা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। Sylvestre আনাতোলের এক অভিনব চিত্র। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগকে চেতনা দিবার জন্য বোধ হয় এই চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। কাঠ, পাথর, চিত্র, মুদ্রা প্রভৃতি লইয়া যাঁহারা জীবন-যাপন করিতেছেন, তাঁহারা সংসারের ধার বড় ধারেন না। এই সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রকৃত কর্ম্মে—দেশের ও দশের কাজে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য, অতিভাবুকদলের লোকদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। [illegible]

অনুসন্ধান কর, সঙ্গে সঙ্গে কাজও কর, এই শিক্ষা আনাতোল আমাদিগকে দিয়াছেন।

গৃহকর্ত্রী (house-keeper) থেরেলে চিত্রটী বড়ই উপভোগ্য। বৃদ্ধ Sylvestreএর উপর তাঁহার প্রভুত্ব ও তাঁহার হাস্যরসাত্মক বিদ্রূপবাণী পাঠ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। দুশ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রী মাদাম প্রেফেয়ারের (Prefere) সাহায্যকারী Maitre Moucheএর চিত্রও বেশ সুন্দর। পাপের পথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত পরিকল্পনাগুলি চিত্তাকর্ষক।

ঠিক এই ধরণের উপন্যাস না হইলেও Pengulu Island খানির বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও আখ্যানভাগের মাধুর্য্য অতীব সুন্দর। এখানি ইংরাজী-সাহিত্যের সুইফটের Gulliver's Iravelsএর মত ; পুস্তক পড়িতে বসিলে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ছাড়া যায় না। এখানিতেও তিনি, যে সকল ঐতিহাসিক, দেশের প্রচলিত কাহিনী (legend) গুলির প্রতি অযথা আসক্তি দেখাইয়া থাকেন ও গির্জ্জার (church) অসীম শক্তি-সম্পন্ন লীলার কাহিনী (miracle) প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা বিকৃতকারী তথা-কথিত ঐতিহাসিকদিগকে তিনি পদে পদে অপদস্থ করিয়াছেন। ড্রেফুর ব্যাপারের চিত্র পর্য্যন্ত তিনি এ পুস্তকে দিয়াছেন। এখানে তিনি জোলার মত সমর্থন করেন। আধুনিক ফরাসী দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া এ পুস্তকখানি পড়িলে, তাঁহার চরিত্রগুলি কাহাদের উদ্দেশে লিখিত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

যাহা হউক, এই পুস্তকখানিতে ঘটনার ফিরিস্তি অতিমাত্রায় আছে, এইজন্য বোধ হয় কালের কষ্টিপাথরে এখানি টিকিবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এখানিতে যে সমস্ত হাস্য-রসাত্মক বাক্য আছে তাহা প্রবচনের মত চলিবে। সমসাময়িক ঘটনার উপর ভবিষ্যৎ কালের সাধারণ পাঠকের শ্রদ্ধা থাকিতে বড় দেখা যায় না। যাহা হউক এ কথা সত্য, পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসা তাঁহার প্রবল ছিল। ঐতিহাসিক সত্য ও পুরাতাত্ত্বিকদিগের মতগুলি তিনি কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াও লোকশিক্ষার পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার [illegible] দুইখানি উপন্যাসের ও Sur une pierre blancheর গল্পগুলির পাঠকেরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

১৮৮৫ সালে Le livre de mon Ami প্রকাশিত হয়। এইখানি বহু সমালোচকের মতে তাঁহার স্বরচিত আত্মকাহিনী।

আমি তাঁহার যে কয়খানি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমার মনে হয় Thais তাঁহার কীর্ত্তির কাঞ্চনজঙ্ঘা। থেঈস পুরাকালের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। আলেকজেন্দ্রিয়ার জনৈক অভিনেত্রী ও রাজসভা-শোভিনী গণিকার চরিত্র-সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন এই সন্ন্যাসী। সুন্দরী ললামভূতা এই রমণী আবার উচ্চ-শিক্ষিতা ছিল। তাহার গুণমুগ্ধ অনেক প্রেমিক তাহাকে পাইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প ছিল। তদ্দেশীয় পুরোহিত Paphuntius তাহার অনুরাগী ভক্ত ছিল। তাহার প্রেমের প্রতিদান পাইবার জন্য পুরোহিত করে নাই এমন কার্য্য নাই। থেঈসের প্ররোচনায় যুবতী পবিত্র খৃষ্ট-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিল। সৌন্দর্য্যের উপাসিকা রমণীর যাহা কিছু সুন্দর নয়নাভিরাম ভোগ-বিলাসের বস্তু ছিল, তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না—প্রেম অমর চিরস্থায়ী, প্রকৃত প্রেম কাম নয়। কাম, কামনাকে প্রেম ভাবিয়া মানব কুপথগামী হয়। প্রেমের ভিতর দিয়া প্রেমময়কে পাওয়া যায়। আবার এ কথাও সত্য, জগতে জীবন ও কাম ভিন্ন খাঁটী সত্য আর কিছু নাই (Nothing is true but life on earth and carnal love)। কামের ভিতর দিয়া যে প্রেম জন্মে, সে প্রেম হইতে ভগবৎ প্রেম অনায়াসে পাওয়া যায়। কঠোর সন্ন্যাসী রমণী-চরিত্র সংশোধন করিল সত্য ; কিন্তু ক্রমে আপনার চরিত্র হারাইল, রূপের অনলে পড়িল—প্রেমের মধুর কলসীতে পড়িয়া উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। থেঈসের শোচনীয় মৃত্যুর ও Paphuntiusএর খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষার চিত্র মনোরম। আমি যে পুস্তকখানি পড়িয়াছি তাহার উপক্রমণিকায় G. F. Monkshood সাহেব বলিয়াছেন, আখ্যায়িকায়, বিবৃতিতে ও কল্পনার অবাধগতি-

ভঙ্গে আনাতোল যে উচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছেন, অন্য পুস্তক তত লোভনীয় স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে নাই। পুরাতাত্ত্বিকেরা Autinoeএ Thaisএর সংরক্ষিত দেহ নাকি পাইয়াছেন; কিন্তু কলাকুশলী আনাতোল তাঁহার তুলিকায় যে অনবদ্য-সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—প্রেমের মধুর মোহন প্রাণস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—যে মায়ার স্বপ্ন-জাল বুনিয়াছেন, জগতের কথা-সাহিত্যে সে চিত্র যে চিরকাল উজ্জ্বল ভাবে থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। প্রেমকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা মানবের নাই। কবি সত্যই বলিয়াছেন, 'কার প্রেম ফুটে শ্মশ্রু হয় ধবল যখন।' ফালের যবনিকা উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় শতকের অবিশ্বাসী পেগানদের এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। জগতের প্রথম শ্রেণীর ভাবুকেরাই এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন। মরুভূমির বর্ণনাও অতীব সুন্দর। থেঈসের শেষ দৃশ্য—থেঈসের মরণ-কাল আসন্ন'—প্রভৃতি বচনাবলী সকলের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। এ পুস্তকের ফলশ্রুতি অমূল্য। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপদেশাবলী হইতে কয়েকটী অনুবাদ করিয়া দিতেছি। (১) প্রচলিত কুসংস্কারগুলির ঊর্দ্ধে যাইতে হইলে সেগুলিকে সহ্য করিতে হইবে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে; (২) ভাবুককে তাহার মায়া-রাজ্যে শান্তিতে বাস করিতে দাও, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার ভ্রান্ত মত দূর করা যায় না। তাহার মতের আলোচনা করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করা যুক্তিসঙ্গত। (৩) জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা জগতে অধিকতর প্রভাবশালী নির্ব্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতা (৪) ভগবান্ ভিন্ন সকলই স্বপ্ন—মায়া; (৫) সামান্য বালুকাকণা বিপদ আনে। প্রত্যেক জিনিষ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে; (৬) কখনও রমণীদের স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; (৭) বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মানুষ ক্ষুদ্র; কিন্তু ভিতরের দিক্ হইতে দেখিলে তাহার শক্তি অসীম, পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ, কারণ পৃথিবী ত তাহারই মনের ভিতর; (৮) প্রেমই ধর্ম্ম; (৯) স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না; (১০) ভগবান প্রকৃত জ্ঞানীর অন্তরে বাস করেন।

অনেকগুলি ছোট গল্প আনাতোল লিখিয়াছেন সত্য; সেগুলি সংগ্রহ করিয়া 'Balthazar' (১৮৮৯); 'L.' Etride Sainte Claire (১৮৮৫) Crainquille, Putoios Riquet (১৯০৪) Les Coutes de Jacqnes Torne broche (১৯০৯) ও Les Sept femnes de le Barbe Blue (১৯০৯) পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে মোঁপাসা ও ব্যালজাকের ছোট গল্পের তুলনায় এগুলি নিষ্প্রভ। উপন্যাসে প্রথমে তিনি বাস্তবপন্থী ছিলেন, পরে ভাবুকতাবাদের অগ্রদূত হন; জোলা, মোঁপাসাঁ ফ্লবেয়ার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন।

আনাতোলের সাহিত্য-সাধনা কেন যে জয়যুক্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে পুস্তক-বিক্রেতা চিন্তাশীল জ্ঞানী পিতার নিকট হইতে পুস্তক-পাঠের স্পৃহা ও জ্ঞান তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ও ভক্তিমতি স্বধর্ম্মে আস্থাবতী সৌন্দর্য্যলিপ্সু মাতার নিকট হইতে কল্পনা ও রসানুভূতি সহজ সংস্কারবশে তিনি পাইয়াছিলেন। তারপর আপনার সাধনা-বলে, মানবচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া তিনি যে সকল সত্যে উপনীত হন, তাহা জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ সালে সাহিত্যবিভাগে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই, নোবেল পুরস্কারদাতারা এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ সম্মান দানে কেন কৃপণতা করিয়াছিলেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিপুল অর্থের কপর্দ্দকও তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃস্থ রুসবাসীর সাহায্যে দান করেন। এই শ্রেণীর দানই সাত্ত্বিক দান। যাঁহাদের হৃদয় উন্নত তাঁহারা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর—আপনাদের গৃহ সমাজ ও দেশের ভিতর—আবদ্ধ থাকেন না।

আনাতোলের নশ্বর দেহ মৃত্তিকাগর্ভে কবরস্থ হইয়াছে সত্য; কিন্তু আদর্শবাদের প্রচারক ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা আনাতোল যে সকল সত্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল তাপিত মানব-হৃদয়কে আনন্দ দান করিবে—রসধারা পান করাইয়া তৃপ্ত করিবে—অভাবব্যাধি-দুঃখক্লিষ্ট প্রাণকে শীতল করিবে। আনাতোলের ন্যায় ভাব-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক চিন্তাশীল সাহিত্যিক চির-অমর।

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা

(ও মহাত্মা গান্ধী)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাঙ্গালোর থেকে পুনায় আসা গেল। পুনায় আসার দুটো উদ্দেশ্য ছিল; একটা বিখ্যাত আবদুল করিমের কন্যার গান শোনা ও আর একটা মহাত্মাজীর সঙ্গে পুনা হাসপাতালে দেখা করা। বর্ত্তমান বৎসরের গোলা ফেব্রুয়ারী পুনায় পৌঁছই। মহাত্মাজী তখনও শয্যাশায়ী! শুনলাম, তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে লোকজনকে দেখা কর্ত্তে দিচ্ছে। এ সুবিধা ছাড়া নয়।

পুনা সহরটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ মনোরম। সেখানে এক মারাঠী প্রফেসরের অতিথি হওয়া গেল। তিনি বেশ সঙ্গীতানুরাগী দেখ্‌লাম। তবে বিধাতা বোধ হয় অন্ধেষুর সাম্‌নে চিরকালই দু'একটা দুর্ভেদ্য সমস্যা ধর্ত্তে ভালবাসেন। প্রফেসর ভদ্রলোক একজন সঙ্গীত-শিক্ষক রেখেছেন ও তাঁর কাছে রোজ তানপুরা নিয়ে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষক মহোদয় যে কোন অধিকারে গান করেন ও তাঁর সুশীল ছাত্র তাঁর কোন্ গুণে মুগ্ধ হয়ে সে গানও শিখ্‌তে উৎসুক হ'য়ে ওঠেন, এ সমস্যার সমাধান করা ত অন্ততঃ আমার কাছে অসম্ভব মনে হল। মারাঠী জাতির মধ্যে শুনেছিলাম, sense of humour বলে জিনিষটির বালাই নেই। বোধ হয় তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, শিক্ষনীয় গানের মধ্যে দরকারী উপাদান হচ্ছে: (১) শিক্ষকের বৃদ্ধত্ব; (২) তার গানের ও সুরের দুর্ব্বোধ্যতা; (৩) তার মধ্যে শিরঃ ও অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রাচুর্য্য, এবং (৪) তার রাগ-রাগিনী গুলি নিজের কাছে ছাড়া বিশ্বজগতে আর সকলের কাছেই বেসুরো শোনানো।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল তখন, যখন তিনি আমাকে আবদুল করিমের কন্যার গান শোনাতে নিয়ে গেলেন; ও শুধু তাই নয়, তার সুরেলা গানও তাঁর এত ভাল লাগ্‌ল যে, পয়সা দিয়ে শুন্‌তেও কুণ্ঠিত হ'লেন না। আবদুল করিমের কন্যার গান তাঁর ভাল না লাগ্‌লেও বা বলা যেতে পারত যে, গানের সম্বন্ধে তাঁর ও আমাদের মতন মরজগতের মানুষের valueই আলাদা। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, করিম-কন্যার মুলতান, পটদীপ প্রভৃতি রাগের সুষ্ঠু আলাপেও তিনি হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌লেন, তখন মনটা কেমন যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। এ অসঙ্গতির মীমাংসা কে করবে?

করিম কন্যার গান বাস্তবিকই শুনবার মতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিয়ে যখন দেখলাম যে, তার বয়স নিতান্ত কম (১৯।২০ হবে), তখন মনে হয়েছিল যে, পয়সা দিয়ে এর গান শুনতে না এলেই হ'ত। কারণ, গানবাজনা সম্বন্ধে আশৈশব চর্চ্চা করে এটা এখন বেশ বোঝা গেছে যে, ছেলেমানুষের গানে চিত্তাকর্ষক উপাদান যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চতম সঙ্গীতের আসল রসটি তার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠতেই পারে না। কারণ, গানে দরদ জিনিষটি যে কি, সেটা বুঝতে হলে বয়সের পরিণতি হওয়ার প্রয়োজন। ছেলেমানুষ কিন্তু সঙ্গীতে রসবিকাশের সঙ্গে বয়সের পরিণতির যথার্থ সম্বন্ধ বুঝতে পারে না। আবদুল করিমের কন্যাও দেখলাম এ জিনিষটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারেন নি। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর গান যে শোন্‌বার মতন মনে হ'ল, তার কারণ, প্রথমতঃ করিম-কন্যার গানের চাল অবিকল তাঁর পিতার চালের অনুরূপ, ও দ্বিতীয়তঃ, তাঁর গলায় তানের কান বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। আশা হ'ল যে, যদি পরে তাঁর কখনও চোখ ফোটে যে, নিছক অনুকরণে শ্রোতাকে আশ্চর্য্য করা যেতে পারে ও নিজের গ্রহণ করার ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে প্রকৃত রসসৃষ্টি করা যায় না,—তখন হয় ত তিনি তাঁর পিতার মতন না হোক্, একজন অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর শিল্পী হয়েও গড়ে উঠতে পারবেন।

পুনায় এক গায়ন সমাজ আছে। অর্থাৎ গানের ইস্কুল। একদিন যাওয়া গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে

অনেক শিখছে দেখলাম। দেখে বড় আনন্দ হ'ল। মারাঠী জাতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুরাগ বাঙালীর চেয়ে ঢের বেশি, এ কথা আমি ইতিপূর্ব্বে লিখেছি। এ ইস্কুলে সে অনুরাগের আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। কথা উঠতে পারে যে, তাদের মধ্যে হয়ত হিন্দুস্থানী গানের ভাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত আমাদের চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে; কিন্তু তাই বলে কি প্রমাণ হয় যে, তারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মারাঠী জাতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণেরও অভাব নেই। তবে সে সব প্রমাণ প্রয়োগ না করেও বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, তাদের মধ্যে যে classical গানের এত ভাল ভাল স্কুল স্থাপনা কর্ব্বার প্রয়াস দেখা যায়, সেইটাই তাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দাম দেওয়ার একটা মস্ত প্রমাণ। প্রত্যেক দেশের ও জাতির প্রতিষ্ঠান (institution) গুলিই হচ্ছে প্রধানতঃ সে দেশের বা জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক। বাংলা দেশে কবির অভাব হয় নি, কীর্ত্তনীর অভাব হয় নি, নাট্যকারের অভাব হয় নি—যে সব উদ্ভব বাংলার নিজস্ব, মহারাষ্ট্রের নয়। কিন্তু বাংলা দেশে একটা ভাল হিন্দুস্থানী গানের স্কুল আজ অবধি হ'ল না, এটা কি ভাববার বিষয় নয়? কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণে বাঙালীর চেয়ে বেশি খবর রাখে। তাই সেখানে সঙ্গীতে ভাতখণ্ডে, অল্লাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম, ভাস্কর রাও প্রভৃতির আস্তানা। খ্রীষ্টদেব বড় সত্য কথা বলেছিলেন যখন তিনি মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন: "Ask and it shall be given you; seek and ye shall find; knock and it shall be open unto you." আমাদের ছোট বড় সব চাওয়া সম্বন্ধেই এ গভীর বাণীটি খাটে বলে আমার মনে হয়। আমাদের দেশে উচ্চতম সঙ্গীত—অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত—যে আজ মুমূর্ষু, তার কারণ, আমরা আজকাল তা চাই না, তার আদর বুঝি না। যে দিন চাইব, যে দিন তার দাম দিতে শিখব, সেই দিনই আমাদের classical সঙ্গীতের বিকাশ জার্ম্মানি বা রুষ দেশের অনুরূপ হবে। একটা বড় আর্টের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই যে সে আর্টের বিকাশের একমাত্র উপায়, এ কথার মস্ত বড় উদাহরণ—রুষজাতির ইতিহাস। রুষজাতি সঙ্গীতপ্রিয় জাতি হ'লেও, আগে শুধু melodyই ভালবাসত। তাই বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে রুষদেশে harmonic সঙ্গীতের বিশেষ কিছুই বিকাশ হয় নি। কিন্তু তারা হঠাৎ এক দিন এ সঙ্গীতের দাম দিতে শিখল। ফলে, আজ রুষদেশ সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ জাতিদের মধ্যে অন্যতম, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

কথাটা এই:—কোন ললিতকলা বা জীবনের যে কোনও সম্পৎ হোক্ না—বিকশিত হতে পারে না, যদি তার আদর না থাকে। মহারাষ্ট্র দেশে ওস্তাদি সঙ্গীত লোকে টাকা দিয়ে শোনে; কাজেই সেখানে গায়করা ওস্তাদি সঙ্গীতের চর্চ্চা করবার অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পায়। সুতরাং সেখানে সঙ্গীতের স্কুল কলেজ এখানকার চেয়ে অনেক ভাল চলে। ফলে, সেখানে হিন্দুস্থানী এমন কি থিয়েটারী সঙ্গীতের মধ্যেও classical রসের প্রভাব বেশি দেখা যায়। পুনা গায়ন সমাজের প্রচেষ্টা দেখে, মারাঠী জাতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতানুরাগের কথা আমার আরও বেশি করে মনে হয়েছিল।

তবে মহারাষ্ট্র দেশে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদরটা একটু উল্‌টো দিকে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ সেখানে আজকাল নিছক্ কালোয়াতির যথেষ্ট আদর দেখা যায়—প্রাণহীন অফুরন্ত তানালাপের প্রতিপত্তি দেখা যায়, যার উল্লেখ আমি আগে করেছি। এটা আক্ষেপের বিষয়, তবে এতে ভরসাহীন হবার কিছু নেই। কারণ, আসল জিনিষটা সেখানে আছে; অর্থাৎ কি না উচ্চ সঙ্গীতের চর্চ্চা, আদর ও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা; কারণ, এ চেষ্টা থাক্‌লে, কোন্‌টা সত্যকার আর্ট ও কোন্‌টা আর্টের অপচার, সে সম্বন্ধে চোখ ফুট্‌তে দেরি হয় না। তবে আসল জিনিষটার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই যদি না থাকে, তবে অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমাদের উচ্চসঙ্গীতের ধারাটা যে আমাদের কত বড় সম্পৎ, সে ধারণাই বাঙালীজাতির নেই (এ কথা সত্যই অত্যুক্তি নয়)। তাই আমরা উচ্চসঙ্গীত শুধু যে বুঝি না তাই নয়, উপরন্তু এ না-বোঝাটা গৌরবজনক মনে করি। সুন্দর কি, মহৎ কাকে বলে, গরীয়ান বল্‌তে কি বোঝায়, এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে হলে চাই রসবোধ,

চাই চর্চ্চা, চাই প্রয়াস, চাই শিক্ষা। এক কথায়, উচ্চ সঙ্গীতের প্রতি বিমুখ হওয়াটা যে cultureএর অভাব সূচনা করে, এ সত্যটি না বুঝলে উচ্চসঙ্গীতের কোনও মহনীয় বিকাশ আমাদের দেশে হ'তেই পারে না।

২রা ফেব্রুয়ারী সকালে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলাম। আমি যে সঙ্গীতের একজন উৎসাহী ছাত্র, এ কথা মহাত্মাজীর কাছে সেদিন প্রকাশ করে ফেলেছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এক কন্যা। তিনি মহাত্মাজীর বিছানার পাশে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি সঙ্গীতের ছাত্র শুনে, মহাত্মাজী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন। মীরাবাইয়ের সুন্দর গানগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, মহাত্মাজী বল্‌লেন, "খুব আছে। আমি মীরার অনেক গানই শুনেছি ও তার অনেক গানেরই আমি ভক্ত। গানগুলি এত সুন্দর কেন, না, সেগুলি লোককে খুসি করার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি—হৃদয়ের নিহিত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্ত করে তোল্‌বার প্রেরণায় রচিত।" কথাটি বেশ লাগ্‌ল।

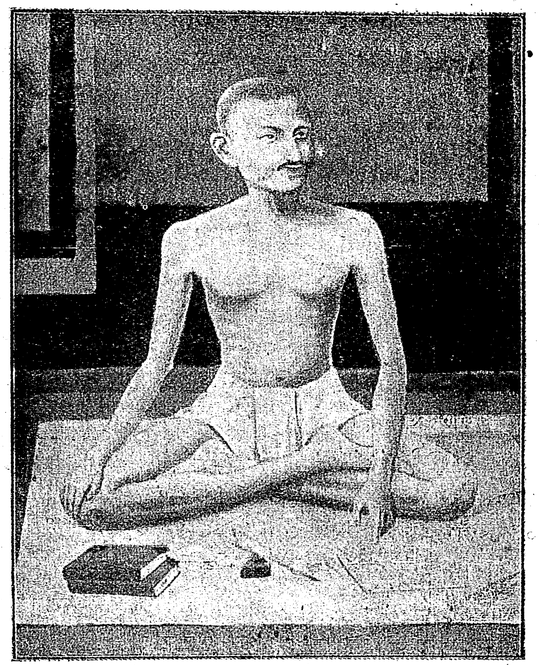

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজী কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লেন, "তোমাকে তোমার গান শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্নবাদ করছি, আমার তাতে একটু স্বার্থ আছে ব'লে। আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসি, যদিও সঙ্গীতের সমজদার নই। দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার আমি আহত হয়ে হাঁসপাতালে ছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধুর কন্যা আমার অনুরোধে প্রায়ই Lead kindly light গানটি গাইতেন। তাতে আমার যেন অর্দ্ধেক যন্ত্রণা কমে যেত। তাই আমার অনুরোধ, তুমি যদি আমাকে দয়া করে সন্ধেবেলা একটু গান শুনিয়ে যাও।"

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা অপরের ছোট খাট কোনও সদয় ব্যবহারেরই দাম দিতে ভোলে না। আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাঁরা মনে করেন, জগৎটা তাঁদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, ও জগতের যাবতীয় লোকেরই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত—পদে পদে তাঁদের সেবা করা। ভারতবাসী ইংরাজ, অপিচ, অনেক ভারতীয় সিভিলিয়ান প্রায়ই এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। মহাত্মাজীকে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোক বলা যেতে পারে। তাই তাঁর মতন লোকের যে-কোনও রূপ সেবার অধিকার লাভ করা যে মানুষ মাত্রেরই কাছে একটা কাম্য জিনিষ, সেটা স্বীকার কর্ত্তে তিনি এত সঙ্কুচিত। এমন কি, আমার মনে হয় যে, এ কথা বল্‌লেও বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে, মহাত্মাজী নিজেকে মানুষের ছোট-খাট প্রত্যেক সেবা গ্রহণেরই অযোগ্য বলে মনে করেন। তাই জেলের ডাক্তার ম্যাডক, জেলের পরিচারিকাগণ, তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের শুভকামনাকেই তিনি বড় করে না দেখে পারেন নি। মাদৃশ সামান্য লোককে গান কর্ত্তে অনুরোধ করায় মহাত্মাজীর যে একটা সত্যিকার কুণ্ঠা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল, সেটা তাঁর চরিত্রের এই মনোজ্ঞ দিক্‌টারই পরিচায়ক। আমি এ দিক্‌টা মানুষের হৃদয়ের বিকাশের দিক্ দিয়ে একটা মস্ত দিক্ বলে মনে করি। তাই মহাত্মাজীর এ অনুরোধ প্রসঙ্গে এত কথা না বলে থাক্‌তে পারলাম না।

উত্তরে অবশ্য আমি মহাত্মাজীকে বলেছিলাম যে, তাঁর মর্তন লোককে যদি গান গেয়ে আমি সামান্য আনন্দও দিতে পারি, তবে সেটা আমি নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করব। তাতে মহাত্মাজী যেন পুনরায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক্, তিনি আমাকে সেই দিনই সন্ধ্যায় একটু নিরিবিলি সময়ে আসতে বল্লেন। তবে বলেই তিনি ঘরের য়ুরোপীয় পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন যে, সন্ধ্যায় গান কর্লে হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীদের কোনও অসুবিধা হবে কি না। এ প্রশ্ন করাটাও মহাত্মাজীর চরিত্রের অপরের সুবিধা অসুবিধা ভাবা-রূপ মনোহর দিক্‌টার পরিচয় দিয়েছিল। এ সব ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে আসল মানুষটির যে পরিচয়টি পাওয়া যায়, বড় বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে সে পরিচয়টি পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। কারণ, জীবনে বড় বড় ঘটনার সময়ে লোক-চক্ষুর সাম্‌নে আসার কল্পনায় আমরা প্রায়ই সতর্ক হয়ে চলে থাকি। কিন্তু ছোটখাট ঘটনায়ই আমরা নিজ মূর্ত্তি ধরি, যেহেতু না ধরেই পারি না। তাই আমার মনে হয় যে, কোনও মহৎ লোককে বুঝতে হলে, তাঁর জীবনের দৈনিক খুঁটিনাটি আচরণ লক্ষ্য করার মূল্য আমরা সচরাচর যথেষ্ট পরিমাণে দিই না।

সন্ধ্যাবেলা মহাত্মাজীর ঘরে একটি তানপুরা নিয়ে প্রবেশ করলাম। ঘরে শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি, রাজগোপালাচারিয়া ও মহাদেও দেশাই ছিলেন। আমি মীরাবাইয়ের "চাকর রাখোজী" বলে একটি ভজন ও বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় "দীন দয়াল গোপাল হরি" বলে একটি পূরবী গাইলাম।

গান শুন্‌তে শুন্‌তে মহাত্মাজীর প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, ও সেই স্তিমিত আলোকেও তাঁর চোখ দুটি ছল ছল কর্ত্তে লাগ্‌ল। মনে আছে, সেদিন গান করে মহাত্মাজীকে এতটা আনন্দ দিতে পেরেছিলাম বলে, মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। যাঁর আজীবনের সাধনা—পরের উপকার, যাঁর জীবনই—পরের জন্য, তাঁর ঋণ যে আমাদের অপরিশোধ্য। তাই বুঝি তাঁকে আমাদের সাধ্যমত যৎসামান্য কিছু অর্ঘ্য দিতে পারলেও মন হর্ষে বলে ওঠে যে, একটা কাজের মতন কাজ হ'ল।"

খানিকক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন। মহাত্মাজী আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার কর্লেন, কোনও কথা বল্‌লেন না। বুঝলাম, তৃপ্তিরসটি তাঁর কাছে সত্য হয়েই ধরা দিয়েছে; তাই কথায় তাকে প্রকাশ করে তাকে ছোট করতে চাইলেন না। তখন মনে হ'ল যে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত হোক্ বা না হোক্, ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত (যেটাও একটা মহৎ সঙ্গীত) বোধ হয় মহাত্মাজীকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্পর্শ করে।

খানিক পরে আমি বল্‌লাম: "আমাদের স্কুল কলেজে আমাদের অপূর্ব্ব ভারতীয় সঙ্গীতের যে কোনও স্থানই আজ অবধি করা হয় নি, এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয় বলে আমার মনে হয়।" মহাত্মাজী বল্লেন, "নিশ্চয়ই এবং আমি বরাবরই এ কথা বলে এসেছি।" মহাদেও দেশাই সায় দিলেন যে, মহাত্মার মত এই রকমই বটে।

আমি বল্‌লাম: "আমি এ কথা শুনে বড় খুসি হ'লাম। কারণ, আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, আপনি সঙ্গীত বা অন্যান্য সুকুমার কলার বিরোধী।"

মহাত্মাজী সবিস্ময়ে বলে উঠ্‌লেন: "আমি সঙ্গীতের বিরোধী! আমি!" বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর প্রশান্ত ভাবে একটু হেসে বল্‌লেন, "বুঝেছি, বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে নানা লোকের মনে এত রকম ভুল ধারণা আছে যে, এখন সে সব ধারণার মূলোৎপাটন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে হয়েছে এই যে, আমার বন্ধুরা হাসেন, যখন আমি বলি যে, আমি নিজেকে একজন আর্টিষ্ট মনে করি।"

আমি বল্‌লাম, "এ কথা শুনে আমি ভারি আশ্বস্ত হ'লাম। কারণ আমার মনে হ'ত যে আপনি জীবনকে গড়ে তুল্‌তে চান শুধু ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে—asceticismএর প্রভাব দিয়ে; যার মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায় আর্টের কোনও স্থান নেই।"

মহাত্মাজী সজোরে বলে উঠ্‌লেন: "কিন্তু আমি বল্‌তে চাই যে asceticism হচ্ছে—জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান আর্ট।"

মহাত্মাজীর এ কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া আমাদের পক্ষে একটু কঠিন না হয়েই পারে না। কারণ, asceticism সম্বন্ধে অরবিন্দ যা বলেছেন, সেইটাই আমার কাছে চরম কথা বলে মনে হয় (the Life Divine)।

তিনি দেখিয়েছেন যে, মানব-সমাজের ক্রমবিকাশে এক সময় ছিল, যখন দৈনিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দাবী-দাওয়া কাটিয়ে ওঠবার জন্য একদল লোকের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে যোগী হয়ে বসে থাকার দরকার ছিল। কিন্তু আজ মানুষের বোঝার সময় এসেছে যে, সমাজের দাবী অবহেলা করে শুধু নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হলে, তাতে জীবনে কোনও মহনীয় সম্পূর্ণতাই অর্জ্জন করা যায় না। তা যদি যেত, তবে সৃষ্টির এই অজস্র বাহুল্যের কি দরকার ছিল? তাহলে স্বতঃই স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানুষের জীবনে নিত্য নূতন সৃষ্টি করার যা-কিছু প্রচেষ্টা সবই শুধু মরীচিকার পিছনে ছোটা। Asceticism মানে—এ জগৎটা কিছুই না। এই কথাই যদি মানুষের অভিজ্ঞতার চরম বাণী হয়, তাহ'লে স্বতঃই মনে প্রশ্ন ওঠে যে, এ জগৎ সৃষ্ট হবার দরকারটা কি ছিল? আমার মনে হয় যে, asceticismএর যে মহৎ দিক্‌টা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষকে তার দেহের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ কর্ত্তে হবে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মানুষ আজ অবধি মনোজগতে যা কিছু বিরাট্ ও রমণীয় সৃষ্টি করেছে, সে সবই মায়া মাত্র। অরবিন্দ সত্যই বলেছেন যে, আমাদের এরূপ philosophyর ফল হয়েছে "A great bankruptcy of Life." (The Life Divine) তাঁর এ কথাটি আমার খুবই গভীর সত্য বলে মনে হয় যে, "We must accept the manysidedness of the manifestation even while we assert the unity of the Manifested." (ঐ)

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

যাই হোক্, আমি মহাত্মার তখনকার দুর্ব্বল শরীরের অবস্থা দেখে, এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করাটা উচিত মনে কর্লাম না। কারণ, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আর্ট বল্‌তে আমরা সচরাচর যা বুঝি, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা। তাই আমি বল্‌লাম, "তা হতে পারে, কিন্তু আমি এখন আর্ট বল্‌তে বুঝেছিলাম, সঙ্গীত বা চিত্রকলা বা অনুরূপ কোনও ললিতকলা। এবং আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম যে, এরূপ সৃষ্টির আপনি বিরোধী বলেই আমার ধারণা ছিল।"

মহাত্মাজী আবার বলে উঠ্‌লেন: "আমি সঙ্গীতের ন্যায় সুকুমার কলার বিরোধী! আমি ত সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের কথা কল্পনাই কর্ত্তে পারি না। আমি যে সঙ্গীতাদি ললিতকলার ভক্ত, এ কথা আমি খুব জোর করেই বল্‌তে চাই। কেবল এ সম্বন্ধে এ সব ললিতকলার কিরূপ বিকাশ কাম্য, সে বিষয়ে আমি প্রচলিত মতের সমর্থন করি না, এই মাত্রা যেমন, আমি তাকে আর্ট বলি না, যা উপভোগ কর্ত্তে হ'লে, তার গঠন-প্রকৃতির (technique) সঙ্গে বিশেষ পরিচয় লাভ করা অপরিহার্য্য। তুমি যদি সত্যগ্রহ আশ্রমে যাও, তবে

দেখ্‌তে পাবে যে, তার দেওয়ালগুলি খালি। আমার বন্ধুরা আপত্তি করেন আমি ছবি রাখি না ব'লে। কিন্তু আমি রাখি না, কারণ, আমি মনে করি, দেওয়াল তৈরী হয়েছে আমাদের আশ্রয় দেবার জন্য। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, আমি আর্টের বিরোধী। আমি কত সময়ে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকি! এবং আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ গরিমাময় দৃশ্যের পাশে কি মানুষের সৃষ্ট কোনও ছবি দাঁড়াতে পারে?—এ বিরাট্ আকাশের মহিমময় দৃশ্য আমাকে তার রহস্যে অভিভূত করে দেয়, ও আমার মনে পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বরের এ অপূর্ব্ব শিল্পের পাশে কি মানুষের সৃষ্ট শিল্প তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয় না?"

এ কথার উত্তরে আমার বল্‌বার ছিল যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রকৃতি মানুষের চেয়ে বড় শিল্পী—(যদিও এ ধরে নেওয়াটা সঙ্গত নয়, কেন না এটাও নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব বা রুচির উপর) তাহলেও মানুষ যে প্রকৃতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৃষ্টিও কেন উপভোগ কর্ত্তে পারবে না, তার ত কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটাকে ভালবাস্‌তে হলে অপরকে যে বর্জ্জন করতেই হবে, এটা মেনে নেওয়া কি একটু কঠিন হয়ে পড়ে না—যেমন মহাত্মাজীর আশ্রমের দেওয়াল খালি রাখার ক্ষেত্রে? আমার ত পরমহংস দেবের কথা খুব সত্য মনে হয় যে, "একঘেয়ে কেন হব?" নক্ষত্র ও ছবি দুইই কেন না উপভোগ করব? তবে মহাত্মাজী যে টল্‌ষ্টয়ের একজন বিশেষ ভক্ত ও এগুলি যে টল্‌ষ্টয়ের মতামত তা আমি বিলক্ষণ জান্‌তাম বলে, আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাদের মতের মিলের দিকটার উপরই জোর দিয়ে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে কর্লাম। কারণ, অন্যথা তর্কের বহর অত্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি বল্‌লাম:—

"প্রকৃতি যে একজন অতি উচ্চদরের শিল্পী, সে সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আপনি যে আর্টের অপচার ও ব্যভিচারের উল্লেখ কর্চ্ছেন, সেটার অনৌচিত্য সম্বন্ধেও আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। তাছাড়াও আমার নিজের মনে হয় যে, আজকাল যে একদল তথাকথিত আর্টিষ্টের সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা বলেন যে আর্ট জীবনের চেয়ে বড়, তাঁরাও ভ্রান্ত।"

মহাত্মাজী সোৎসাহে বলে উঠ্‌লেন: "ঠিক্ কথা। জীবন নিশ্চয়ই সব আর্টের চেয়েই বড় এবং সে চিরকাল বড়ই থাক্‌বে। এ বিষয়ে আমি আরও বেশি দূর যাই ও বলি যে, সে-ই সব চেয়ে বড় আর্টিষ্ট যে সব চেয়ে মহৎ ভাবে জীবন কাটায়। কারণ, যে আর্ট মহৎ জীবনের ফল নয়, সে আর্টের মূল্য কতটুকু? আমি কেবল সেই আর্টকেই বড় বলি যে আর্ট মানব-জীবনকে মহত্তর করে। তাই যখন কেউ কেউ বলেন যে, আর্টই সব ও জীবন কেবল তার বিকাশের যন্ত্র মাত্র, তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বলে ওঠে যে, এ হতেই পারে না। তখন আমি বল্‌তে বাধ্য হই যে, আমার আর্টের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তখন লোকে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত কর্ত্তে দ্বিধা বোধ করে না যে, আমি সর্ব্বপ্রকার আর্টেরই বিরোধী!"

এ সব মতামতের অনেকগুলি মহাত্মাজীরই যোগ্য সন্দেহ নেই; তবে আমার মনে হয় যে, মহাত্মাজী শিল্পী ও মহৎ লোকের একই সংজ্ঞা দিয়ে একটি গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে তিনি বল্‌ছেন যে শিল্পী সেই যে সব চেয়ে মহৎ জীবন উদ্‌যাপন করে, সেখানে তিনি এই কথা বল্‌লে আর কারও কিছু বল্‌বার থাক্‌ত না যে, মানুষের শ্রদ্ধার রাজ্যে মহাপ্রাণ লোকের স্থান নিছক্ শিল্পীর চেয়ে উর্দ্ধে। যেমন, এ কথা বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধ ছিলেন একজন মহাত্মা ও তানসেন বা কালিদাস ছিলেন শিল্পী; তবে বুদ্ধ আমাদের কাছে অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

মহাত্মাজীর আর্ট সম্পর্কে মতামতগুলি প্রায় সবই টল্‌ষ্টয়ের মতামতের প্রতিধ্বনি, এ কথার আমি উল্লেখ করেছি। এ শ্রেণীর মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামত সম্পূর্ণ মেলে না। তবে সে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে করেছি বলে, আজ এ সম্পর্কে শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হব যে, মহাত্মাজী আমাদের আগেকার যুগের সেই সম্প্রদায়ের লোক, যাঁরা জীবনকে নিতান্তই সহজ সরল করে ফেলাই জীবন-সমস্যার যথার্থ সমাধান বলে মনে কর্ত্তেন। তবে আমার মনে হয় যে, জীবনের প্রতি এরূপ attitudeটা মোটের উপর অসত্য ও অগভীর। কালের অতিপাতে নিত্য নূতন স্রোতের আমদানী হচ্ছে। সৃষ্টির একটা

নিহিত প্রেরণা হ'তেই বৈচিত্র্য-বাহুল্যের উদ্ভব। সব কেটে-ছেঁটে আমরা আমাদের জীবনকে বা আমাদের চিন্তাধারাকে কখনই আবার আগের মতন সহজ ও সরল করে আন্‌তে পারব না, এবং সেটা বাঞ্ছনীয় বলেও মনে হয় না। সৃষ্টি হচ্ছে—প্রকৃতির বিকাশ। সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু অপ্রকাশ আছে তাকে প্রকাশ কর্ব্বার, যা কিছু অব্যক্ত আছে তাকে ব্যক্ত করবার, যা কিছু অমূর্ত্ত আছে তাকে মূর্ত্তিমতী করে তোল্‌বার একটা অফুরন্ত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা কেন, তা আমরা আজ অবধি জান্‌তে পারি নি—হয়ত একদিন জান্‌তে পারব—কিন্তু প্রকৃতির এ প্রয়াস যে নিত্যই নব নব দিকে উন্মেষলাভ করছে, তা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। এ কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে এ সব নূতন নূতন স্রোতকে কাটিয়ে যাওয়াকে কেমন ক'রে বড় করে দেখা যেতে পারে? এই কাটিয়ে যাওয়াটাই কি এ নূতনের যথার্থ আবাহন? আমার ত মনে হয় যে, আমাদের বর্ত্তমান বিকাশ এই জটিলতার দরুণই সম্ভবপর হয়েছে। বর্ত্তমানের নূতন স্রোতের ফলেই ভবিষ্যতের বিকাশ। জটিলতায় কি যায় আসে? আসল কথা harmonyর প্রকার-ভেদ নিয়ে। প্রত্যেক জীবনই ত এই harmonyর খোঁজে ছুটেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, জীবনে জটিলতা যত বেশি হয়, তার ফলে যে harmonyর সৃষ্টি হয়, তার তৃপ্তিরসও তত গভীর হয়ে ওঠে। তাই জীবনকে জোর করে সহজ ও সরল করা কাম্য বা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলে মনে হয় না। মহাত্মাজীর নিজের জীবনের পরিণতিই কি তুকারাম বা তুলসীদাসের চেয়ে বেশি জটিল নয়? এবং আশা করি, অল্প লোকেই বল্‌বে যে, পুরাকালের এরূপ গ্রাম্য সরল ভক্ত ব্রাহ্মণের জীবনের পরিণতি ভক্ত মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধীর জীবনের পরিণতির চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় ও বেশি গভীর ছিল। "What is, is the realisation of an anterior potentiality; present potentiality is a clue to future realisation." (The Life Divine—অরবিন্দ)

শ্রীক্ষেত্র

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ

সিন্ধু হেথায় বন্দনা গায় দীনবন্ধুর চরণ দ্বন্দ্বে,
সন্ধ্যা-প্রভাতে পঠিছে নান্দী অযুত কণ্ঠে অগাধানন্দে,
শান্ত স্বরূপ কান্ত চরণোপান্তে নিয়ত নমে অনন্ত,
কোটী তরঙ্গ-গজতুরঙ্গে অর্ঘ্য প্রেরিছে দিগ্‌দিগন্ত।
এর ধূলি মাগে প্রয়াগ, কাঞ্চী, গয়া, বারাণসী, মায়া, অবন্তী,
গভীর তত্ত্ব লভিতে জুটিল হেথায় কবীর-নানক-পন্থী।
শঙ্কর হেথা ওঙ্কার নাদে বাজাল বৌদ্ধ-বিজয় শঙ্খ,
নিতায়ের প্রেম-অশ্রুধারায় হলো এর ধূলি সুরভি-পঙ্ক,
মঠমন্দির—পুলকাঙ্কুরময় কলেবর এই শ্রীক্ষেত্র;
দেশকালাতীত অধিদৃষ্টিটি লভিল হেথায় জ্ঞানীর নেত্র।

জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, সৌর, গৌর ভক্তবর্গ
যুগযুগাহৃত সাধনাপুঞ্জে গড়িয়া তুলেছে এই ভূস্বর্গ।
যজ্ঞশালাতে পরিণত হেথা দৈত্যপূজার চৈত্যসংঘ,
বজ্রযানের সমাধির পঙ্কে রাজিল রঙ্গে মধু মৃদঙ্গ।
গীতগোবিন্দ সঙ্গীত হেথা ঝঙ্কৃত হলো ললিত ছন্দে,
পদ্মাবতীর চরণ চারণ লভিল সিদ্ধি চরমানন্দে।
এর মহিমায় বিশ্ব-বন্দ্য, শ্রুতিনিন্দিত উৎ-কলিঙ্গ,
ত্রিদিব সোপান রচেছে 'খণ্ড'-'নীলাচলোদয়' 'ধৌলি' শৃঙ্গ।
ধ্যানের পদ্ম, জ্ঞানের সদ্ম, দানের সত্র, এই শ্রীক্ষেত্র,
পুরুষোত্তমে হেরিতে হেথায় ফুটিল যোগীর ললাট নেত্র।

পূজে এরে চীন, সিংহল, শ্যাম, মিলে হেথা প্রেমে দ্রাবিড় আর্য্য
কোলাকুলি করে হেথা রামানুজ শ্রীরামানন্দ মাধবাচার্য্য!
মারাঠীর মঠ জপিতেছে হেথা শূরগুরু রামদাসের মন্ত্র,
ভাগবত সাথে করেছে সন্ধি হেথা বেদান্ত গীতা ও তন্ত্র।
ধরে' আছে কত দণ্ডীর জটা, বুকে নিমায়ের ছিন্ন কন্থা,
এই নীলাচলে মিলে ভেদ ভুলে সব মতবাদ সফল পন্থা।
ভারত জুড়িয়া শাস্ত্রে, ধর্ম্মে, তন্ত্রে, মন্ত্রে এত যে দ্বন্দ্ব,
সিন্ধুর কূলে মন্দির মূলে হেথা হলো প্রেমে মিলনানন্দ।

শত সহস্র নাশ্রু প্রেমের অবিশ্রয়ন এই শ্রীক্ষেত্র
হেথায় ফুটিল লক্ষ লক্ষ ভক্ত যোগীর মোক্ষ-নেত্র।

জপনিযুক্ত যবন-ভক্তে করিল মুক্ত নামব্রহ্ম,
জ্ঞানের গর্ব্ব ভাসাইল প্রেমে হেথা বাসুদেব সার্ব্বভৌম।
মহানীলিমায় মিলা'ল হেথায় লীলা সম্বরি' নদীয়াচন্দ্র ;
প্রতিমন্দ্রিত কীর্ত্তন রোলে আজো এর প্রতি বিবর রন্ধ্র।
কুক্কুর-লীঢ় মহাপ্রসাদো হেথা আচারীরে বিতরে মুক্তি,
হেথায় অন্ন ব্রহ্ম শাসনে পঙ্গু, জাতির স্মৃতির যুক্তি।
যুগে যুগে কোটি ভক্তজনের আকুতি নিষ্ঠা লভিয়া কেন্দ্র,
দারুর প্রতীকে জাগা'ল ব্রহ্মে, নেমে এলো প্রেমে রাজরাজেন্দ্র
যুগে যুগে শত লাঞ্ছনাহত পীড়নে অটল এই শ্রীক্ষেত্র,
হর্ত্যাকুলীশ অত্যাচারীরো হেথা প্রেমারুণ কলুষ নেত্র।

রাখালী নিয়াছে হেথা রাজা, ব্রজ রাখালেরে দিয়া রাজৈশ্বর্য্য,
যোগিগণ করে ভক্তি সাধন ভোগিজন ধরে ব্রহ্মচর্য্য।
বিষয় বাসনা মুক্ত হেথায় ওড্রভূষণ প্রতাপ রুদ্র,
বিপ্রেরা হলো বিশ্বসেবক নর-নারায়ণ-দাস্যে শূদ্র।
যযাতিকেশরী, পুরুষোত্তম, চোলগঙ্গের কীর্ত্তি পুণ্য
ছত্রছায়ায় রেখেছে ইহায়, মহিমা যে এর চির-অক্ষুণ্ণ।
শতেক শিষ্য সঙ্গে নিঃস্ব গোস্বামী প্রভু একদা অত্র
নিঃসম্বল, মাধুকরী ব্রতে খুলিল বিশ্বজিতের সত্র।
মৃৎপঞ্জরে কত যে সাধুর কঙ্কাল ধরে এই শ্রীক্ষেত্র,
সকল দ্বন্দ্ব দ্বিধা ভঞ্জন অঞ্জন লভে হেথায় নেত্র।

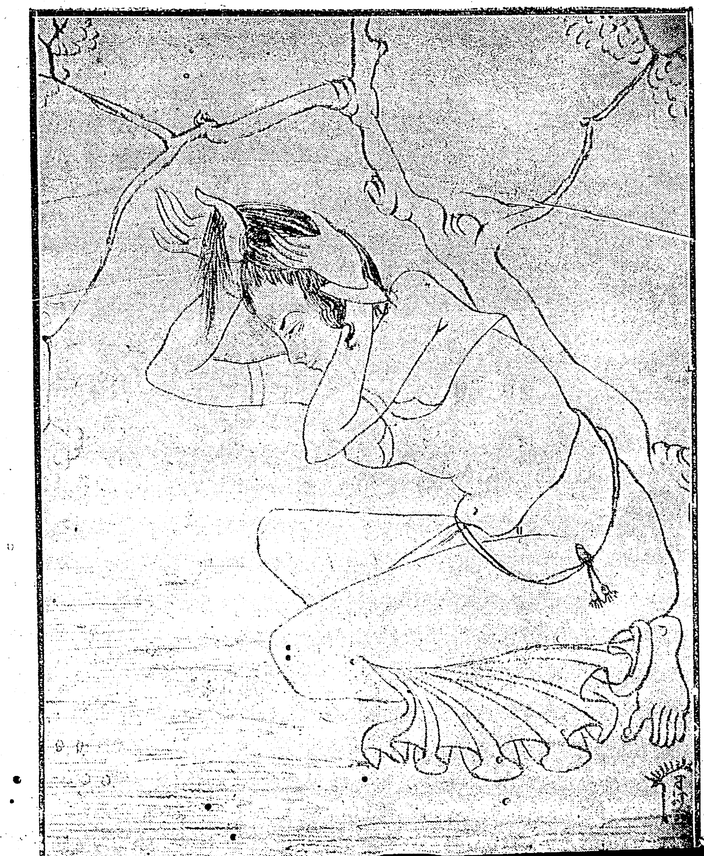

কৈফিয়ৎ—

এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে যে "মধুপুর ভ্রমণ" লিখিতে বসিলে পাঠক-পাঠিকারা ত হাসিবেনই, উপরন্তু লেখকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ তাঁহাদের জন্মিবে ; কারণ যত মধুই ঐ নামে থাক, সে ত ঘর বাড়ীরই সামিল হইয়া গিয়াছে। রেলপথে মধুপুর মাত্র ১৮৩ মাইল দূর, ডাক গাড়ীতে চড়িলে ছয় ঘণ্টাতেই সেই মধুর দেশে পৌঁছিতে পারা যায়। গুটি তিনচার ষ্টেশনে গাড়ী থামে, চা, পান-সিগারেটের কলরব উঠে, আর গাড়ী মধুপুর পৌঁছাইয়া যায়।—তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে পারে না। আমরা তাই পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, ভ্রমণবৃত্তান্ত যখন লিখিতেই হইবে, তখন ভ্রমণ-টা না করিয়া লেখা সমীচীন হইবে না ;—আমরা মোটরে মধুপুর যাত্রা করিলাম।

যাত্রা—

উদ্যোগ আয়োজনটা বেশ-কিছু-দিন ধরিয়াই করা যাইতেছিল। গাড়ী সোজা মধুপুর যাইতে পারিবে কি-না, পথ আছে কি-না, পথে কিরূপ পাহাড় ও নদ নদী আছে—এ সকল কথা সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতেছিল, কিন্তু ঠিক খবর কেহ-ই দিতে পারেন নাই। অনেকেই বলিলেন, পথের মাঝে নদা আছে, নদীতে ভীষণ জল-স্রোত, গাড়ী যাইবে না। কেহ-কেহ একটু অভয়-ও দিলেন, নদীতে জল কম, কেবল বালি আছে, গাড়ী ঠেলিয়া যাওয়া যাইতে পারিবে। বলা প্রয়োজন, বুদ্ধিদাতারা কেহই প্রত্যক্ষদর্শী নহেন। নিরুৎসাহ হইলেও ইচ্ছা দমন করিতে পারা গেল না। আমরা একদিন সদলবলে Automobile Association of Bengal মোটর সভার দ্বারস্থ হইলাম। একটি বাবু তাঁহাদের পুঁথি-পত্র বিস্তর ঘাঁটিয়া দেখিলেন ; তাহাতেও কিছু হদিস পাওয়া গেল না। তবে এইটুকু ভরসা দিলেন যে আমরা যদি পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হই, তিনি সভার কাগজ-পত্র হইতে একটি ম্যাপ, একটি প্ল্যান করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা তাহাতেই সম্মত। সম্মত না হইয়া করি কি! আমাদের আগে যদি কেহ এই সভার অনুমোদিত পথে সোজা মধুপুর যাইত, তবে তাহাদের পথ-বিবরণের একটি নকল সভায় থাকিতই, এবং আমরাও বিনা-আয়াসে মহাজনগণের পথের বিবরণ-লিপি পাইতে পারিতাম ; তাহা যখন

নাই, তখন খরচ করিয়া আমরা একটা বিবরণলিপি করাইয়া লইয়া ভবিষ্যৎ-ভ্রমণকারীদিগের সম্মুখে "মহাজন" হইয়া থাকিব না কেন বলুন !

পরদিন সন্ধ্যাকালে সভায় গিয়া ম্যাপ ও প্ল্যান সংগ্রহ করা হইল। ভোঁস সাহেবের (শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার বসু—যাঁহার মূল্য মাত্র ৫ পয়সা অর্থাৎ যিনি এক পয়সার 'শিশিরে'র সম্পাদক বলিয়া খ্যাত) স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর, কোথায় কি রাখেন, তখনই ভুলিয়া যান, অনেক সময় ডান হাতে অভীপ্সিত দ্রব্য রাখিয়া তিনি সারা গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাই প্ল্যান ও ম্যাপখানি সুধাংশুবাবু (শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়—এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র) তাঁহার হেফাজতে রক্ষা করিলেন। রাস্তার বিবরণ যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন যাত্রার উদ্যোগ করিতে আর কাহারও দ্বিধা থাকিল না। Automobile Association—মহামান্য সাহেবগণ পরিচালিত সভা, কাজেই আমরা নির্ভয়ও হইলাম।

বাঙ্গালী যতক্ষণ না শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিতে পারিতেছে ততক্ষণ 'যাইতেছি' বলে না; অন্ততঃ এ-অভাজন ত বলেই না; ততক্ষণ বলিতে হয়, যাইবার কথা আছে, বোধ হয়, সম্ভবতঃ, ইত্যাদি। অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া ঠকিয়া এই অভিজ্ঞতাটুকু আমি সঞ্চয় করিয়াছি। শুক্রবার (পঞ্চমী) মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে-সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বাচনিক অথবা টেলিফোণিক সংবাদ লইয়াছেন, তাঁহাদেরই বলিয়াছি, যাইবার কথা আছে বটে। সহযাত্রীদের কাছেও মন খুলিয়া 'হাঁ' বলিতে পারি নাই। তাহার একটা কারণও ছিল। আমার একটি পুত্র তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাগত ছিল। অপরাহ্নে আমার গৃহ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি মহাশয় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমার যাওয়া হইতে পারে কি-না, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন, কথা ছিল; হঠাৎ জরুরী তলবে তাঁহাকে দূরে চলিয়া যাইতে হওয়ায় তিনি আসিতে পারিলেন না। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া। শ্রীমতী তাঁহার রায় দিলেন, ডাক্তারের বিনা-আদেশে যাওয়া হইতে পারে না। অনেকখানি দমিয়া গেলাম। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কেহ-কেহ দুই তিন দিন হইতে গৃহস্থ "উপরওয়ালা"র নিকট আবেদন-পত্র পেশ করিয়া অতি কষ্টে ছুটি মঞ্জুর করাইতে পারিয়াছেন; অকস্মাৎ আমার জন্য যদি তাঁহাদের যাওয়া স্থগিত রাখিতে হয়, ঘরে পরে তাঁহাদের লাঞ্ছনার চিত্র ভাবিয়াই মনটা বড় দমিয়া গেল। আমার বাড়ীতে বিপদ আরও একটু হইয়াছিল। সেই দিনই সন্ধ্যায় শুনি যে আমার অন্য দুই ভ্রাতাও পূজাবকাশ যাপন করিতে স্ব-স্ব "মধুপুরে" যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত; এমতাবস্থায় রুগ্ন পুত্রকে ফেলিয়া যাইতে মনও সরে না। সহযাত্রীদের সংবাদ দিলাম। বারুদ-স্তূপে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল। ভোঁস সাহেব তাঁহার বিশাল-বিপুল-বপু দুলাইয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিলেন; সুধাংশুশেখর সুরেন্দ্র বন্দ্যো হইয়া বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন; ননি ছল-ছল চোখে চাহিয়া বসিয়া রহিল; ড্রাইভার রাধাবিনোদের অবস্থাটা অতীব করুণ হইয়া উঠিল,—বেচারা কাঁদে আর কি! আমাদের সান্ধ্য-সভায় তখন আরো-অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বয়সে তরুণ, অ-সংসারী এবং বিজ্ঞানভক্ত (M. Sc ছাত্র) হইলেও একটু স্থবির-স্বভাব। প্রথমাবধি তিনি এই দূরপথ-মোটর-অভিযানের বিরুদ্ধেই কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন; শেষাশেষি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তিনি যো পাইলেন। পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া, অসুস্থ পুত্রকে ফেলিয়া গেলে কি হইতে পারে না পারে, তাহারই একটা জীবন্ত চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার এত শ্রম, এত যত্ন, সকলই বৃথা হইল। "মোটরে-মধুপুরের" ভবীরা ইহাতেও ভুলিল না। সুধাংশুশেখর স্পষ্টতঃ কহিলেন, এত সাজ-গোজের পর যদি যাওয়া না হয় তবে তাঁহাকে নিঃসংশয়ে গঞ্জনা সহিতে হইবে। "সেজে গুজে রইলাম বসে, যাওয়া হল না—" এ ব্যঙ্গ-প্রবচন সহিবার মত সহিষ্ণুতা তাঁহার নাই; অথচ আমি না গেলে তিনিও যে যাইবেন না, ইহাও সুনিশ্চিত। ভোঁস সাহেবেরও সেই অবস্থা। তাঁহার বিশ্বাস, তিন মণ তিন সের দৈহিক ওজন সত্ত্বেও তিনি ছেলেমানুষ, মুরুব্বি-ছাড়া হইয়া তিনি পথে পা দিতে অ-প্রস্তুত।

শুভগ্রহ বলিতে হইবে আমার [illegible]

স্থগিত রাখিয়া আমাকে "ভ্রমণ-কাহিনী" লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিল।

রাত্রি তিনটায় আমার গৃহদ্বারে পরিচিত মোটরের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ছেলেরা অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাহাদের জননী জামা কাপড়গুলি নিঃশব্দে আগাইয়া দিলেন। বরাবর দেখিয়াছি, যখনই কোথায় গিয়াছি, বিদায়কালে কোন দিনই তিনি কথা কহা পছন্দ করেন না। আমিও সেটা সুলক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কারণ যাত্রাকালে কন্যাই হৌন (যদিও আমার সে-রত্নের অভাব আছে) আর কন্যার মাতাই হৌন, রৈবিক ছন্দে যদি কহিয়া বসেন, 'যেতে নাহি দিব'—অবস্থা গুরুতরই হইয়া দাঁড়ায়।

ভোঁস সাহেব সন্ধ্যা হইতে কম করিয়া বিশ পঁচিশবার বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সকলেই যে রকম Solomon the Slow—কুড়ে সলোমন-জাতীয় লোক, তাহাতে তাঁহাকে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া যাত্রার তদ্বির করিতে হইবে। ভোর রাত্রে শিশির-অফিসে ঢুকিয়া যেদৃশ্য দেখিলাম তাহা ভোঁস সাহেবেরই উপযুক্ত বটে। সচিত্র-শিশিরের সম্পাদকের সোফাখানিতে "বিশাল শাল্মলী তরুটি" পতিত, যেন সমূলে উৎপাটিত—জীবনের সাড়া একমাত্র নাসিকাগর্জন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ননি রাত্রে দুই তিনবার ভোঁস সাহেবের চৈতন্য উৎপাদনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, হতাশভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে আমি, ননি ও ড্রাইভার রাধাবিনোদ একসঙ্গে সোরগোল করিয়া ভোঁস সাহেবকে জাগাইয়া তুলিলাম। সন্ধ্যায় ভোঁস সাহেবের যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আমাদের জন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেই উদ্বেগ, সেই উৎকণ্ঠা-ই দেখিলাম বটে, তবে তাহা আমাদের জন্য নয়, তাঁহার নিজের জন্য। তিনি বলি-লেন, তাঁহার শরীরটি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে...ইত্যাদি। তাঁহার মত বিরাট পুরুষের অসুস্থতা যে নিশ্চিহ্নে ও নিরুপদ্রবে প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা আমরা জানিতাম, তাই সেদিকে মনোযোগ না দিয়া শিশির অফিসের দোর তালা-বন্ধ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকের দোকানের ত্রিতল-চৌতলে সুধাংশুশেখর সপরি-বারে অবস্থান করেন। মোটর অট্টালিকার নিম্নে আসিয়া বংশীধ্বনি করিতেই, কক্ষে-কক্ষে বাতি জ্বলিয়া উঠিল, পাখা ঘুরিতে লাগিল, এককথায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সুধাংশু-শেখর প্রস্তুত ছিলেন, অলিন্দে দর্শন দিয়া পাঁচমিনিট সময় চাহিলেন। এ-সময়ের এ ভিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়া আপত্তি করিবার ইচ্ছাও কাহার হইল না। পাঁচ মিনিট কাটিল, সুধাংশুবাবু গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই অলিন্দে অলিন্দে ছোট বড় অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রকটিত হইল।

আমরা এইবার সত্য-সত্যই "মধুপুর" যাত্রা করিলাম। সেদিন মহাষষ্ঠী, প্রভাত হইতে অল্পই বিলম্ব আছে, বাঙ্গলা ভরিয়া আগমনীর গান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, শারদ আকাশ অতি সুন্দর, সমীরণ ধীর, সুমিষ্ট, রাস্তা তখনও জন-শূন্য—আমাদের মোটরখানি দ্রুতবেগে হাওড়াভিমুখে ছুটিল, সকলেরই দৃষ্টি মণি-বন্ধবদ্ধ ঘটিকাগুলির উপর। সাড়ে চারিটায় হাওড়ার পুল খুলিবার কথা, তাহার পূর্ব্বে পার না হইলে ২টি ঘণ্টা এপারে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

ওপারে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলা গেল—৪-১৭ মিনিট!

পথে—প্রথম প্রভাত

গাড়ীখানি "ফোর্ড"; নম্বর ১১৪৫৯, স্বত্বাধিকারী "শিশির" স্বয়ং। তিনি তখন মধুপুরে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই আমন্ত্রণ দিয়া এবং তাঁহার অজর অমর মোটর খানিকে দিয়া আমাদের "মোটরে মধুপুর" যাত্রার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। দুই-দশদিন সেখানে থাকাও হইবে, সুতরাং পথে অত্যাবশ্যক এবং বিদেশে ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্তর আমাদের সঙ্গে নিতান্ত অল্প ছিল না। ভোঁস সাহেবের দেহের অনুরূপ তাঁহার একটি ব্যাগ, সুধাংশুবাবু সশরীরে বাহিত হইতে পারেন, তদ্রূপ তাঁহার একটি ব্যাগ—গাড়ীর দুইদিকে ঝুলাইয়া বাঁধা। ননি যদিও বারংবার আশ্বাস দিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে অল্প জামা-কাপড়, সে একটি ছোট্ট ব্যাগে ভরিয়া লইবে, কার্য্যকালে সে যে বস্তুটি বাহির করিল, দেখিয়াই আমাদের চক্ষুঃস্থির হইয়াছিল। আমাদের কাহারও ব্যাগে আমাদের জামা-কাপড়ের সঙ্গে তাহার "জামা-কাপড়" মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সে যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না,

কিন্তু তাহার ছোট্ট "পেগি" * ব্যাগটির আয়তন দেখিয়া কোথায় তাঁহাকে রক্ষা করা যায়, তাহা লইয়া দস্তরমত গবেষণা উপস্থিত হইয়াছিল। ননি আশ্বাস দিলেন, তিনি সেটিকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবেন। ক্রোড়ে ধারণ ও বহন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না জানিয়া আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। পা রাখিবার স্থান পেট্রোলের টিনে ভরিয়া গিয়াছে, তা ছাড়া ভোঁস-সাহেব চ্যাঙারী করিয়া ভীমনাগের দোকানের ভাল সন্দেশও কিছু লইয়াছেন, স্থান যে সঙ্কীর্ণ তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। ইহার মধ্যে জলের কুঁজাটি কোথায় রক্ষিত হইয়াছে সন্ধান করিতে গিয়া জানা গেল, কুঁজা আনা হয় নাই। প্রখর মেধা-সম্পন্ন ভোঁস সাহেবের উপর কুঁজা লইবার ভার ছিল, সুতরাং কুঁজার অদর্শনে বিরক্ত হইলেও আমরা বিস্মিত হই নাই।

গঙ্গার ধারে-ধারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলিয়াছে; রাস্তা অধিকাংশ স্থলেই বেশ ভাল নয়, এবড়ো-খেবড়ো, অসংস্কৃত। সেওড়া-ফুলির পর রাস্তাটা ভালই মিলিল, সেওড়াফুলিতে সূর্য্যোদয় হইল। বন্ধু-বান্ধবগণ বহুকাল পরে সূর্য্যোদয় দেখিয়া, উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উৎফুল্ল হইবারই কথা বটে। আমরা সহরবাসী, খাঁচার জীব, এমন মুক্ত-প্রান্তরে সূর্য্যোদয়-শোভা দেখিবার সৌভাগ্য পাই কবে! ৬টার সময় আমরা চন্দননগর পৌঁছিলাম। চন্দননগর ষ্ট্র্যাণ্ডে কয়েকটি বিদেশীয় হোটেল আছে, ইতিপূর্বে আমরা কয়েকবার সেখানে খাইয়া গিয়াছি,—সেইখানে গিয়া প্রাতঃকালীন চা পানের পরামর্শ করা গেল। ভোঁস-সাহেব চা-এর বড় ভক্ত নন্, কাজেই তিনি সময় অপব্যয়িত হইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু দলে আমরা ভারী, ভোটে ভোঁস হারিয়া গিয়া হোটেলে আসিয়া ক্ষতি-পূরণ করিলেন, কয়েক বাটী চা মাখন ও খান তিনেক রুটির দ্বারা।

আমরা গল্প-গুজবের সঙ্গে সঙ্গে চা-পান করিতেছি, মৈনাক-সদৃশ এক টঁ্যাস সাহেব আসিয়া সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিলেন। আমাদের ভোঁস-সাহেব তখনই আগন্তুককে চিনিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—সাহেব তুমি ত বেটি? সাহেবের মুখ-চোখ হঠাৎ শুকাইয়া উঠিল; তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন পৈতৃক নামটা অস্বীকার করিতেই চাহিতেছিল, নেহাৎ পিতৃ-পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষার্থই সেটা করিল না। বলিল, হাঁ। ভোঁস জিজ্ঞাসিলেন—তুমি ওবেসোথিন বাহির করিয়াছিলে না? সাহেব স্বীকার করিল, করিয়াছিল। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বোধ করি ওবেসোথিনের (Obesothin) নাম শুনিয়াছেন। বেটি (Bettie) নামে এক সাহেব এই মহৌষধটির প্রবর্ত্তক। মোটা লোককে রোগা করার পক্ষে এই বস্তুটি নাকি ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরীই বটে, অবশ্য-ফল-প্রদও নিশ্চয়, নতুবা স্বয়ং প্রবর্ত্তক এমন বিভীষণ-দেহ থাকিবেন কেন? Trial begins at home—সাহেব কি তাহা জানিত না? অবশ্যই জানিত; তবে সে ইহাও জানিত, তাহার মহৌষধ ঘরের জন্য প্রস্তুত নহে, কারণ ঘর পয়সা দিবে না, পয়সা দিবে, পর! হয় ত সেই জন্যই সে নিজে ব্যবহার করে নাই! সে যা হোক, ভোঁস ও বেটি—দুই স্থূলকায় বন্ধুর মধ্যে বচসা চলিতে লাগিল। ভোঁস সাহেব চা-আদির দাম দিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। সাহেব-বৎস, দাম না দিয়া যাইতে পারিবে না, বলিল। আবার উভয়েই সপ্তমে চড়িল। আমরা খাঁটী মাতৃভাষায় বোস্‌কে চন্দননগরের সুবিখ্যাত তুড়ুং ঠোকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই ভোঁস গুট্ গুট্ করিয়া দাম মিটাইয়া দিলেন। একথাও বলা আবশ্যক, রাগের মাথায় সাহেব দামটা বেশী করিয়া ধরিল এবং ভোঁসের অপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া, তাহা আদায়ও করিয়া লইল।

৬-৩৫ মিনিটে আমরা চন্দন-নগর ত্যাগ করিলাম। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল পথ ধরিয়া আমাদের মোটর হু হু শব্দে ছুটিতেছে। ব্যাণ্ডেলের পর রাস্তাও অপেক্ষাকৃত ভাল। মোটরের গতিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যেখানে দুই তিনটা রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, প্রায় সর্বত্রই কোন্‌টি কোন্ দিকের রাস্তা কাষ্ঠ-ফলকে তাহা খোদিত আছে। পথিকের যে ইহাতে কত সুবিধা হয় তাহা বলিবার নয়। ব্যাণ্ডেলের বহু পুরাতন পর্ত্তুগীজ গীর্জাটি দক্ষিণে পড়িয়া রহিল। আমরা যে সহর ফেলিয়া বাঙ্গালার পল্লীর ভিতর দিয়া চলিয়াছি, তাহা যে-দিকে চাহি বুঝিতে পারি। কোথাও ঘন বন, কোথাও দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও খাল, নদী, বিল, জলা। রাখাল গরু লইয়া মাঠের পথে

* যাহা মেম অথবা মেমভাবাপন্না মেয়েরা হাতে ঝুলাইয়া বেড়ান, তাহাকেই পেগি ব্যাগ বলে।—লেখক।

চলিয়াছে; গ্রাম্য নরনারী বেসাতী ভরিয়া লইয়া বাজারের পথে হাঁটিতেছে, গরু-মেষ-কুকুর মোটরের শব্দে ছুটিয়া তাল ঠুকিতে আসিতেছে, আবার তখনি পুচ্ছ উচ্চ করিয়া পৃষ্ঠদেশ-দেখহ করিতেছে! ধানের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও ভাল। তখনও শীষ বাহির হয় নাই, সবুজ গাছগুলি মাঠের আইল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, ধানের উপর বাতাসের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে—দৃশ্যে কবি কেন—অকবির বুকও ভরিয়া উঠে।

বাঙ্গালায় একটা কথা চলিত আছে, বরে-বরে নাকি লেখা হইতে নাই; সত্য-মিথ্যা জানি না, কথাটা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এখন দেখিলাম, দূর-পথে মোটরে-মোটরে দেখা হইতে নাই, হইলে বিপদ ঘটে। ৮-১৫ মিনিটের সময় ৫০—৫৫ মাইলের ভিতর ৮৫৩৬ নং গাড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। আর দুইটা মিনিট না কাটিতেই দুম্ ফটাস্, টিউব ফাটিল। ভোঁস-সাহেবের আবার এই-খানেই তৃষ্ণার উদ্রেক। তাঁহার স্মরণ-শক্তির গুণেই কুঁজা আসে নাই, তাঁহারই জন্য তৃষ্ণা, আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ধান-ক্ষেত্রের দিকে টানিয়া লইয়া ধেনো জল (?) খাইবার পরামর্শ দিলাম। রাধাবিনোদ জ্যাকে তুলিয়া টায়ার খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল, রাস্তায় নিক্ষিপ্ত একটি পেরেক ফুটিয়া টিউবটিকে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে। টায়ার বদলাইয়া ৮-৪১ মিনিটে আবার গাড়ী চালান গেল। ৯টায় মেমারি ত্যাগ করিয়া—আমরা বর্দ্ধমানের সীমায় পৌঁছিলাম, বেলা ৯-৫০ মিনিটে।

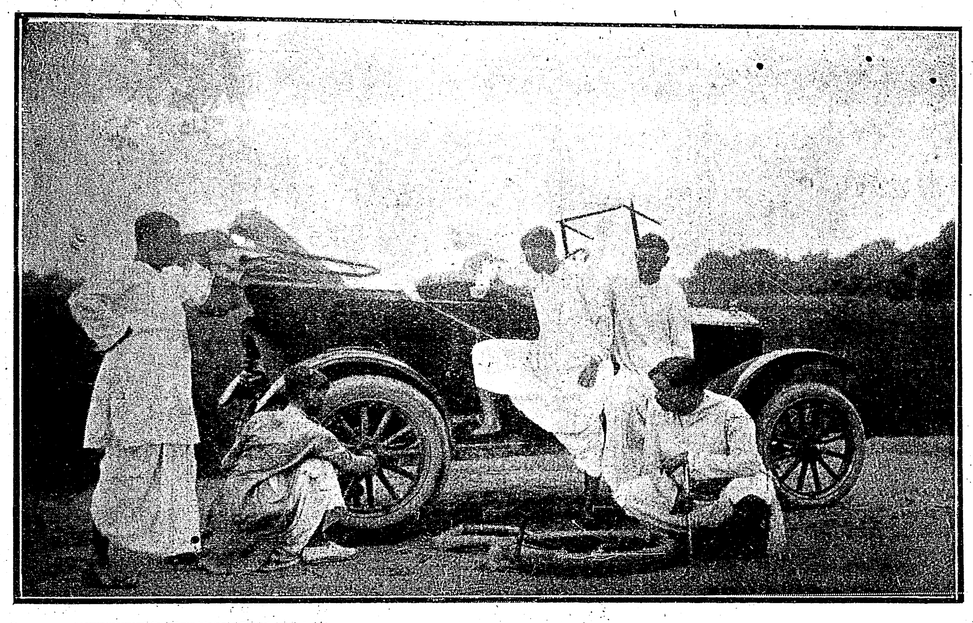

প্রথমবার টায়ার বদলান হইল।

ভোঁস-সাহেবের মামা-শ্বশুর বাড়ীতে আমরা আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিব, বন্দোবস্ত এইরূপ ছিল। বর্দ্ধমান-সীমান্তে পৌঁছিবার বহু পূর্বে ভোঁস-সাহেবের নিকট তাঁহার মামা-শ্বশুরের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করা গেল। ভোঁস-সাহেব মামাশ্বশুরের নাম বিস্মৃত, ধামও তথৈবচ কহিলেন; তবে তাঁহার যে মামা-শ্বশুর কলিকাতায় থাকেন, তাঁহার নাম তিনি জানেন, বলিলেন, হংসেশ্বর দত্ত। হংসেশ্বর বাবুর ভ্রাতা বর্দ্ধমানে থাকেন। অনুমানে হংসেশ্বরের ভ্রাতার যে যে নাম হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কংসেশ্বর, বংশেশ্বর, লঙ্কেশ্বর আরও অনেক 'শ্বর' আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু ভোঁস-সাহেব কোনটিই অনুমোদন করিলেন না। আমি তাঁহার মামা-শ্বশুর কি করেন জানিতে চাহিলে, বলিলেন—তিনি রাজ-বাড়ীর দাওয়ান, কোষাধ্যক্ষ বা ঐরূপ একটা কিছু।

অনেকদিন আগে একবার রাজ-বাড়ীতে আতিথ্য

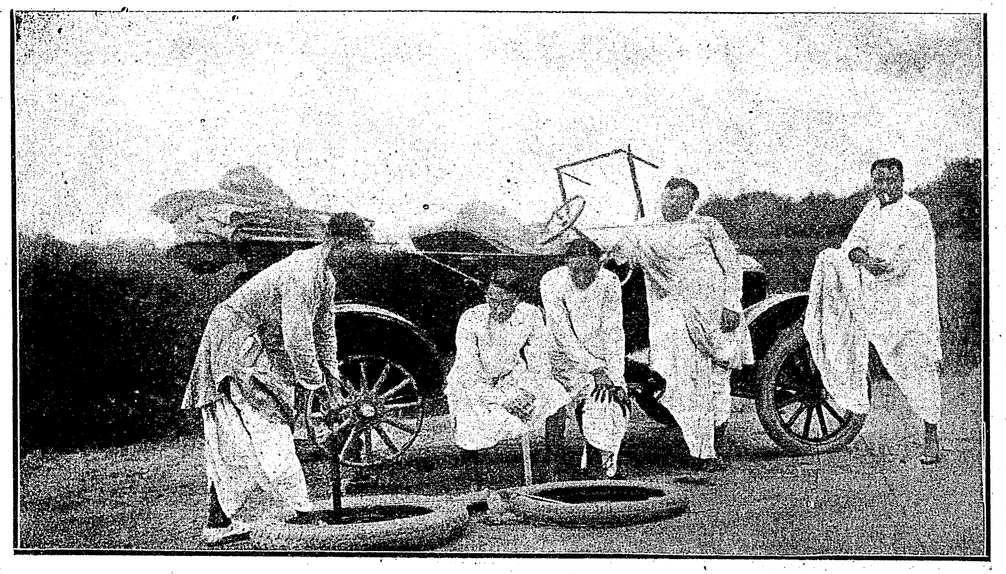

গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই সময় রায় বাহাদুর জলধর দাদা রাজসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন 'শ্রীপতি দত্তের' কথা আমার বেশ মনে ছিল। ভোঁস যখন 'শ্বরে' আবদ্ধ, আমি শ্রীপতি বাবুর নাম করিলাম; 'হোই হোই' (ঐ-ঐ) উল্লাসে ভোঁস-সাহেব প্রায় নৃত্য করিয়া উঠিলেন। শ্রীপতি বাবুদের বাড়ী খোস্-বাগানে। ৯-৫৫ মিনিটের সময় শ্রীপতিবাবুদের ফটকে গাড়ী ঢুকিল। শ্রীপতিবাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ভোঁসের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া ছিল। শ্রীপতি বাবুরা বনিয়াদী গৃহস্থ। আদর-আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটীও করিলেন না। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় করিয়া আমরা ১-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জের বাজারে পেট্রোল খরিদ করিতে যাওয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি দোকানে পেট্রোল ছিল, দাম চাহিল ৩৷৷০ টাকা। পূর্ব রাত্রে আমরা কলিকাতায় ১২ টিন পেট্রোল ২৸৵০ দরে খরিদ করিয়াছি, এক টিন মাত্র পেট্রোল কিনিয়া গাড়ীতে ঢালিয়া লওয়া গেল। এই খানেই একটা কুঁজা কিনিয়া জল ভরিয়া লইলাম। ২-২৫ মিনিটে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের পার্শ্বের রাস্তা ধরিয়া আসানসোল অভিমুখে ছুটিল। গলশীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ৩-১০ মিনিটের সময়, গাড়ীর পশ্চাদ্দিকের যে টায়ারের টিউবটি আজই সকালে একবার ফাটিয়াছিল, সেইটিই আবার ফাটিল। তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে রৌদ্র, অল্পদূরে একটা শ্মশান ধূ-ধূ করিতেছে; তাহারই ওধারে একটি পুষ্করিণী। কি আর করা যায়—রৌদ্রেই রাস্তার ধারে বসিয়া পড়া গেল, সুধাংশুশেখর কল-কব্জা খাটাইয়া ছবি তুলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একই দিকের একটি টায়ারের টিউব দুইবার ফাটিতে দেখিয়া আমরা কিছু বিস্মিত, কিছু চিন্তিত হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে কারণও আবিষ্কার করিয়া ফেলা গেল। আমাদের স্থূলদেহ শ্রীমান্ ভোঁস সেই দিকেই এতাবৎ বসিয়া আসিতেছিলেন। আমরা সদলে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, তাঁহাকে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভোঁস প্রথমটা খুবই আপত্তি করিলেন, কিন্তু চালক রাধাবিনোদ যখন, ইহাই সমীচীন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তখন অগত্যা ননিকে আমার ও সুধাংশুর মাঝখানে পাঠাইয়া, তিনি ননির পেগ্লি ব্যাগটি কোলে লইয়া ড্রাইভারের পার্শ্বেই উপবিষ্ট হইলেন, এবং স্থান-পরিবর্ত্তন-জনিত পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ ভীমনাগের

—আবার টিউব ফাটিল—

ভাল সন্দেশের ঝুড়িটা একাই প্রায় উজাড় করিলেন; কুঁজায় জল ছিল, রুদ্ধপ্রায় বদ্ধগলার উপর কুঁজা কাৎ করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

একটা টায়ার পরাইয়া আর একটা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া আমরা ৩·৪২ মিনিটে আবার গাড়ী চালাইলাম। মানকরের পর হইতে যে রাস্তায় (G. T.) গাড়ী চলিল, তাহা আমাদের সহরের উত্তরাঞ্চলের সর্বপ্রধান রাজপথ সেণ্ট্রাল এভেনিউকেও হার মানায়। ৪·২৭ মিনিটের সময় ১০০ মাইল খোদিত প্রস্তর-ফলকটি দক্ষিণে পড়িয়া রহিল। 'কর্ণার্জ্জুনের' শততম অভিনয়োৎসবের অনুকরণে যেন মনে হইতেছে, আমরাও একটা

১০০ মাইল উৎসব এইখানেই সম্পন্ন হইয়াছিল

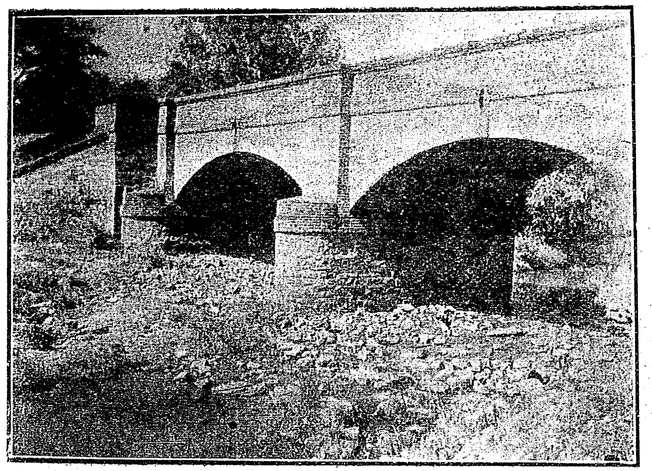

কিছু উৎসব গোছের—এইখানে করিয়াছিলাম! উৎসবটা সম্ভবতঃ ভোজন-সংক্রান্ত! এইখানেই একটা ছোট সেতু ছিল, নিচে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী! সুধাংশুশেখর তাহার একটি ছবি তুলিলেন।

১২২ মাইলের পর অণ্ডাল ষ্টেশন রোড পাওয়া গেল। অটোমোবাইল এসোসিয়েশন চার টাকার বিনিময়ে আমাদের যে পথ-বিবরণ দিয়াছিল, তদনুযায়ী চলিতে হইলে অণ্ডালে অন্য রাস্তা ধরিতে হয়। কিন্তু আমরা আসানসোল যাওয়াই স্থির করিলাম, গাড়ী সোজা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ধরিয়া ছুটিতে লাগিল। আমাদের চা-তৃষা [illegible] রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়া চা খাওয়া যাইবে স্থির করিলাম। রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ছাড়িয়া অন্য একটি রাস্তা ধরিতে হয়। সেই রাস্তায় মাইল আড়াই চলিয়া ষ্টেশনে ৬·২৫ মিনিটে পৌঁছান গেল। মধ্যে মিনিট দশেক বাজারে থামিয়া দুই টিন পেট্রোল ৩৷৵০ দরে কিনিয়া গাড়ীতে ঢালিয়া লওয়া হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে ৯টিন পেট্রোল ছিল, তাহা আমরা পথে খরচ করিতে রাজী ছিলাম না, কি জানি, মধুপুরে যদি পেট্রোল না পাওয়া যায়।

এইখানেই সন্ধ্যা হইল,—আমাদের গাড়ীর ইলেক্ট্রিক বাতীর যথেষ্ট জোর নয় বলিয়া আমরা একটি গ্যাসালোক কিনিয়া গাড়ীর সামনে বসাইয়া লইয়াছিলাম,—কার্য্যকালে সেটির দ্বারা ততখানি কার্য্য আমরা পাইলাম না, যতখানি নিশ্চিত পাইব বলিয়া বিক্রেতা দোকানদার আমাদের আশা ভরসা দিয়াছিলেন। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। পথও তাই! গাড়ী জোর চালাইতে আর ভরসা হইল না, সামান্য মাইল দুই পথ চলিতেই অনেকখানি সময় লাগিয়া গেল। রাণীগঞ্জের নাম-ডাক যে কারণেই হৌক, খুব। নাম-ডাকের অনুযায়ী ষ্টেশন হইবে আমরা এইরূপ আশাই করিয়াছিলাম। ট্রেণে যাতায়াত বহুবার করিলেও রাণীগঞ্জ ষ্টেশন দেখিবার সৌভাগ্য কোনদিন হয় নাই; আজ নিতান্ত চা তৃষ্ণাতুর হওয়ায় সুবিখ্যাত রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। আরে! ছিঃ পর্বত মূষিক প্রসব করিল হে। একটা অন্ধকার ষ্টেশন, না আছে আলো, না আছে লোকসমাগম। বাহিরে এ্যাসিটেলিন গ্যাস জ্বালাইয়া একটা লোক চা-পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে, ক্রেতার অত্যন্ত অসদ্ভাব; তাহার কাছে চা খাইবার প্রবৃত্তি আমাদের হইল না, আমরা ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া চায়ের দোকানের সন্ধান করিতেছি, রেলের আলো হাতে এক সাহেব পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকেই 'কেলনারের' কথা জিজ্ঞাসা করা গেল। সেখানে কেলনার নাই, একজন মুসলমান চা'এর দোকান চালায়, সাহেব

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। চা ভাল, ইহাও তাহার কাছে শুনিলাম। সত্যই ভাল চা। 'কেলনার' মার্কা বয়, এ চা সার্ভ (serve) করিলে অন্ততঃ চারি আনা পয়সা পেয়ালাপিছু আদায় করিয়া ছাড়িত। ইহার মার্কাও নাই, লেজও নাই, লেজুড়ও নাই, এক আনা হিসাবে পেয়ালার দাম লইয়াই সে সন্তুষ্ট।

রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে যতটা পথ আমরা উজান গিয়াছিলাম, সেইটুকু ফিরিয়া আসিতেই জ্যোৎস্না উঠিল। জ্যোৎস্না-রাতে মাঠের, নদ-নদীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইব ভাবিয়া যতটা উৎফুল্ল হইয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহার সিকির সিকি ভাগ আমোদও পাওয়া গেল না। মোটর-চালক শ্রীমান্ রাধাবিনোদ বোধ হয় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন-কালের মধ্যে পর্বত দর্শন করেন নাই, জ্যোৎস্না-ঘেরা পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া মেঘোদয়ে তাঁহার মনরূপ শিখীটি নর্ত্তন জুড়িয়া দিল; হস্ত পদও বোধ হয় কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িল—হঠাৎ গাড়ী পথ ছাড়িয়া বেপথে পড়িয়া একটা শাল গাছে ধাক্কা খাইবার উপক্রম করিল। আমি কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম, বন্ধুবর সুধাংশুশেখর বরাবর একটু Over-Cautious—অধিক মাত্রায় সাবধানী; তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। পর্বত-স্বপ্ন-মগ্ন রাধাবিনোদের নিদ্রা ভাঙ্গিল, গাড়ী আবার পথে উঠিল। শ্রীমান্ ভোঁস ভীষণ গর্জন করিলেন, পর্বতগাত্রে লাগিয়া 'সে ধ্বনি মুরছি, পড়িল অবনী' পর!' ননি তর্জন করিলেন, তাঁহার মৃদুকণ্ঠের শব্দ মাত্র উঠিল ও পড়িল, কি বলিলেন—কিছু বুঝা গেল না। তবে এটা বেশ বুঝিলাম, তিনি খুব সন্ত্রস্ত হইয়া সুধাংশুশেখরের পার্শ্বে আড়ষ্টভাবে সামনে চক্ষু রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্না রাতের মায়া আমাদের কাছে বিভীষিকা হইয়া উঠিল। অতঃপর রাধাবিনোদ যাহাতে পাহাড় না দেখে, তাহা দেখিবার জন্য ভোঁস সুতীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করিলেন।

একখানা মোটর খুব জোর আলো ফেলিয়া সেই পথেই যাইতেছিল; আমরা তাহার পিছু লইলাম। ভাবিয়াছিলাম অচিন-পথে তাহার আলোর সাহায্যে আমরা নির্বিঘ্নে এইটুকু পথ অতিক্রম করিতে পারিব। হঠাৎ গাড়ীখানা ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে থামিয়া পড়িয়া আমাদের জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিল। আমরাও গাড়ীখানা পিছনে পিছনে আসিলে উহার আলোর সম্পূর্ণ 'সুযোগ' পাইবার আশায় অগ্রগামী হইলাম। কিন্তু যে কারণই হৌক, সাহেব আমাদের সুবিধা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে দিল না, পিছন হইতে ক্রমাগত হর্ণ দিতে লাগিল, আমরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম। সাহেব পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—তোমাদের কি আলো খারাপ হইল? এই শ্বেত জাতির বাহ্যিক শিষ্টাচার ও ভদ্রতার উপর আমার-অন্ততঃ অনেকখানি আস্থা ছিল, সেই ভরসাতেই আমি হাঁ বলিতেছিলাম, কিন্তু নিমিষেই ভরসা চূর্ণ হইয়া গেল। সস্ত্রীক (?) সাহেব একরাশ ধোঁয়া ও ধূলা ছাড়িয়া আমাদের অন্ধ ও বধির করিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটাইয়া পলায়ন করিল। কোন বাঙ্গালী যদি পথের মাঝে কোন বিপন্নকে দেখিত, যতবড় হৃদয়হীন পাষণ্ড সে হৌক, এমন অভদ্র ইতর ভাবে কখনই পালাইতে পারিত না, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। ইহারা নাকি চরম সভ্য বলিয়া বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাই ইহারা এ কার্য্য করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করিল না। যা' হৌক, ধুঁয়া ও ধূলা মিনিট পাঁচেক পরেই পরিষ্কার হইয়া গেল, আমরা আবার গাড়ী চালাইয়া দিলাম। আমাদের হাত-ঘড়িতে তখন আট-টা—দূরে আলোকোজ্জ্বল আসানসোল দেখিতে পাওয়া গেল; রাত্রের মত বিশ্রাম করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া মনটা অনেকখানি সুস্থ হইল। ৮'৫ মিনিটের সময় আমরা আসানসোলে পৌঁছিলাম। সেখানকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করার ঠিক ছিল। তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না।

চা পানাদির পর আমারা পাঁচুবাবুর কাছে মধুপুরের রাস্তার কথা পাড়িলাম। পাঁচুবাবু সাফ জবাব দিলেন, ভীষণ এক নদী অন্তরায়, কারমাটারের পরে মোটর যাইবার আর পথ নাই। তাঁহার কথায় আমরা যে মনোভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। সারা পথ দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়াছি, এখন খেয়াঘাটে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে প্রাণ কি চায়? পাঁচু বাবু একজন বাঙ্গালী মোটর চালককে ডাকাইয়া আনাইলেন। লোকটা আমাদের প্রস্তাব শুনিয়াই যে ভাবে জিহ্বা কর্ত্তন করিল, তাহাতে 'মরমে মরা' ছাড়া আর উপায় রহিল না। সে বলিল মাত্র একদিন

পূর্বে সে মধুপুর-যাত্রী এক পরিবারের ভাড়া পাইয়াছিল। তাঁহারা কেবলমাত্র যাওয়ার ভাড়াই ৮০৲ দিতে রাজী ছিলেন, সে লয় নাই। ব্যাপার যে গুরুতর তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব রহিল না। আমরা মধুপুর যাওয়ার আশা ত্যাগ তন্মুহূর্ত্তেই করিলাম। কিন্তু কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়? কেহ বলিলেন, দিল্লী, কেহ লক্ষ্ণৌ, কেহ পেশোয়ার—মুখে মুখে অনেকদূর বেড়াইয়া ফেলিলেন। আমাকেও ত কিছু বলিতে হয়, আমি বলিলাম, কাশী। কাশীতে পূজা দেখিব, বিজয়া দেখিব; বন্ধুগণ সোল্লাসে আমার প্রস্তাবই অনুমোদন করিলেন। পেট্রোল যাহা আছে, তাহাতে কাশী পৌঁছান যাইবে, গাড়ীর রসদের জন্য ভাবনা নাই; আমাদের রসদের জন্যও তত ভাবি না, পথে কিছু-না কিছু মিলিবেই। সুধাংশুবাবু অল্পাহারী, ননি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কিছু অসুস্থ ছিলেন। গা বমি-বমি ও শরীর ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে বলিয়া আহারাদি পথে নাম মাত্রই করিয়াছিলেন। আসানসোলে পাঁচু বাবুর গৃহে হঠাৎ ব্যাধিমুক্ত হইয়া সুস্থতা লাভ করিলেন এবং বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে লইয়া আমাদের যে একটুকু দুর্ভাবনা ছিল, তাহা সাফ হইয়া গেল। তিনিও বাঁচিলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি আমাদিগকে একটু অতি মাত্রায় নিশ্চিন্ত করিতে সেইদিন হইতে আহারের মাত্রাও অতি করিয়া ফেলিলেন; (অতঃপর আর তাঁহাকে অল্পাহারী বলা চলে না।) আমি মধ্যম গোছের—অর্থাৎ খুব বেশীও পারি না; কমও না! ভয় এবং ভাবনা, ভোঁসকে লইয়া। তাঁহার জন্য কিছু রসদ সেইখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইবে ঠিক করিয়া আমরা কাশীর পথের সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ওঃ হরিঃ! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! আমাদের বরাতে বরাকর ব্রিজ ভাঙ্গা, রাস্তা নাই। বাবা বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কাশীর বাসনাও ত্যাগ করিতে হইল। বহু গবেষণা করিয়াও যখন স্থির কিছু হইল না, তখন নিদ্রা যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। যতক্ষণ ঘুম না আসিল, কাশী, দিল্লী, কাশ্মীর, পেশোয়ারের জাগ্রত মধুর স্বপ্নগুলি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিবস

প্রভাতে স্বপ্ন-কথাই মনে রহিল মাত্র, সে উত্তেজনা আর নাই। তখন সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে মোটর রেলে তুলিয়া দিয়া মধুপুর যাওয়াই শ্রেয়। মোটর বুক (book) করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টেশনে যাওয়া গেল; কোন সুবিধা হইল না, রেলের চাকর, সহজে ও বিনাপয়সায় আমল দিতে চায় না। আমরা তাহাদের ছাড়িয়া কর্ত্তাদের শরণাপন্ন হইলাম। আসানসোল ডিষ্ট্রিক্টের বড় কর্ত্তা (District traffic Superintendent)র বাঙ্‌লোয় গিয়া হাজির। সাহেব বাঙ্‌লোর বাগান পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, হাসিমুখেই আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা প্রার্থনা জানাইলাম, আমরা কলিকাতা হইতে সোজা মোটরে আসিতেছি, কারমাটার পর্য্যন্ত মোটরে যাইয়া যাহাতে কারমাটারে একখানি ট্রাক্ পাই ও গাড়ীখানি সন্ধ্যার পরেই কোন যাত্রী-গাড়ীতে মধুপুর পৌঁছিয়া যায়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। সে সময় পূজার ভিড়, ট্রাক্ মিলিতে পাঁচ সাতদিন দেরী হইতেছে, ইহা আমরা ষ্টেশনে শুনিয়া ও কাগজে কলমে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলাম। ডি, টি, এস্, ইউল্ সাহেব (Mr. Yule) আমাদের ইংরাজী শিশিরের গ্রাহক ও পাঠক, আমাদের পরিচয় পাইয়া প্রীতই হইলেন এবং আমাদের জন্য কি করিতে পারেন তাহাই দেখিবার জন্য টেলিফোঁর কল তুলিয়া লইলেন। দুই তিন স্থানে টেলিফোঁ করিয়া সাহেব বলিলেন—হইয়াছে, আজ ৩টার গাড়ীতে একখানি ট্রাক্ কারমাটারে আপনাদের জন্য পাঠাবার হুকুম দিয়াছি, কারমাটারের ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানি চিঠিও দিতেছি, তিনি আপনাদের প্রয়োজন মত সমস্ত সাহায্যই করিবেন। ইউল সাহেব তখনি কয়েক ছত্র লিখিয়া আমাদের হাতে দিলেন; আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মোটরে উঠিলাম।

আহারাদি করিয়া আমরা ১২·৪৩ মিনিটে আসানসোল ত্যাগ করিলাম;—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়াই গাড়ী ছুটিতেছে, ছুটিতে ছুটিতে বরাকর ব্রিজের মুখে গাড়ী থামিয়া পড়িল। ব্রিজ ভাঙ্গা—গাড়ী ঘুরাইয়া লওয়া গেল। একদিকে কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের কল, অন্যদিকে ক্ষীণকায়া এক নদী, মধ্যের পার্বত্য-পথ দিয়া আমাদের গাড়ী অন্যূন ২০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। কয়লার খাদের কলের দুই চারিটি চিমনি ও তদুত্থিত ধুঁয়াও দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে। ঘণ্টা দেড়েকের পর আমরা যে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের সুগঠিত কৃষ্ণ দেহ, তাহাদের শিশুসম সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সাঁওতাল পুরুষদের অধিকাংশই দেখিলাম, বড় অলস—ঘরের বাহিরে খাটিয়া ফেলিয়া যুবকেরা স্তিমিতনেত্রে ঝিমাইতেছে, আর তাহাদেরই মেয়েরা দুপুর রৌদ্রে মাঠে গরু চরাইতেছে, কাঠ ভাঙ্গিতেছে, শস্যক্ষেত্র আগলাইতেছে, বাজারে পণ্য লইয়া চলিয়াছে। মেয়েরা এত পরিশ্রমী বলিয়াই তাহাদের শরীর দৃঢ়, সবল ; পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কৃশ। সাঁওতাল-ভামিনীদের দেহ-গঠন দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরা হিংসা না করিয়া পারিবেন না। ২·১৩ মিনিটে আমরা রূপনারায়ণপুর ষ্টেশনের পার্শ্বে এক মহুয়া-বাগানের ছায়ায় গাড়ী থামাইলাম। সঙ্গে আহার্য্য কিছু ছিল না, অথচ আমাদের মিঃ ভোঁসের উদর-দেবতা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, সন্তুষ্ট না করিলেই নয়। চারিদিকে খুঁজিয়া নিকটে গোটাকতক হরিতকী ও বয়ড়া গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"—আমরা মিঃ ভোঁসকে গোটা কতক অপক্ক হরিতকী ভোজন করিবার সুপরামর্শ দিলাম।

দশ মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল ;—আড়াইটায় আমরা মিহিজাম পার হইলাম। গন্তব্যস্থান কাছে আসিতেছে—ইহাতে আনন্দই হইবার কথা, তা না হইয়া আমাদের সকলেরই মনে একটা নিরানন্দের ভাব জাগিয়া উঠিল। সেটা বোধ হয় 'ভ্রমণ'টা স্বেচ্ছাসম্পন্ন হইবে না, এই ভাবনাতেই। আমাদের মনের গতির সঙ্গে মোটরের গতির কোন সম্পর্ক ছিল না, সে নিজ বেগেই ছুটিয়া চলিল এবং ৩টা ৯ মিনিটের সময় জামতাড়ায় আনিয়া হাজির করিল।

আমাদের সুধাংশুশেখরের চা'এর সময় তিনটা। সময়ে চা না পাইলে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। একে ত ১ মণ ৯ সেরের শরীর, তায় আবার শিরঃপীড়া, সে ব্যাপারটা যে কি ভীষণ হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিতেও শঙ্কা হয়। আমরা বন্ধুবরকে শান্ত করিতে চা'এর সন্ধানে গাড়ী থামাইলাম। কিন্তু চা ?—কোথায় চা ? ষ্টেশনের চেহারা দেখিয়াই চা-সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। সামনে কোন বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিলেও না-হয় 'অপরিচিত অতিথি' হইয়া চা সংগ্রহ করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালীও দৃষ্টি-চক্রের মধ্যে পড়িল না। চা খুঁজিতে গিয়া দেবী-দর্শন মিলিয়া গেল। আজ সপ্তমী পূজা, হিন্দু বাঙ্গালীর কাছে মহামহোৎসব। বঙ্গের বাহিরে এই সুদূর সাঁওতাল পরগণার মধ্যে যে আমরা জগজ্জননী মা'কে দেখিতে পাইব সে আশা করি নাই! একস্থান হইতে কাঁসির শব্দ আসিতেছিল, কাছে গিয়া দেখি, আটচালা আলো করিয়া মা-আমার বিরাজ করিতেছেন। শুনা গেল, বাজারের দোকানদারগণ চাঁদা করিয়া বারোয়ারি পূজা করিতেছে, ফি-বছরই করিয়া থাকে। পূজার সময়, আমরা দার্জিলিঙ্গে গিয়াও মা'কে দেখিয়াছি। সুদূর মীরাটেও মা'কে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। বাঙ্গালী যেখানে থাকে, বৎসরান্তে তিনদিন মা'র পূজা করিয়া থাকে। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর পক্ষে ইহা সুলক্ষণ বলিয়াই আমি মনে করি। হয় ত তবে ধ্বংসের বিলম্ব আছে।

এক ময়রার দোকানে গিয়া চা-এর আব্দার ধরা গেল ; তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান ও চার্ত্তকে চা-দানের তুল্য পুণ্য যে শাস্ত্রে লিখিত নাই, তাহা বুঝাইয়া দিতে সে ঘটি করিয়া জল চড়াইয়া দিল ; চা-চিনি-দুধ সংগ্রহ করিল ; বাড়ী হইতে একটি পেয়ালা-পিরিচ আনিল। অধিক মাত্রায় পুণ্যলাভাশায় চা'য়ে দুধ চিনির মাত্রাটা খুব বাড়াইয়া দিল, আমরা সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলাম। ৩টা ৩৭ মিনিটে মোটর ছাড়া হইল। এইখান হইতে কিছু খারাপ রাস্তার নমুনা পাওয়া গেল ; তবে তাহাতে 'শঙ্কিত নহে মোদের হৃদয়'। ৪·২৩ মিনিটে কারমাটার ষ্টেশনের ফটকে গাড়ী থামিল। মোটর থামিলে এ-সব দেশে রথ-দোল পড়িয়া যায়। রাস্তাতেও বরাবর দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি, মোটরের শব্দে বধূ জলের কলস ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সংসার ফেলিয়া আসিয়াছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ত কথাই নাই। কারমাটারে গাড়ী থামিতেই গঙ্গপালের মত লোক আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা ঘড়ি দেখিলাম, যে গাড়ীর সঙ্গে আমাদের ট্রাক্ আসিবার কথা, তাহার আসিবার তখনও অনেক দেরী। অথচ [illegible]

মত মোটর-বিহারীদের রেলগাড়ীর আশ্রয় লইতে হইতেছে সেই নদীটি দেখিবার লোভও বড় অল্প ছিল না। সেই রথ-যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, নদী এখান হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। মোটরে ছয় মাইল—সে ত কিছুই নয়, অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ও লাগিবার কথা নহে ; ট্রাকও এখন পর্য্যন্ত আসে নাই, সন্ধ্যা হইতেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব রহিয়াছে—নদীটী দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা অল্প-বিস্তর সকলেরই মনে জাগিল। কিন্তু বিদ্বজ্জন বলিয়াছেন, মনে আসিলেই কথা প্রকাশ করিবে না, সকলেই মনের কথা মনেই রক্ষা করিলেন, কেবল ভোঁস অত বিধিনিয়মের ধার ধারেন না, মুখ ফুটিয়া তিনিই বলিয়া ফেলিলেন—নদীটা দেখিয়া আসা যাক্। মৌনং সম্মতি লক্ষণং—যদিও এ কথা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু আমাদের মৌনাবস্থাও মিঃ ভোঁসকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল,—তিনি চালককে গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিয়দ্দূর পথ বেশ স্ফূর্ত্তিতেই যাওয়া গেল ;—তারপর ?

তারপর 'আগে কে জানিত বল, এতবিষ প্রেমে ছিল ?'—প্রাণ যায় রে লক্ষ্মণ ! পথ ত নাই-ই, উপরন্তু যে পথ তৈরী করিয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাও এমন ভীষণ, যে তাহার ঝাঁকানিতে ৬ ঘণ্টা আগের খাওয়া ভাতও পেটের মধ্যে চাল হইতে লাগিয়া গিয়াছিল (অবশ্য চাল হইতে আমরা দেখি নাই, তবে সকলের মুখেই এই একই কথা শুনিয়া প্রত্যয় জন্মিয়াছে)। এক একটা ঝাকুনি লাগে, আর কাণ মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে। ছোট-ছোট নালাগুলা তঁ মোটর পার হইয়া গেল—ঘণ্টা খানেক এই ভাবে চলার পর—"নদী, নদী," শব্দ উঠিল। শব্দটা অবশ্য আমাদের গাড়ী হইতেই উঠিয়াছিল, তাহার কারণও ছিল—সে নদীটা দেখিয়া বাস্তবিক আমাদের আনন্দই হইয়াছিল। ঐটুকু নদী পার হইতে এমন কি কষ্ট! হাট বাজার করিয়া এক সাঁওতাল দম্পতী সেই পথে গৃহে ফিরিতে-ছিল, পুরুষটিকে আমরা আহ্বান দিলাম। বাঙ্গালী [illegible] এই সাঁওতাল যুবতীও স্বামীকে কাছ ছাড়া করিতে প্রস্তুত ছিল না, তবে আমরাও ছিলাম নাছোড়-বান্দা—তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিলাম। সেই লোকটা আমাদের অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করিয়া কতকগুলা কি ইণ্ডিল বাণ্ডিল বকিল। বালির চড়া ভেদ করিয়া গাড়ী জলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না, লোকাভাবে আমাদিগকেই গাড়ী ঠেলিতে হইল। সুধাংশু-শেখর ষ্টিয়ারিংএ বসিলেন, রাধাবিনোদ ও আমরা দুই জনে, গাড়ী ঠেলিয়া জলে ফেলিলাম ; গাড়ী জল অতিক্রম করিয়া পাড়ে উঠিবার সময় ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেল। রাধাবিনোদ ষ্টার্ট দেয়, ষ্টার্ট আর হয় না ; সাধারণতঃ অর্দ্ধ প্যাঁচ দিতেই এঞ্জিন চলিতে থাকে, পাঁচসাত দশ প্যাঁচ হইয়া গেল, ইঞ্জিন অচল। আনন্দ মাথায় এবং চক্ষু কপালে

কিঞ্চিৎ সুখানুভূতি

উত্থিত হইল। মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়িল গিয়া শ্রীমান ভোঁসের উপর! তাহারই প্রস্তাবানুযায়ী এই নদী দর্শনে আসা হইয়াছে, তাহারই দুর্বুদ্ধির ফলে আমাদের এই দুর্গতি! সুধাংশুশেখর ভোঁসকে রীতিমত তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। ভোঁস সাহেবের প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা! কি আহার, কি তিরস্কার, কি গালা-গাল, তিনি নির্বিকারে ও নিরুপদ্রবে অনেক খানিই সহিতে পারেন।

রাধাবিনোদ ইঞ্জিন চালাইবার অন্য সর্ববিধ উপায় নিঃশেষ করিয়া পেট্রোল-ট্যাঙ্কে মন দিলেন ; পেট্রোল—বোধ হয় বিশ পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে একটিন ঢালা হইয়াছিল ; কাজেই তৈলাভাবে যে ইঞ্জিন অচল হইয়াছে,

ইহা সম্ভব হইতেই পারে না; কিন্তু ট্যাঙ্ক খুলিতে দেখা গেল, তৈল থাকিলেও তাহা কারবুরেটারে পৌঁছিতেছিল না। কারণ গাড়ীর পিছন দিক জলে বালুর মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সামনের দিকটা ছিল উচ্চে। আবার এক টিন তৈল ঢালা হইল। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৫-২০ হাতের বেশী হইবে না, জলও গোড়ালীর বেশী নয়—কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদীটুকুই পার হইতে ১০ মিনিটের অধিক সময় লাগিয়া গেল। এ পারে আসিয়া ধীরে সুস্থে গাড়ীর কলকব্জা পরীক্ষা করা গেল।

নদী পার হওয়া গিয়াছে, উল্লাস দেখে কে! আমাদের ভোঁস সাহেবের মধ্যে সঙ্গীতের 'স' আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস ছিল না, সেই গাঢ় গন্তময় মিঃ ভোঁসও এই সময়ে

আরও কিঞ্চিৎ

সঙ্গীত সুরু করিয়া দিলেন। নদী হইতে কিয়দ্দূরে একটি কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া গেল। যাক্, তবে লোকালয় পাওয়া গিয়াছে! বড় স্ফূর্ত্তি হইল। এইখানে একটি—ক্ষুদ্র হইলেও—কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটিয়া গেল। পথের মধ্যে একটি কর্দ্দম পরিপূর্ণ নালা ছিল, তাহার মধ্যে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া গেল। সেই কর্দ্দম নালা পার হইতে গাড়ী ছাড়িয়া আমাদের নামিতে হইল, ঠেলাঠেলিতে কুঁজা উল্‌টাইয়া জিনিসপত্র ভিজিয়া নষ্ট হইল। সুধাংশুশেখরের আনন্দ হইল, ছবি তুলিবার উপকরণ মিলিয়াছে—তিনি এই দুরবস্থার—একখানি ছবি তুলিয়া লইলেন। সেইখান হইতে পদ-চিহ্নও মধ্যে মধ্যে লোপ

পাইয়াছে; পথ দেখাইয়া দিবার জন্য আমরা এক শ্মশ্রু-সম্বল যষ্টি আকৃতি মুসলমানকে গাড়ীর পাদানে তুলিয়া লইলাম, ভোঁস তাহাকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া রহিলেন। এই লোকটাই আমাদের মিলিত উল্লাসের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া ঘোষণা করিল যে অদূরে জয়ন্তী নদী—পার হইতে হইবে! একেই বলে bolt from the blue—বিনামেঘে বজ্রাঘাত! একা নদী—বি ক্রোশ, তাহা ত এইমাত্র পার হইয়া আসিলাম; আবার নদী কিরে বাবা!

সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই, সূর্য্য পাটে বসিয়াছেন সামনে নদী, পিছনে নবাগত অন্ধকার—মানসিক অবস্থা কথা অবর্ণনীয়। আমরা নির্বাক্ মৃতকল্পের মত গাড়ী মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—দেখিতে দেখিতে জয়ন্তী আত্মপ্রকাশ করিল।

এ নদী দেখিয়া আর কাহার মুখে কথ সরিল না। একটা নদী পার হইয়া যে উল্লা স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা নিমেষে গা বিষাদে পরিণত হইল। সে নদীটা পার হইয় "ভাবিলাম—এ জল খেলা, মধুর বহিবে বা 'চলে' যাব রঙ্গে।"—হরি হে! মধুসূদন! তখ ফিরিবারও উপায় নাই, সম্মুখে বিস্তৃতা জয়ন্তী পশ্চাতে অন্ধকারময় সেই পথশূন্য পার্ব্বত্য পথ 'To go or not to go'—এ চিন্তার অবসর নাই; যা থাকে বরাতে, অগ্রসর হইতে হইবে! হাঁক ডাক করিতে পঁচিশ ত্রিশ জ সাঁওতাল-বাউড়ী জুটিয়া গেল; রাধাবিনোদ আ এক টিন তৈল ঢালিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিলেন, ন এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন; ভোঁস সাহেব মারি শব্দে সাঁওতালদের উৎসাহিত করিতে লাগিলেন- গাড়ী ধীরে ধীরে উচ্চ পাড় হইতে বালু স্তর ভেদ করিয় জলে নামিল, নামিতেই আবার ইঞ্জিন বন্ধ হইল। নদীর চড়ার বালুও যেমন বেশী, জলও তেমনি, গোড়ালি ছাড়াইয়া হাঁটু স্পর্শ করিল,—নদী শেষ আর হয় না সন্ধ্যা সমাগত, সুধাংশুশেখর প্রগাঢ় ভক্তিভরে মনে মনে আহ্নিককৃত্য করিতে লাগিলেন। আমার হাত ভাঙ্গা

নাই—আমি গাড়ীর পাশে পাশে চলিতে লাগিলাম; ননি অনুযোগ করিতে লাগিলেন, আমি ফাঁকি দিতেছি। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—এই সর্ব্বজন-আদৃত নীতি পালন করাই অমি সমীচীন বোধ করিলাম। আমার দুর্ভাগ্য এই 'মোটর অভিযানটি' পূর্ণাঙ্গ করিতে আমি একটা বৈচিত্র্য কামনা করিয়াছিলাম। অন্ধকারের সামনে গাড়ী যখন নদীর মাঝে ঝাঁকিয়া বসিল, তখন সুধাংশুশেখর ও ননি আমাকে লইয়া পড়িলেন। পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন। সত্য কথা বলিতে কি 'পূর্ণাঙ্গের সখ আর আমার মনের কোণেও ছিল না; কিন্তু সে কথা ত বলা যায় না; বলি

সুখে নাহিক ওর!"

লাম, আগে মধুপুর পৌঁছাই, তখন হিসাব করিয়া বলিতে পারিব, পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে কি-না!

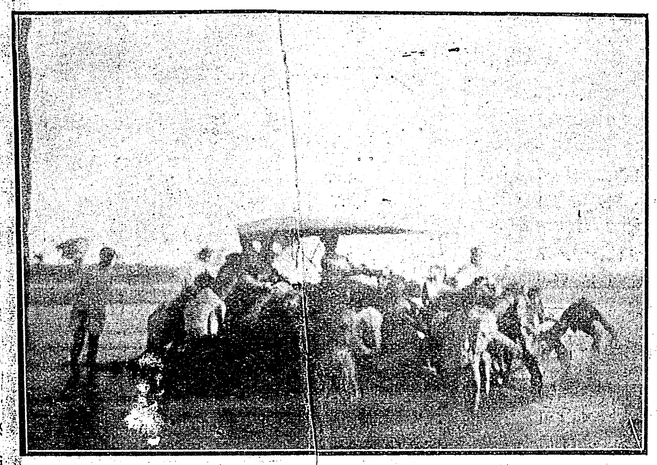

ভোঁস সাহেবের মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি সুধাংশুশেখরের ব্যাগের হাতলটি ছিঁড়িয়াছেন; এক্ষণে মোটরখানাকে লইয়া এমন ঠেলাঠেলি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, নেহাৎ নূতন ও দৃঢ়স্নায়ু ছিল বলিয়াই গাড়ীখানা সে যাত্রা পরলোকযাত্রা করিল না।

অতি-কষ্টে অর্দ্ধ ঘণ্টার ধস্তাধস্তিতে নদী ত পার হওয়া গেল। এখন মধুপুর কোথায়? কতদূরে? রাত্রির অন্ধকার বিশ্বগ্রাস করিয়াছে—পথ নাই, স্থান

ক্রোশ দুই হইবে। এ দিকের ক্রোশ বলিতে আমাদের বাঙ্গালার ক্রোশ নয়,—এখানে বোধ হয় বাঙ্গালার দুই ক্রোশে এক ক্রোশ হয়। সাঁওতালদের মধ্যে দুইটা লোককে আমরা গাইড করিয়া যথেষ্ট বখ্‌শিশের লোভ দেখাইয়া গাড়ীর দুই পার্শ্বে তুলিয়া লইলাম। এখন আমাদের মনে নূতন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল। একে ত চেহারাগুলা ঠিক বাঙ্গালীর-ধাতে সওয়া চেহারা নয়, তার উপর তাহারাই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে; কে জানে আমাদের গন্তব্য স্থানে না লইয়া গিয়া যদি তাহাদেরই কোন 'গোপন স্থানে' হাজির করিয়া বসে। বন্ধুবর সুধাংশুশেখরের হাতে হীরার আংটি, গলায় হীরার বোতাম, রাত্রের অন্ধকারে ঝকমক করিতেছে; ভয় তাঁহারই কিছু বেশী। ননির ভয়ও কিছু অল্প নয়।—'বেঘোরে বেহারে আঁধারে চলিনু পথ!' সকলেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল! কিন্তু তখন মুখ শুকাইয়াও কোন উপায় নাই, সেই অপরিচিত পথ-প্রদর্শকদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতেই হইল। এই দুই ক্রোশ পথ যে কিরূপে, কি ভাবে গিয়াছি—তাহা বলিতেও কষ্ট হয়। মানুষের পায়ে গতি আছে, মোটর তাহা অপেক্ষা মন্দ গতিতে চালাইতে হইল; কোথাও কোথাও গাড়ী উঠিতে পারে না, আমাদের নামিয়া চলিতে হয়! মাঠের মাঝে ইঞ্জিন ভীষণ গরম হইয়া উঠিল। জল, জল! জল চাই! কিন্তু কোথায় জল! কুঁজার জল ইতিপূর্ব্বেই মানুষে শেষ করিয়াছে, মোটরের পিপাসার কথা কেহ ভাবে নাই। রাধাবিনোদ মাঠের মাঝে জল খুঁজিতে গেলেন; অদৃষ্ট ভাল, জল পাওয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, মধুপুর লালগড়ের লাল রাস্তায় গাড়ী উঠিল—রাধাবিনোদ সোল্লাসে বৈদ্যুতি-বাঁশী বাজাইয়া মধুপুর-বাসীকে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। লালগড়েই সুহৃদ্বর শিশিরকুমার মিত্রের বাসা,—

তাঁহার সম্মুখে গাড়ী থামিতে আমরা যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমাদের পথশ্রম উপশম ত হইলই না—বরং ম্যালেরিয়া জ্বরের উত্তাপের মত হু হু করিয়া বাড়িয়াই গেল। জ্যোৎস্নালোকিত বারান্দায় মিত্রজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্যাঘ্র বধে নিযুক্ত। কৈফিয়ৎ দিলেন এই যে বহু বন-বাদাড় অতিক্রম করিয়া এই মনুষ্য কয়টিকে (অর্থাৎ আমাদিগকে) আসিতে হইতেছে—এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব কিছু বেশী, তাই তাঁহারা চা, তাস-পাশা ও হাসি-গল্পের দ্বারা তাবৎ ব্যাঘ্র বধে মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমরা এই টাইগার কিলার্স'দের কটক্তি করি নাই,—করি নাই,—কেবল আমরা অতিথি ও তাঁহারা আশ্রয়দাতা বলিয়া! অন্যথা—থাক্!

দেখিলাম, মিত্র-গৃহিণীই একমাত্র আমাদের কষ্ট বুঝিয়াছেন। গরম চা ও মিষ্ট জলখাবারে পরিতুষ্ট হইয়া আমরা টাইগার কিলার্স'দের লইয়া পড়িলাম।

ইতি "মোটরে মধুপুর" সমাপ্ত। *

* আমরা মোটরেই মধুপুর হইতে ফিরিয়াছি। আসিবার কালে আমরা একদিনেই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। সকাল ৬॥০ টায় ছাড়িয়া আমরা রাত্রি ৮'২০ মিনিটের সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস লাইব্রেরীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছি। পথে রূপনারায়ণপুরের জঙ্গলে একবার ৪০ মিনিটের জন্য; আসানসোলে (১১'৪৫) ৩৫ মিনিট ও বর্দ্ধমানে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের জন্য (২'৫০ হইতে ৪ অপরাহ্ণ) গাড়ীর রসদ ও যাত্রী-বৃন্দের জন্য থামিতে হইয়াছে।

মধুপুর হইতে কারমাটার এই পথে যাইবার সময় আমরা অত্য কষ্ট পাইয়াছিলাম। ফিরিবার সময় দিনের আলোয় ততটা ক পাইতে হয় নাই; আর পূর্ববারে আমাদের রাস্তারও গোলমাল হই গিয়াছিল। যখন ঐ পথে যাই, কারমাটার ষ্টেশন ছাড়িয়া অল্পদূ অগ্রসর হইবার পরই ইষ্ট ইণ্ডিয়ন রেলপথটি আমাদের দৃষ্টিচক্রে বাহিরে পড়িয়া গিয়াছিল; ফিরিবার সময় যে রাস্তায় আসিয়াছি রেলপথটি বরাবর আমাদের বামদিক পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি যদি কেহ ভবিষ্যতে মোটর অভিযান করেন, তিনি রেলপথটির দি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাঘ হইবে; পথের দূরত্ব বন্ধুরত্ব দুই-ই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য নদী সে দুইটাই অতিক্রম করিতে হইবে, দিনের আলোয় নদী পার হওয়া খু কঠিন নয়; সাহায্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আর একটা বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীদিগকে সতর্ক করি দিতে চাই। অনেকেই জানেন, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থি বরাকর নদীর সেতুটি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে—মধুপুর যাইবা সময় এই সেতুর মুখ হইতে ফিরিয়া আমরা বামদিকের রাস্ত ধরিয়া গিয়াছি। সময় হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এদিকের দূর অধিক। ফিরিবার সময় আমরা রূপনারায়ণপুরের পর হইতে কয়লার খাদের পাশ দিয়া সুন্দর সমতল পথ ধরিয়া—সীতারামপুরে ভিতর দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িয়াছি। এই রাস্তা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ১৪৪ মাইলের নিকট আসিয়া মিলিত হইয়াছে ভ্রমণকারিগণ যদি মোটর অভিযান করেন তবে ১৪৩½ মাইলের নিক যে রাস্তাটি তাঁহাদের ডানদিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিবেন, সেইটি ধরি যাইলে সুবিধা হইবে। ১৭ নং নালাটি এই রাস্তার অতি নিকটে অবস্থিত।—লেখক

সাময়িকী

পূজার পরে কোথায় দেশবাসী জনসাধারণের আনন্দ-কোলাহলে যোগদান করিব, তাহা না হইয়া এক অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপ্লবের কাহিনী বলিতে হইতেছে। সিমলার শৈল-শিখরে বসিয়া এক অপরাহ্নে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রেডিং বাহাদুর বাঙ্গালা প্রদেশের জন্য Ordinace প্রচারিত করিলেন এবং ১৮১৮ অব্দের মরিচা-ধরা তিন নম্বর বিধানের পুনঃ প্রচলনের আদেশ ঘোষণা করিলেন। আর সেই রাত্রির মধ্যেই কলিকাতা ও বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য স্থানে খানা-তল্লাস ও গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাঙ্গলা দেশের শান্তিরক্ষকগণ সহসা কলিকাতা সহরের এবং কলিকাতার বাহিরের বিভিন্ন স্থানে শত শত গৃহস্থের দ্বারে সদলবলে দর্শন দিলেন। ব্যাপার কি?—না, খানাতল্লাস হইবে! অপরাধ? গৃহাভ্যন্তরে বিপ্লববাদী (anarchist) আছে, গোলাবারুদের গুদাম আছে, বোমার বেসাতী আছে, রাজদ্রোহ ষড়যন্ত্রের দলিল-পত্র আছে! তখন কোথাও প্রহরব্যাপী, কোথাও দ্বিপ্রহরব্যাপী, কোথাও বা দিনব্যাপী লঙ্কাকাণ্ডের পর, গৃহস্থের সপ্তাহের কাজ বাড়াইয়া দিয়া অশান্তিগ্রহী দল অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু যাহার জন্য এই রাত্রি জাগরণ, এই বিপুল আয়োজন, তাহার কিছুই সারা বাঙ্গালার কোন সন্দিগ্ধ গৃহেই মিলিল না। আগন্তুকেরা লইয়া গেলেন, কাহারও বাজার-হিসাবের খাতা, কাহারও চেক বই, কাহারও পাঠ্য-পুস্তক ... র লইয়া গেলেন তাঁহাদের মার্কামারা তথাকথিত

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম দেও সম্ভবপর নহে; গুটি দুয়েক নাম করিলেই এই ধরপাকড়ের মাধু সম্যক্ অনুভব করিতে পারিবেন। তিন আইন অনুসারে ধ পড়িয়াছেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চিফ একজিকিউটিভ অফিসা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের নিক এই যুবকের পরিচয় দিতে হইবে না। তবুও, যাঁহারা কখন সুভাষ চন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ লাভ করেন নাই, তাঁহাদে অবগতির জন্য বলি, সুভাষচন্দ্র বাঙ্গলার যুবক সমাজের আদর্শ স্থানীয়; এমন শিষ্ট শান্ত, এমন বিনয়ী, এমন অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন, এমন ধর্ম্ম-ভীরু পরোপকারে-উৎসর্গীকৃত-জীবন যুবক বাঙ্গালী গৌরব। তাহার পর এশিয়াখণ্ডের নগরীসমূহের মধ্যে যে কলিকাতা শীর্ষ স্থানীয়, সেই কলিকাতার করদাতৃগণের প্রতিনিধিগণ এ সুভাষচন্দ্রকেই তাঁহাদের মিউনিসিপালিটীর কর্তৃত্বপদে নির্ব্বাচি করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যে সুভাষচন্দ্র আজ ম অপরাধী বলিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন, তাঁহারই মিউনিসিপালিটী কর্ম্মে নির্ব্বাচন এই সেদিন—এপ্রিল মাসে লাটসাহেব মঞ্জুর করিয়াছেন তাহার পর, এই পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই যে সুভাষচন্দ্র কেমন করিয়া ঘোর বিপ্লববাদী হইলেন, তাহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য তাহার পর ধৃত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয়। ইনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, স্বদেশ-ব্রতী। এই অপরাধ, যদি তিনি অন্তরীণে

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

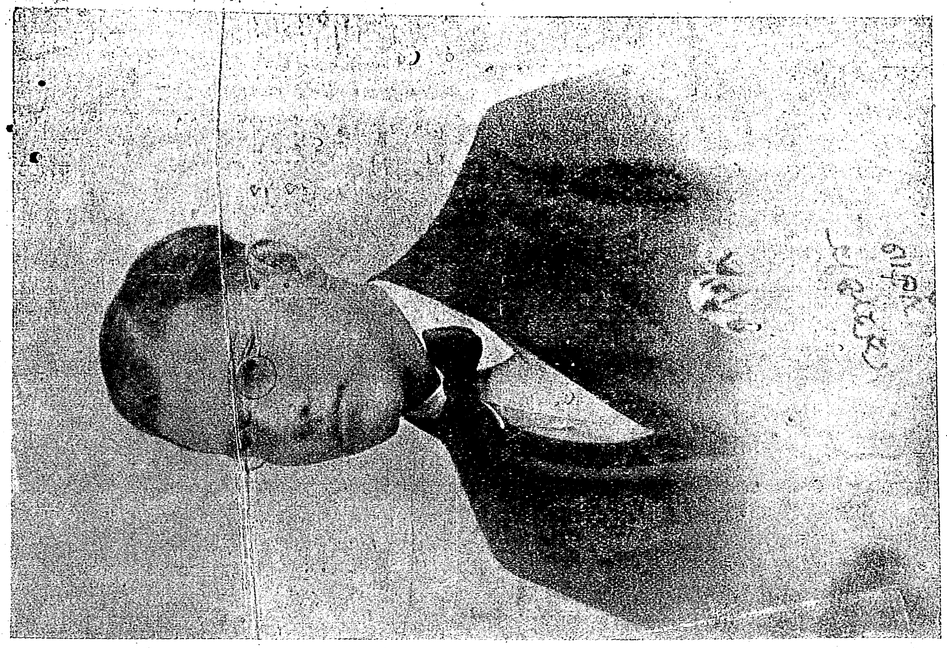

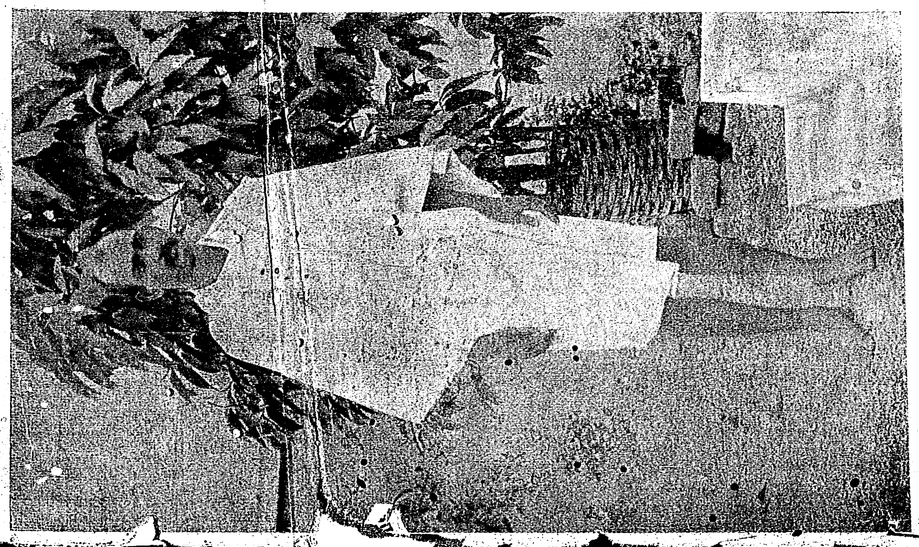

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়

যে বিপ্লববাদী হইতে পারেন, তাহা অনিলবাবুর অতিবড় শত্রুও বলিতে পারিবেন না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া যুগান্তরের কথা মনে পড়ে, যখন এই মরিচা-পড়া মান্ধাতার আমলের তিন আইন অনুসারে পরলোকগত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

এইবার আইনের কথা একটু বলা যাক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবার শুধু ১৮১৮ অব্দের তিন নম্বর রেগুলেশন নহে, তাহার সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের বিশেষ বিধান (Ordinance)। তিন নম্বর রেগুলেশনে যাঁহাদিগকে আবদ্ধ করা হইবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিচার ব্যবস্থা নাই,—ধর, আর আবদ্ধ কর। কিন্তু বিশেষ বিধান অনুসারে যাঁহাদিগকে ধরা হইয়াছে, তাঁহাদের অপরাধের প্রমাণাদি আলোচিত হইবে বটে. কিন্তু কোন প্রকাশ্য আদালতে নহে; বিশেষ কোন বিচারক গোপনে প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যথাকর্ত্তব্য উপদেশ করিবেন; অর্থাৎ দুই-ই প্রায় সমান। এই তিন নম্বর রেগুলেশন স্বদেশী আমলে যখন প্রথম বিস্মৃতির অতল ভাণ্ডার হইতে উত্তোলিত হইয়া দেশের লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করে, তখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারাজীব, পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ইহাকে 'Lawless law' অর্থাৎ বে-আইনী আইন বলিয়া অভিহিত করেন। তাহার পর এখন যাহা বিশেষ বিধি (Ordinance) নামে শ্রীযুক্ত বড়লাট কর্ত্তৃক ঘোষিত হইল. স্বদেশী আমলেও এই রকম একটা নামমাত্র ঘরোয়া বিচারের অভিনয় হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই যখন লর্ড মর্লি ষ্টেট সেক্রেটারী হন ও শ্রীযুক্ত লর্ড মিণ্টো ভারতের রাজপ্রতিনিধি হন সেই সময় লর্ড মর্লি বাহাদুর ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে লিখিয়াছিলেন— "One thing I beseech you to avoid—a single case of investigation in the absence of the accused,"—অর্থাৎ, "দোহাই তোমার, আসামীর অনুপস্থিতিতে তাহার বিরুদ্ধে কোন তদন্ত করিও না।" ইহা হইতেই বিশেষ বিধান অনুসারে ঘরোয়া তদন্তের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

এইবার এই মরিচা-ধরা রেগুলেশন ও তাজা আর্ডিন্যান্স প্রচা[রের] উপযোগিতা সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কিছুদিনের ম[ধ্যে] কয়েকটী খুন হইয়াছে এবং একটা বোমার কারখানাও ধরা পড়িয়া[ছে,] ইহা আমরা জানি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে বলিতেছেন দেশের ম[ধ্যে] বিপ্লববাদ ও রাজদ্রোহ ভয়ানক ভাবে মাথা তুলিয়াছে, এ কথা আ[মরা] কেন বাঙ্গলা দেশের কোন পক্ষই স্বীকার করেন না। দেশ[বন্ধু] চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে বি[প্লব]পন্থার অস্তিত্ব আছে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে শাসন-চক্র পরিচা[লনা] করিতেছেন, তাহাতে ক্রমেই বিপ্লববাদ শক্তি সঞ্চয় করিতে পা[রে।] দেশবন্ধুর কথা মানিয়া লইলেও এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পা[রা] যায় যে, বিপ্লববাদীর দল মুষ্টিমেয়; দেশের অধিকাংশ লোকে[র] তাহাতে সহানুভূতি নাই। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও কলিকাতায় শুভাগ[মন] করিয়া এই কথাই বলিয়াছেন, দেশের লোক সভা-সমিতি করি[য়া] একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সুতরাং তিন ন[ম্বর] রেগুলেশন বা নূতন অর্ডিন্যান্স যে নিতান্তই অনাবশ্যক, তাহা [আর] কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। আর, আমাদের মনে হয়, বর্ত্ত[মান] খানাতল্লাসের হাস্যকর পরিণতি দেখিয়া গবর্ণমেণ্টও তাহাও বুঝি[তে] পারিয়াছেন। তাই কলিকাতার প্রধান সহর-কোটাল শ্রীযুক্ত টে[গার্ট] বাহাদুরও স্বীকার করিয়াছেন যে অবশ্য খানাতল্লাসে কোথাও [কিছু] পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যাহাদিগকে ধরা হইয়াছে. তাহা[দের] বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ আছে। আমরা বলি, সেই প্রমাণগুলি এক[টা] প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থাপিত করিয়া বিশেষ ভাবে বিচার ক[রিয়া] অপরাধ সপ্রমাণ পূর্ব্বক যথাবিহিত দণ্ড বিধান করিলেই ত [আর] গোল হয় না। পুলিসের সংগৃহীত প্রমাণ যে কতদূর বিচার[সহ] তাহা ত বিগত স্বদেশীর সময় মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রের মামলায়, নারা[য়ণ]গড়ে লাটসাহেবের গাড়ী উল্টাইবার ব্যাপারে ও এবম্বিধ অ[ন্যান্য] ঘটনাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে; এবং এবারও এই খানাতল্লা[সের] হাস্যকর পরিণতিতেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট [কি] এখনও এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন না?

সাহিত্য-সংবাদ

এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র ৮০৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখরের 'মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে' কবিতাটী ছাপা হইবার পর দেখিতে পাওয়া গেল তাহা পত্রান্তরে ছাপা হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার।—স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষাকল্পে ৫০৲ টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণপদক বৈদ্যজাতির উৎপত্তি শীর্ষক প্রবন্ধলেখককে দেওয়া হইবে; বৈদ্য পুরুষ বা মহিলা বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া আগামী ৩১শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে ১১ নং হরি বোসের লেনে বৈদ্যবান্ধব সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত নূতন নাটক 'জীবনযুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত নবকুমার বাক্‌চী প্রণীত 'বিজয় কথামৃত' ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছে; মূল্য ২৲

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত নূতন উপন্যাস 'পরশ-পাথ[র]' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত জীবানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত 'পূজনীয় গুরুদাস' বা[হির] হইয়াছে; মূল্য ৩৲

রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত 'কায়স্থ' প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'কপিলের তেজ' ও 'পান্না' প্রকাশিত হইয়াছে—মূল্য প্রত্যেকখানি ১৲

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'জীবনের সাধ' প্রকা[শিত] হইয়াছে—১॥০

শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত 'বাঙ্গলার কৃষকের কথা' প্রকাশিত হইয়া[ছে।]

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রণীত কামন্দকীয় নীতিসার মূল্য ১৲ বসনিবার—।৵০ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সতী-প্রতিভা" প্রকা[শিত] হইয়াছে; মূল্য—১॥০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা যিনি টাকা না পাঠাইবেন, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা আমরা পরব[র্ত্তী] ৬ মাসের জন্য ৩।৶০ আনায় ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠাইব। মণিঅর্ডার করিলে, ৩৶০ আনা গ্রাহক নম্বর সহ পাঠাইবেন।

[Pu]blisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
Gurudas Chatterjea & Sons
Printer—[Na]rendranath Kunar,
[Bhar]atvarsha Print[ing] Works,